অগ্নিগর্ভ খাণ্ডব

ড. দীপক চন্দ্র

অন্নপূর্ণা প্রকাশনী
৩৬, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ রথযাত্রা ১৩৬০

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

মুদ্রাকর : শ্রীবিজয়চন্দ্র চন্দ্র
শ্রীজগদ্ধ নী প্রেস
৫/২, শিবকৃ লেন
কলিকাতা-৭

বরেণ্য কথাসাহিত্যিক

নারায়ণ সান্যাল

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

নাগজাতির একটি শাখা খাণ্ডববনে বাস করত। এরা ছিল তক্ষক সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রকৃতিগতভাবে তক্ষকরা ছিল অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু, আবেগবর্জিত কর্কশ প্রকৃতির। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী এবং স্বাধীনচেতা। এদের রাজাকে তক্ষক নামে অভিহিত করা হত। তক্ষক কোনো নাম নয়। সিংহাসনে অভিষেকের সময় তক্ষক উপাধিতে ভূষিত করা হত। এবং রাজমুকুটে তক্ষক চিহ্ন শোভা পেত। তক্ষক সম্প্রদায়ের কাছে গোষ্ঠীপ্রধান হিসেবে রাজাকে দায়বদ্ধ থাকতে হত। এককালে এরা কাশ্যমায় বসবাস করত। সেখান থেকে তারা সদলবলে খাণ্ডববনে এসে বসবাস করতে লাগল। সেও অনেককাল আগের কথা। বনাঞ্চলের আদিবাসীদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করছিল।

খাণ্ডববন ছিল কৌরব সাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটি বনভূমি। সুচতুর তক্ষক এই বনভূমির রাজা হয়ে বসল। কুরু অধিপতিকে নামমাত্র কর দিয়ে বনভূমিতে এক সমান্তরাল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করল। ছোট ছোট জনগোষ্ঠী তক্ষকের রাজনৈতিক নেতৃত্ব স্বীকার করে তার শাসনাধীনে নিরাপদে বাস করছিল। দীর্ঘকাল এভাবেই কাটল। ক্রমে জীবনযাত্রায় জটিলতা দেখা দিল। জমির দখল নিয়ে, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবি নিয়ে ছোট ছোট উপজাতিদের মধ্যে সংঘর্ষ লেগে রইল। সামাজিক বঞ্চনা এবং বিবিধ অত্যাচারে অসহিষ্ণু ছোট গোষ্ঠীগুলি বিদ্রোহ কবতে লাগল। তক্ষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাদের নিরন্তর সংঘর্ষ লেগে রইল। জমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারের লড়াইতে পক্ষী, নিষাদ, কিরাত, হস্তী ও কুকুর সম্প্রদায়ভুক্ত মানবগোষ্ঠী ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে পড়ল। বনভূমি দিন দিন উত্তপ্ত হয়ে ওঠল। আভ্যন্তরীণ বিবাদ গোপন থাকল না। একটা গণ-অসন্তোষ খাণ্ডববনের শান্তি ও স্থিতি বিপন্ন করল।

প্রত্যেক উপজাতির ভাষা আলাদা। সামাজিক নিয়ম কানুন, প্রথা, সংস্কার, ধর্মাচরণ সবই ভিন্ন রকমের। কারোর সঙ্গে কারোর মিল নেই। ফলে, এক ধরনের গোষ্ঠী-কোন্দল লেগে রইল। এর ওপর তক্ষকের নিয়ন্ত্রণ ছিল না। তক্ষকও রাজনৈতিক প্রতিপত্তি স্থাপনের পথ মসৃণ করার জন্য এইসব গোষ্ঠীর অন্তর্বিরোধের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করল না। বরং তার নীরব সমর্থন এবং প্রশ্রয়ে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও সাম্প্রদায়িক বিবাদ বিভেদ এক ভয়ংকর আকার ধারণ করল। রাজশক্তির প্রশ্রয়ে দুর্বল সংখ্যালঘুরা বাস্তুভিটা ত্যাগে বাধ্য হল। যারা থেকে গেল সংখ্যালঘু হওয়ার জন্যই মাঝেমধ্যে তারা তক্ষকের দ্বারা লাঞ্ছিত হতে লাগল। তাদের চাষের জমি কেড়ে নিল, ঘর থেকে বউ মেয়ে লুঠের মালের মত হরণ করল। নিজদেশে পরবাসী হওয়ার জ্বালা এদের অসহিষ্ণু করল। সহ্যের সীমা পেরিয়ে গেলে ছোট ছোট গোষ্ঠীরা এককাট্টা হয়ে রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

করল। একবার নয়, বহুবার। খাণ্ডববন ছটফট করছিল নতুন সীমানায় পা রাখার জন্য। ধৃতরাষ্ট্র বেশ বুঝতে পারল, খাণ্ডববনের ওপর কৌরবদের আধিপত্যের পাল থেকে বাতাস কেড়ে নেয়ার জন্য এক নতুন ধরনের উৎপাত সূচনা হলো সেখানে। যে কোনো দিনের মধ্যে একটা রেখা টেনে খাণ্ডববনবাসীরা বলতে পারে এটা তোমার অংশ ওটা আমার অংশ।

অথচ, বনভূমি অধ্যুষিত সকল শ্রেণীর মানুষের শান্তি, নিরাপত্তা এবং জীবনযাপনের স্বাধীনতা সুরক্ষিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তক্ষক খাণ্ডববনে করদ রাজ্যের সূচনা করেছিল। কিন্তু শেষ অবধি প্রতিশ্রুতি পালন করল না ধৃতরাষ্ট্র। শতশৃঙ্গ পর্বত থেকে প্রত্যাবর্তন করে পাণ্ডুপুত্রেরা যখন পিতৃরাজ্য দাবি করল তখন এই অগ্নিগর্ভ বনাঞ্চলটিকে তাদের হস্তে সমর্পণ করার কথা সর্বাগ্রে মনে হল ধৃতরাষ্ট্রর। মনের ইচ্ছেটাকে তক্ষককে জানিয়ে দেওয়ার জন্যই তাকে ডেকে আনল রাজসভায়। কোনো ভূমিকা কিংবা বাগাড়ম্বর না করে ধৃতরাষ্ট্র স্পষ্ট বললেন, তোমার অবহেলায়, ঔদাসীন্যে এবং প্রশ্রয়ে খাণ্ডববনে গণ অসন্তোষ এবং বিদ্রোহ যে অস্থিরতা সৃষ্টি করছে তাকে আর উপেক্ষা করা যাচ্ছে না। সংখ্যালঘুরা যত মরছে এখানে, অন্য কোনো করদরাজ্যে এমনটা হয়নি। এই অস্থিরতার মূলে আছে একাধিপত্য স্থাপনেব প্রবণতা। তক্ষক রাজবংশ উদ্ভব হওয়ার একযুগের মধ্যে জমির সন্তানদের সঙ্গে নাগজাতির সংঘর্ষ লেগে রইল। বনাঞ্চলে অগ্নিগর্ভ পরিবেশ সৃষ্টির পেছনে আছে বঞ্চিত মানুষের ক্ষোভ। রাজক্ষমতা তোমার হাতে থাকলে আভ্যন্তরীণ বিবাদ বিভেদ চলতেই থাকবে। সমাধানের জন্য একটা কিছু করা জরুরি হয়েছে।

তক্ষক তীক্ষ্ণ স্বরে প্রতিবাদ করল : কক্ষনো না। এভাবে বনাঞ্চলের আভ্যন্তরীণ বিবাদের সুযোগ নিয়ে এবং আপনাদের পারিবারিক বিবাদের সমাধানসূত্র খুঁজতে নাগরাজ্যকে দু-টুকরো করলে তাতে মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গল হবে বেশি। আরো বেশি বিদ্রোহের আগুন জ্বলবে তাতে।

তা হয়তো ঠিক।

বলপূর্বক আমাদের অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করাটা দুঃখজনক। কৌরব সাম্রাজ্যের তুলনায় আমরা হীনবল, কিন্তু দুর্বল নই। নানারকম সংকটের কারণে নিয়ত দাঙ্গা-হাঙ্গামা লাগে। একদিন ধীরে ধীরে সব শান্ত হয়ে আসবে। কিন্তু একটা অজুহাত খুঁজে খাণ্ডবকে দু'টুকরো করলে আমরা তা মেনে নেব না। আমার কাছে খবর আছে, পাণ্ডুপুত্রদের সন্তুষ্ট করার জন্য চাপে পড়ে খাণ্ডববনকে তাদের হাতে অর্পণ করার সিদ্ধান্ত খুবই দুর্ভাগ্যজনক। পাণ্ডবেরা আমাদের চোখে বিদেশি। এখানকার মাটি, জল-হাওয়ায় মানুষ নয় তারা। এখানকার নদী, এবং প্রান্তরেরও শরিক নয়। আমাদের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। আমাদের সঙ্গে কৌরব সাম্রাজ্যের টান যত বেশি, যতখানি দরদের সম্পর্ক তাদের সঙ্গে তা নেই। হবেও না কোনোকালে। তারা দেবলোকের সন্তান। ভূমি ভাগাভাগি হলে তাদের সঙ্গে মিলতে বাধ্য হব বন্ধুতায় নয়, বৈরিতায়। তাদের সঙ্গে হাত মেলাব কোন শর্তে?

ধৃতরাষ্ট্র বলল : সে তোমার সমস্যা। তাদের সঙ্গে মিত্রতাও তো হতে পারে। অন্তত অতীতের ঘটনাবলী তাই বলে। অতিরিক্ত ভোজনের ফলে মৃতপ্রায় ভীমকে সেবাশুশ্রূষা করে নাগলোকের নাগরাই তো বাঁচিয়ে তুলেছিল। পাণ্ডবদের সঙ্গে তাদের একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কও ছিল। তোমরা একই নাগবংশের শাখা। কাজেই, তাদের সঙ্গে তোমাদের মিত্রতা হতে বাধা কোথায়?

অদ্ভুত ভঙ্গি করে হতাশার হাসি হাসল তক্ষক। বলল : ঘটনা কিন্তু তা বলে না। মধ্যম পাণ্ডব নাগদের পরিচর্যায় নবজীবন লাভ করল সত্য, কিন্তু সেজন্য ভীমের কোনো কৃতজ্ঞতা ছিল না। সুস্থ হওয়ার জন্য বেশ কিছুদিন তাকে নাগলোকে থাকতে হয়েছিল। সে সময় নাগশিশুদের উপব নানারকম নির্যাতন করত। তার নির্দয় আক্রমণে এবং বর্বর অত্যাচারে অনেক নাগবালকের অকাল বিয়োগ পর্যন্ত হয়েছিল। নাগশিশু হত্যাকারী ভীমকে নাগসৈন্যেরা বন্দী করে বিচারের জন্য নাগরাজ বাসুকীর কাছে হাজির করেছিল। বালক বলেই নাগরাজ বাসুকি তার সব অপরাধ ক্ষমা করে দিলেন। সুতরাং বৈরীতা ভুলে পাণ্ডবদের সঙ্গে সম্পর্ককে সহজ ও স্বাভাবিক করা কার্যত অসম্ভব। ওদের রক্তেই আছে নাগদের প্রতি বৈরিতার মনোভাব। ওরা কোনোকালে তারা নাগকুলের বন্ধু হতে পারে না। কুমতলব নিয়ে খাণ্ডববনে নতুন রাজ্যস্থাপনে রাজি হয়েছে। কৃষ্ণের মধ্যস্থতায় পাঞ্চাল রাষ্ট্রজোটের সঙ্গে নবগঠিত রাজ্যের উন্নয়নের জন্য এবং রাজ্যের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত করার জন্য ঢালাও অর্থ এবং অস্ত্র সাহায্যের একটা গোপন চুক্তি করেছে তারা। তাই আপনার প্রস্তাব বিনা বাক্যব্যয়ে কৃষ্ণ মেনে নিল। কার্যত কূটনীতির খেলায় জিতে তারা একধাপ এগিয়ে রইল।

ধৃতরাষ্ট্র চুপ করে ছিল। তক্ষক উৎসাহিত হয়ে বলল; একটু ভাবলে আপনার কাছেও রাজনীতির ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। খাণ্ডববন থেকে হস্তিনাপুর ও পাঞ্চাল সমদূরত্বে অবস্থান করছে। তাই হস্তিনাপুরের মত বৃহৎ একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র যাতে পাণ্ডবদের দুশ্চিন্তার কারণ না হয় সেজন্য পাঞ্চাল রাষ্ট্রজোট অর্থ ও সামর্থ নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াল। এর ফলে, নবগঠিত রাষ্ট্র ইন্দ্রপ্রস্থ হস্তিনাপুরের মত শক্তিশালী রাষ্ট্রকে চাপে রাখতে সক্ষম হবে। তাতে আমাদের অবস্থানও বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। কারণ, কৌরব পাণ্ডবের সম্পর্ককে সহজ করে নেয়ার চেষ্টা কোনো পক্ষই করবে না। বরং, সুসম্পর্ক নষ্ট হওয়ার ইন্ধন জোগানোর জন্য অনেক রাজ্য ও রাজনৈতিক নেতাকে পাওয়া যাবে।

তক্ষকের কথাগুলো ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে পর্যালোচনা করল। পাণ্ডবদের বিস্তার ও প্রাধান্যকে রুখে দেবার জন্য এবং সীমান্ত সংঘর্ষে তাদের সর্বক্ষণ ব্যস্ত ও বিব্রত রাখতে এবং কৌরব সাম্রাজ্য সুরক্ষিত করতে খাণ্ডববনের ভাগাভাগিটা হস্তিনাপুরের স্বার্থেই প্রয়োজন। নাগজাতির পাণ্ডববিদ্বেষী মনোভাবকে কাজে লাগাতেই তক্ষককে তার প্রয়োজন ছিল। তাই তাকে সন্তুষ্ট করতে বলল; তোমরা চাইলে হস্তিনাপুর নিয়মিত অস্ত্রের জোগান দিতে পারে। খাণ্ডববনের মঙ্গল ও উন্নতির স্বার্থে অর্থসাহায্য দেওয়ার

পরিকল্পনা আমাদের আছে। পাণ্ডবদের আগমনে নিজেদের বিপন্ন মনে করাও কোনো কারণ নেই তোমাদের। যেটা আশঙ্কার কথা তা হল আদিবাসী — কিরাত, পক্ষী, নিষাদ, হস্তী, কুকুর আর তোমাদের বন্ধু ভাবে না। তারা নিজেদের অরক্ষিত এবং পৃথক জাতিগোষ্ঠীর লোক মনে করে। নাগজাতির সঙ্গে তাদের যে কোনো সম্পর্ক ছিল না এই বিশ্বাস যত দৃঢ় হচ্ছে ততই রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ক শিথিল হচ্ছে। কৃত্রিম ঐক্য ভেঙে পড়ছে। বিভেদ বিদ্বেষ মাথা চাড়া দিচ্ছে। তাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক জাতি, এক রাষ্ট্রর নাগরিক মনোভাব নিয়ে যদি চলতে পার তাহলে দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষবৃক্ষ অঙ্কুরিত হওয়ার সুযোগ পাবে না। বরং ভাগজনিত অতিরিক্ত কল্যাণের সুফল তোমার হাতেই থাকবে।

নরমে গরমে মেশানো ধৃতরাষ্ট্রের কূটভাষণ তক্ষককে অভিভূত করল। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দিয়ে বুঝতে পারল ধৃতরাষ্ট্রের সিদ্ধান্তর কোনো নড়চড় হবে না। তবু মিনমিন করে বলল : কারণ হিসেবে আমি যা ভেবেছি তা আপনাকে নিবেদন করলাম।

ধৃতরাষ্ট্রের অধরে জয়ী হওয়ার একটুকরো হাসি প্রতিপদের বাঁকা চাঁদের মত ধারালো হয়ে উঠল। বলল : আমার সিদ্ধান্ত তোমার মনঃপূত হয়নি। অনেক সন্দেহ ও দ্বিধায় তুমি ক্ষতবিক্ষত হচ্ছ। তবু বলছি আমাদের খাণ্ডববন নীতিতে তোমরাই লাভবান হচ্ছ। কার পক্ষ নেবে এও যেমন ভাবতে হবে তেমনি তোমার সঙ্গে আমাদের অথবা পাণ্ডবদের সম্পর্ক বন্ধুত্বের, না বৈরিতার তা এখনই স্থির করতে হবে। যে পক্ষে গেলে তোমার রাজনৈতিক স্বার্থ সুরক্ষিত হবে, সেই পক্ষেই থাকবে।

কথা বলা শেষ হলে ধৃতরাষ্ট্রের অধরে এক ক্রূর হাসি খেলে গেল। ওই হাসির অর্থ তক্ষক জানে। ধৃতরাষ্ট্র দৃষ্টিহীন না হলে অবশ্যই দেখতে পেত তার তাম্রবর্ণ, লম্বা, মেদহীন সোজা সতেজ শরীর, টিকোলো নাক, মজবুত চোয়াল, প্রশস্ত কপাল, ঘন কুঞ্চিত কালো কেশরাশি মানুষটি দুর্জয় প্রতিবাদে এবং প্রতিরোধের দৃঢ়তায় খাপখোলা তরোয়ালের মতই সংকল্পবদ্ধ হয়ে ধীরে ধীরে প্রস্থান করল।

পাণ্ডবদের হাতে খাণ্ডববনের হস্তান্তরের খবর গোপন রইল না। দাবানলের মত সংবাদটা ছড়িয়ে পড়ল বনাঞ্চলে। স্বাধীনতা হরণের আশঙ্কায় স্বাধীনতাপ্রিয় বনবাসীরা খেপে গেল। তাদের মত সহজ সরল শান্তিপ্রিয়, নিরীহ মানুষগুলিকে খেপানো হল। তক্ষকই সে কাজ করল। কারো ওপর ভরসা না করে নিজেই আসরে নেমে তাদের ক্ষোভ এবং ভাবাবেগকে উস্কে দিল। বলল : বনবাসীরা বনভূমির মত উদার ও সহিষ্ণু। গাছের মত পাশাপাশি মিলেমিশে বাস করে আসছে সুদীর্ঘকাল ধরে। বনভূমির সেই সুখ কেড়ে নেয়ার জন্য মাঝেমাঝে ঝড় হামলা করে। উপদ্রব সৃষ্টি করে। কিন্তু গাছ হাসিমুখে তাদের আক্রমণ ঠেকায়। মরিয়া হয়ে লড়াই করে ঝড়ের সঙ্গে। আমরা

বনবাসীরা বনভূমির কাছ থেকে এই শিক্ষাই পেয়েছি। বলা যেতে পারে এক বিরাট ঝড় তেড়ে আসছে আমাদের দিকে। থিত ভিত ভেঙে এ বনভূমিকে শ্মশান করে দেবে হয়তো। তাই, একটা বড় যুদ্ধের জন্য, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আমাদের মাতৃভূমি, পিতৃভূমি আমাদের স্বদেশের উপর থাবা বসানোর জন্য ভিন্ রাজ্যের অচেনা মানুষ আসছে নিঃশব্দে। তাদের মতলব আমরা জানি না। কৌরবরা তাদের চেনে না, জানে না। তবু বিপদের আশঙ্কায় তাদের সঙ্গে একটা বড়সড় আপস করল। কৌশলে তারা কৌরব রাজ্যের একটা বড় অংশ খাবলে নিল। ওরা কত শক্তিধর—সৈন্যবল, অস্ত্রবল, ধনবল, লোকবলের অভাব নেই। তবু পাণ্ডবদের শান্ত করতে, তাদের সঙ্গে বিবাদ এড়াতে এই খাণ্ডববনে ওদের রাজ্য স্থাপনের স্বত্ব দান করল। করদ রাজ্যের দুর্বল অধিবাসী বলে কৌরবেরা আমাদের কথা শুনল না। আমার সব আবেদন নিবেদন ব্যর্থ হয়ে গেল। আমাদের পাশে দাঁড়ানোর কেউ রইল না। আমরাই আমাদের একমাত্র ভরসা। আমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এখন আমাদের সামনে ত্যাগে, দুঃখে বড় হওয়ার অপূর্ব সুযোগ এসেছে।

উপস্থিত বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের দলপতিদের দিকে একবার ভালো করে চোখ বুলিয়ে নিল তক্ষক। তারা সকলের উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল। প্রত্যেকের চোখে মুখে বিপন্ন ভয় ও অসহায়তা ফুটে উঠেছিল। তাদের উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠার ওপর চোখ রেখে একটার পর একটা কথা বসাতে লাগল তক্ষক। বলল : মহারাজ, ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের পারিবারিক বিবাদ এড়াতে সিংহাসনের ওপর পাণ্ডুপুত্রদের দাবি স্বীকার করতে খাণ্ডববনকে তাদের নামে লিখে দিলেন। কার্যত, যেন তেন প্রকারে হস্তিনাপুর থেকে পাণ্ডবদের সরিয়ে দেওয়া ছিল ধৃতরাষ্ট্রেব রাজনৈতিক কৌশল। এ হল এক ঢিলে দু'পাখি বধ করার কৌশল। এতে পাণ্ডবদের রাজ্য পাওয়াও হবে, আবার রাজ্য প্রতিষ্ঠা নিয়ে স্বাধীনতাপ্রিয় বনবাসীদের সঙ্গে লাগাতার যুদ্ধ করে তারা দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়বে।

তারপর কেমন একটা অবসন্নতায়, হতাশায় তক্ষকের কণ্ঠস্বর বিষণ্ণ শোনাল। বলল : দুর্ভাগ্য, আমাদের মত শান্তিপ্রিয় জাতিকে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র একটা সংঘর্ষের মধ্যে ঠেলে দিলেন। আমাদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হল। অথচ, এ যুদ্ধ আমরা কেউ চাই না। কখনও ভাবিনি বড় সংঘর্ষের কথা। কিন্তু যুদ্ধ যখন অনিবার্য তখন তো হাত গুটিয়ে বসে থাকা যাবে না। কিছু করতে হবে। স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য নিজেদের জাতিসত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করার এমন সুযোগ আর পাব না। অতএব মৃত্যুভয় ভুলে শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে তুলুন। এতকাল তো ভাড়াটে সৈন্য হয়ে, বৃত্তিভোগী সৈনিক হয়ে যুদ্ধ করেছেন, এবার নিজের জন্য, নিজের দেশ ও জাতির জন্য যুদ্ধ করে শহিদ হওয়ার সুযোগ এসেছে। এই সংগ্রামে যদি সফল হতে পারি, প্রতিবাদ প্রতিরোধের আলোয় আলোকিত হতে পারবে খাণ্ডববাসীর নিজস্ব জাতিসত্তা। আগামী প্রজন্ম যার গৌরবে গৌরবান্বিত হবে।

কিরাতদের দলপতি বলল : শত্রুর ঘর গোছানোর আগে এ যুদ্ধ হলেও শেষ পরিণতি সম্পর্কে এ মুহূর্তে কিছু বলা যাবে না। কারণ, কুরুকুলপতি ভয়ে যাদের সঙ্গে আপস করলেন তাদের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে আমরা কতখানি কী করতে পারব, সংশয় থেকে যায়। পরাজয়ের পরে সম্মিলিত জাতিসত্তার ঐক্য হয়তো টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। হয়তো বা প্রত্যেকের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। পরাজয়ের পরের দিনগুলিতে কিন্তু এখানেই থাকতে হবে পরিবার-পরিজন নিয়ে। আমাদের ভাবনাটা তো সেখানে।

তক্ষক একজন চতুর কূটনীতিক। কিরাত দলপতির আশঙ্কাকে অস্বীকার করল না। বাস্তব সত্য হল, নবগঠিত পাণ্ডবরাজ্যে তাদের বসবাস করতে হবে। কাজেই তাদের বিপক্ষচারণে যাওয়া এই মুহূর্তে ঠিক নয়। বনবাসীরা এখনও সংগঠিত নয়, সংঘবদ্ধ নয়। স্বার্থ ও উদ্দেশ্য এক না হলে ঐক্য হয় না। মতভেদ এখনও প্রবল। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের শক্তিকে এবং তাদের মতিগতিকে জানা চেনা দরকার সর্বাগ্রে। কথাগুলো অত্যন্ত ক্ষিপ্রতায় তক্ষকের মনে উদয় হল। বলল : আপনার আশঙ্কা উড়িয়ে দেবার নয়। শত্রুতা পুষে রাখার চেয়ে সূচনায় তার মূলোৎপাটন হলে, পরে পস্তাতে হয় না আর। আমাদের স্বার্থ বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা যখন উজ্জ্বল এবং তাদের সঙ্গে নিরন্তর সংঘর্ষ অনিবার্য তখন বাস্তব সত্যটা স্বীকার না করলে রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষার সংকট তীব্র হবে। রাজনৈতিক হতাশার শিকার হওয়ার আগে আমাদের স্বার্থ নিয়ে ভাবতে হবে। যুদ্ধে যদি হারও হয় তাহলে যুদ্ধ করার সাহস, মনোবল গোটা জাতকে বীরযোদ্ধার পরিচয়ে সবাকার চোখে শ্রদ্ধার পাত্র করে তুলবে। একজন বীরের মর্যাদা লাভ করবে। এটা কিন্তু কম প্রাপ্তি নয়।

পক্ষীদের গোষ্ঠীপতি বলল, দুর্বলকে আপস করে চলতেই হয় নইলে বেঁচে থাকার অনেক বিড়ম্বনা, যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। যুদ্ধ না করেও চোরাগোপ্তা হামলা করে নানাভাবে বিব্রত করা যায়। তাতে অসন্তোষের কোপটা সকলের উপর পড়ে না। সীমানা সংলগ্ন এলাকায় অতর্কিতে তাদের উপর ঘন ঘন আক্রমণ শানিয়ে তুললে তারা শুধু বিব্রত হবে তাই নয়, সুশৃঙ্খলভাবে রাজনৈতিক এবং সামাজিক গঠনমূলক কাজে মন দিতে পারবে না। চতুর্দিক থেকে প্রায়ই এ ধরনের অতর্কিত আক্রমণে যদি জনজীবন বিপন্ন ও বিধ্বস্ত হতে থাকে তাহলে এক ধরনের ভয় ও ভীতিতে পাণ্ডুপুত্ররা বিপন্ন বোধ করবে। দেশের অর্থনীতি এবং উন্নয়নমূলক কর্মসূচি তার ফলে ভেঙে পড়বে। তখন বনাঞ্চল ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হবে।

তক্ষক প্রতিবাদ করল না। রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে গোটা খাণ্ডববনের একচ্ছত্র নেতা রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা ছিল তার লক্ষ্য। তক্ষক কাশ্যমার (বর্তমানে কাশ্মীর) লোক। কিন্তু নিজেকে মনেপ্রাণে সে খাণ্ডববনবাসী ভাবে। এখানকার জল-হাওয়া-মাটি মানুষের সঙ্গে একসঙ্গে বড় হয়েছে। তবু খাণ্ডববনের শাসনক্ষমতা, রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্ষমতা এই বনাঞ্চলের আদিম উপজাতি গোষ্ঠীর মানুষদের সঙ্গে

ভাগ করে নেওয়া তার পক্ষে ছিল অসম্ভব। সে চাইছিল খাণ্ডববনাঞ্চলের বসবাসকারীদের নিয়ে একটা উপজাতি জাতীয়তাবাদ ভাবাবেগকে রাজনৈতিক ক্ষমতায় মূর্ত করে ক্ষমতা দখল করতে। তার অনুকূলের জনসমর্থনকে এক পতাকাতলে নিয়ে আসা তার একার পক্ষে সম্ভব ভেবেছিল। প্রত্যাশাটা যে একেবারে অলীক নয় তা মণ্ডলসভার আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠল। তাই, সবাই মিলে অস্বীকার করল খাণ্ডবপ্রস্থের জন্য প্রাণ দেবে তবু পরদেশী পাণ্ডবদের শাসন কিছুতে মেনে নেবে না।

খাণ্ডববন শুধু উপজাতি অধ্যুষিত অরণ্যাঞ্চল ছিল না; রীতিমত এখানে একটি ভালো জনপদ গড়ে উঠেছিল। ঐ জনপদের উপর নাগদের প্রতিপত্তি ছিল বেশি। কুরুরাজ্যের সঙ্গে নাগদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের লড়াই নিরন্তর লেগে থাকত। উপদ্রুত ঐ অঞ্চল পাণ্ডবদের হাতে হস্তান্তরিত হওয়াব পর অন্যান্য আদিম উপজাতিরা এবং নাগরা একত্রিত হয়ে তাদের আক্রমণ তীব্র করল। যতদিন যেতে লাগল মাটির দাবি নিয়ে লড়াইটা তত বাড়তে লাগল। ফলে, পাণ্ডবদের বন কেটে নগরপত্তনের কাজটা বিলম্ব হতে লাগল। বনকাটা শুরু হলেই অধিবাসীরা নানারকম উৎপাত করত। এমনকি তাদের অতর্কিত হামলায় অনেক প্রাণ পর্যন্ত দিতে হল। কখন কোথা থেকে শ্রমিকরা আক্রান্ত হবে জানতে পারত না। খাণ্ডবপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যস্থাপন নিয়ে তাই সংকট সৃষ্টি হল!

এজন্য যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে দায়ী করল মনে মনে। তার পরামর্শে ঐ অঞ্চলে সাম্রাজ্য স্থাপনে রাজি হল। না হয়ে উপায়ও ছিল না। ধৃতরাষ্ট্রের কৃপণ দান নিয়ে জেদাজেদি করলে ওটুকুও হাতছাড়া হয়ে যেত। ধৃতরাষ্ট্র মনের কথা গোপন করেনি। স্পষ্ট ভাষায বলল, হস্তিনাপুরের সিংহাসনের উপর পাণ্ডুপুত্রদেব নৈতিক দাবির প্রশ্ন উঠে না। তারা রাজদ্রোহী। বারণাবতের সুসজ্জিত বিলাসগৃহে স্বহস্তে তারাই আগুন লাগিয়েছিল। কয়েকজন নিরীহ নিরন্ন আদিবাসীকে খাবারের প্রলোভন দেখিয়ে গৃহবন্দী করে এবং জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করার যে অপরাধ পাণ্ডবরা করল সেই অমানবিকতার কোনো ক্ষমা হয় না। আইনের চোখে তারা অপরাধী। নিজেদের অপরাধ এবং হত্যার প্রমাণ লোপ করার জন্য তারা বারো বৎসর আত্মগোপন করেছিল। দুর্ভাগ্য, তাঁকে ও তাঁর পুত্রদের একটি মিথ্যে হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করে রাজার মান এবং রাজবাড়ির মর্যাদা ও গৌরব কলঙ্কিত করেছিল। এ রাজ্যবাসীর চোখে তারা আসামি। তাদের হাতে জনগণের জীবন নিরাপদ নয়। বারণাবতের কার্যকলাপ অন্তত তাই বলে। শুধুমাত্র কুরুবৃদ্ধদের সম্মান রক্ষার্থে তাদের আমি হস্তিনাপুরের বাইরে নতুন রাজ্য স্থাপনের অনুমতি দিলাম।

কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রস্তাব লুফে নিল।

রাষ্ট্রগঠনের জন্য একখণ্ড ভূখণ্ড চাই। সে মাটি যত তুচ্ছ বা সামান্য হোক নিজেদের রাষ্ট্রিক পরিচয় সকলের কাছে জানান দেবার জন্য ওই ভূখন্ড চাই। ওরই নাম রাষ্ট্র।

সাম্রাজ্য। স্থায়ী ঠিকানা। একখণ্ড মাটি ছাড়া দাঁড়াবে কোথায়? পিতৃরাজ্য প্রত্যর্পণের নামে একটি উপদ্রুত, অনুন্নত অঞ্চল তাদের কাঁধে চাপাল। এসব জেনে বুঝে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের কথায় রাজি হল। কৃষ্ণই তার ভরসা।

রাজনীতিতে, দেশের ইতিহাসে এবং বাস্তবে এমন অনেক কিছু ঘটনা ঘটে, যা না ঘটলে মানুষের ইতিহাস এমন বিস্ময়কর ঘটনাবহুল হত না। রাজনীতির মূল কথা হল কৌশল। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে পৌঁছতে যখন যে কৌশল দরকার তা গ্রহণ করতে হয়। রাজনীতির কারবার বাস্তবকে নিয়ে। আদর্শ ও বাস্তবের এই জগৎটুকু মনে রেখে কৃষ্ণ খাণ্ডবপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্য স্থাপনের পথে যারা বাধা সৃষ্টি করছিল তাদের পরাভূত করার নীতি নির্ণয়ে অনেকখানি সময় ব্যয় করল।

কৃষ্ণের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে এক অত্যন্ত চালাক, ধূর্ত, ক্ষিপ্র, তীক্ষ্ণ মানুষ। বাইরে কৃষ্ণ ভীষণ মৌন, শান্ত, ধীর, স্থির, কিন্তু ভিতরে তাঁর মেধা দুরন্ত ক্ষিপ্রতায় কাজ করে। সেখানে তিনি সদা কর্মব্যস্ত মানুষ। খাণ্ডব বনবাসীদের সহায়তা বিনা যুধিষ্ঠিরের পক্ষে নতুন সাম্রাজ্য স্থাপন করা কোনোভাবে সম্ভব নয়। তাদের দেহের ঘাম, অন্তরের আনুগত্য এবং শ্রদ্ধা দিয়ে তৈরি করতে হবে নতুন সাম্রাজ্য। কিন্তু বনবাসীরাই সে পথ বন্ধ করে রাখল। বিবাদের পথে না গিয়ে তাদের অভাব-অভিযোগ, দাবি, কলহ এবং বিবাদ বিদ্রোহের সঙ্গে একটা আপস রফা করা শুধু নয়; বিশ্বাসমূলক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে অগ্নিকে প্রতিনিধি করে পাঠানো হল।

অগ্নির সূক্ষ্মবুদ্ধি, কঠিন ক্ষুরধারপথে বিদ্যুতের মত জ্বলন্ত ক্ষিপ্রতায় অজ্ঞতার অন্ধকারের ঘরে ঘরে দীপ জ্বেলে দেয়। অথচ, তার আগুনের মত লাল টকটকে নিষ্পাপ মুখের দিকে তাকিয়ে মনেই হয় না ঘরে ঘরে বিভেদের আগুন লাগানোর তীক্ষ্ণ কৌশলজ্ঞানের অধিকারী। চোখ, মুখ, কান, অনুভূতি দিয়ে চটপট মানুষের ভিতরটা জেনে নেন, বুঝে নেন এবং দুরন্ত ক্ষিপ্রতায় সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলেন। বেশ কিছুকাল অগ্নি বনভূমিতে কাটালেন। ঘরে ঘরে বিরোধের আগুন জ্বালানোর ইন্ধন হিসেবে ঈর্ষা, বিদ্বেষ, ঘৃণার ঘৃতাহুতি দিলেন তবু স্বাধিকারপ্রমত্ত মানুষগুলোর বিশ্বাস এবং সিদ্ধান্ত থেকে এক পাও পিছু হঠাতে পারলেম না। কার্যত ব্যর্থ হয়ে ফিরতে হল অগ্নিকে।

খাণ্ডববনে সর্বত্র মুক্তির হাওয়া বইছিল। মানুষ মুক্তির নেশায় পাগল হয়ে উঠল। তাই বন কেটে যুধিষ্ঠিরের নগর-নির্মাণের কাজ এগোল না। বনবাসীদের আত্মসংহারী মুক্তির ভয়ংকর রূপ দেখে যুধিষ্ঠির ভয় পেল। কিন্তু কৃষ্ণের কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। কারণ, কৃষ্ণ জানে তাদের এজোটের ফলে এমন অনেক কিছু ঘটবে যা জোট গড়ার সময় মনে হয়নি। দেশপ্রেমে তাদের ভেজাল নেই। তারা সবাই খাঁটি দেশপ্রেমিক। কিন্তু তাদের ঐক্য, সম্প্রীতি, সৌহার্দ এবং সহযোগিতার অঙ্গীকার, পারস্পরিক হিংসা, দ্বেষ, বিদ্বেষ, ঘৃণার গর্ভে জন্ম নিয়েছে। তাই, এর স্থায়িত্ব নিয়ে সংশয়। যে কোনো মুহূর্তে স্বার্থের সংঘাতে টুকরো টুকরো হওয়ার সম্ভাবনা। কেবল সময়ের অপেক্ষা।

যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্য স্থাপনের পথে যে এত বাধাবিপত্তি হতে পারে ভাবেনি কৃষ্ণ। অনুন্নত, পরিত্যক্ত একটা বনভূমি মনে করে খাণ্ডববনকে উপেক্ষা করছিল। এখানকার মাটি ও মানুষের দখল নেওয়ার জন্য এমন আত্মসংহারী সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার কথা মনে হয়নি তার। এই বুদ্ধির হারটা তাকে কাঁটার মত বেঁধে। কৃষ্ণ ভালো করেই জানে খাণ্ডববনে রাজ্যস্থাপনে ব্যর্থ হলে লোকে যুধিষ্ঠিরকে দুষবে না; তার ব্যর্থতার দিকটাই আঙুল তুলে দেখাবে। তবু দমল না কৃষ্ণ। বরং, যুধিষ্ঠিরই বেশি হতাশ হল। বলল : ভাই কৃষ্ণ অনেক করলে আমার জন্য। কিন্তু লাভ কী হল? অন্তরে আমি হিমালয়ে ফেরার আহ্বান শুনতে পাচ্ছি। সবার ভাগ্যে সব হয় না। তুমি তো কত করলে, পারলে কি কপাল ফেরাতে? বিধাতা আমার কপালে সিংহাসন লেখেনি। তাই, এ জীবনে রাজা হওয়া হল না। হয়তো এরকম অদ্ভুত শখ কখনও পূর্ণ হবে না।

সে কথা শুনে বাঁকা হাসিতে কৃষ্ণের অধর ধনুকের মত বঙ্কিম হল। বলল : আমি কিন্তু হাল ছাড়িনি। বিনা বাধায় কোনো কাজ হয়? বাধা মানে যোগ্যতা প্রমাণ করা। অন্যের শ্রদ্ধা ও আস্থা অর্জন করা। বাধা খারাপ কিছু নয়। তার জন্য হতাশ হওয়ার কিছু নেই। সংকট সমস্যার ভেতর থেকে উঠে এসে নিজেকে যে সাফল্যের পুরোভাগে দাঁড় করাতে পারে রাজনীতিতে জয় হয় তারই। অন্যরা তখন সমীহ করবে তাকে। নিজের অর্জিত নেতৃত্ব সংকট সমস্যার সমাধানের ভেতর থেকে যদি উঠে না আসে তাহলে দেশশাসন করতে পারে না সে। অনুগ্রহ কিংবা দয়ার দান নিয়ে সিংহাসনে বসা যায় কিন্তু জনগণ মানবে কেন? তাই, খাণ্ডবপ্রস্থে যা চলছে তাতে পাণ্ডবরা লাভবান হচ্ছে। বিধাতার এত বড় আশীর্বাদ খুব কম মানুষের অদৃষ্টে জোটে।

কৃষ্ণের কথাগুলো অভিনব। মনকে রাঙিয়ে দেয়। তাই অবাক মুগ্ধতা নিয়ে তার কাজল-কালো দুই চোখের তারার ওপর আঁখিদ্বয় মেলে ধরে যুধিষ্ঠির স্তব্ধ হয়ে রইল। থমথমে গলায় বলল : কাল বড় বিচিত্র পন্থায় মানুষের উপর প্রতিশোধ নেয়। মরীচিকা প্রলুব্ধ করে কিন্তু ধরা দেয় না। কথাগুলো কলের পুতুলের মত উচ্চারণ করল যুধিষ্ঠির।

কৃষ্ণ উত্তর দিল না। নিজের পথে চলবার সাহস আছে তার। তাই কোনো কিছু পরোয়া না করে অর্জুনকে ডেকে নিয়ে এক বিপজ্জনক রাজনীতির খেলায় মাতল কৃষ্ণ।

খাণ্ডববনের উপজাতি বিদ্রোহের নায়ক হল নাগাধিপতি তক্ষক। ব্যক্তিগতভাবে সে অত্যন্ত দাম্ভিক, অহংকারী, ক্ষমতালোভী এবং স্বার্থপর এক মানুষ। নিজের নেতৃত্ব পাকা করতে জাত, ধর্ম, ভাষা, আঞ্চলিক গোষ্ঠী-বিরোধকে তলেতলে জীইয়ে রাখল। বাইরে থেকে তা ধূর্ত মানুষেরও বুঝবার উপায় ছিল না। কিন্তু কৃষ্ণের অন্তর্দৃষ্টিতে তার ছিদ্রটি ধরা পড়ল। খাণ্ডববনের বহু গোষ্ঠীর মিলিত সংগঠন কার্যত বহু স্বার্থের একটি মিলন মঞ্চ। তাই পলকা ভীষণ। আঘাত সইবার মত পোক্ত নয়। কৃষ্ণ সেই দুর্বল জায়গাটা আঘাত করার কথা ভাবল।

রাজনীতির সবচেয়ে কঠিন অংশ হল দলরক্ষা। দলের নেতৃত্ব আয়ত্তে রাখা।

রাজনীতির খেলায় যারা নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হল তাদের নাড়ীনক্ষত্রও ভালো করে জানা হয়ে গেছে কৃষ্ণের। নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখা নিয়ে সব নেতাই ভয়ংকর মানসিক সংকটে ভোগেন। কারণ যে পথে সংগ্রাম চালিত করছে সে পথের শতসহস্র দুর্বলতার কথা চিন্তা করে সর্বদা শঙ্কিত থাকে সে। খাণ্ডববনের যে মূর্তি ছিল শান্ত, বিভব বিকশিত, আজ সে শুধু সংহারী নয়, আত্মসংহারী। বাইরে থেকে তা বোঝার উপায় ছিল না।

জীবনে, রাজনীতিতে এবং দেশের ইতিহাসে মাঝেমাঝে অতর্কিতে এমন অনেক কিছু ঘটে যা না ঘটলে মানুষের ইতিহাস এমন বিস্ময়কর ঘটনাবহুল হত না। রাজনীতির মূল কথা হল কৌশল। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে পৌঁছতে যখন যে কৌশল দরকার নিরাবেগ চিত্তে তা গ্রহণ করতে হয়। কৃষ্ণ তক্ষকের রাজ্য খাণ্ডবপ্রস্থের কোণে কোণে এমন এক আত্মঘাতী অন্তর্যুদ্ধের বিষ ছড়ালো যে তা থেকে কারো পলায়নের কোনো উপায় থাকল না। রাগ, বিদ্বেষ, ক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠল খাণ্ডববনের পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে ঘরে।

খাণ্ডববনে যুধিষ্ঠিরের স্বার্থ নিরাপদ করার জন্য সর্বাগ্রে নিষাদদের বিচ্ছিন্ন করার এক চক্রান্ত করল। ধর্ম হল তার সেই অস্ত্র। ধর্মের প্রভাব প্রত্যেকের জীবনে গভীর এবং ব্যাপক। এ প্রভাবকে যে ব্যবহার করতে জানে তার জয় ঠেকানোর শক্তি নেই। কথাটা মনে হওয়ামাত্র কৃষ্ণের মলিন মুখে অমলিন হাসিটি জ্বলজ্বল করে উঠল।

কৃষ্ণের ভাড়াটে লোকেরাই রটনা করল নাগাধিপতি তক্ষক ঘোষণা করেছেন খাণ্ডববনে শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত বনভূমিতে নিষাদ এবং কিরাতদের শিকার বন্ধ থাকবে। নিষেধাজ্ঞাটা দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল খাণ্ডববনে। শিকারপ্রিয় নিষাদপল্লীর লোকেরা রাগে, ক্ষোভে দপ্ করে জ্বলে উঠল। সত্যাসত্য বিচার না করে ক্ষিপ্ত আক্রোশে তীর, ধনুক, বল্লম নিয়ে নিরস্ত্র নাগপল্লীর নিরীহ জনতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পাতার কুটীরগুলি তাদের রোষানলে দগ্ধ হল। আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণে খাণ্ডববন অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল। রেষারেষি জাতিবিদ্বেষী দাঙ্গার রূপ নিল। সে দাঙ্গা হাঙ্গামায় পক্ষী, কিরাত, কুকুর, হস্তী সব গোষ্ঠীর লোক জড়িয়ে পড়ল। সীমান্তের হাঙ্গামা নিজের নিজের এলাকার মধ্যে টেনে এনে এক আত্মক্ষয়ী রক্তযুদ্ধে মেতে উঠল। তাকে নিয়ন্ত্রণ করা তক্ষকের সাধ্য ছিল না। বরং বিক্ষোভ, বিদ্রোহ তার দিকেই তেড়ে এল। জনরোষের আগুনে তার প্রাসাদ দাউদাউ করে জ্বলতে লাগল। কোনোক্রমে প্রাণ নিয়ে পালাল তক্ষক। কিন্তু বন্ধু ময়দানব পলায়নকালে কৃষ্ণ-অর্জুনের হাতে বন্দী হল।

খাণ্ডববনের অবস্থা খুব খারাপ হল। সর্বত্র বিক্ষুব্ধ মানুষ প্রতিশোধের উন্মাদনায় উন্মত্ত হয়ে উঠল। গোষ্ঠীগত রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্ব এক ভয়ংকর রূপ নিল। জাতিবিদ্বেষের হানাহানি খাণ্ডববনে কোনো নতুন ঘটনা নয়। এর আগেও সাত-সাতবার হিংসা, বিদ্বেষের আগুন জ্বলে উঠেছিল খাণ্ডববনে। কিন্তু সে ছিল সীমাবদ্ধ। প্রতিবেশীর মধ্যস্থতায় মিটমাট হয়ে গেছিল। কিছুকাল থমথমে অবস্থা ছিল। তারপর পরিস্থিতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক

হয়ে গেল। কিন্তু এমন সর্বব্যাপী হিংসাত্মক হয়নি কখনও। এবারের ঘটনা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা।

গোষ্ঠীগত প্রথা, সংস্কার ও ধর্মীয় বিশ্বাসের যাদুস্পর্শের বিচিত্র ছোঁয়ায় হাজার হাজার মানুষের স্তিমিত প্রাণ দপ করে হঠাৎ জ্বলে উঠল ভয়ংকর আক্রোশে এবং চোখের পলকে দাবানলের মত গোটা বনভূমি ব্যাপ্ত হয়ে গেল। জেহাদের আঁচ লাগল সকলের গায়। এই সংঘাতের দ্বারা প্রমাণ হয়ে গেল কিরাত, নিষাদ, কুকুর, নাগদের কেউ আর ঐক্যবদ্ধ নয়। সুসম্পর্কের পরিবেশ তৈবি করে তক্ষক উপজাতিদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র গড়ার যে স্বপ্ন দেখেছিল তা যাতে কোনোদিন বাস্তবে পরিণত না হয়, এবং অরণ্যবাসীরা যাতে ভবিষ্যতে মাথা তুলতে না পারে সেজন্য বিভেদনীতি প্রয়োগ করে কৃষ্ণ তাদের মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে দিল। ফলে, যুধিষ্ঠিরের আনুগত্যাধীন হওয়ার পথটা খুলে গেল তাদের কাছে।

গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়েছিল নিষাদপল্লীতে। দুর্গত দুঃখী মানুষের দুঃসময়ে এবং সংকটে যে, যুধিষ্ঠির তাদের পাশে আছে এবং সাহায্য করার জন্য দুটি হাত সর্বদা প্রস্তুত এটা দেখানোর জন্যই কৃষ্ণ ও অর্জুন সর্বাগ্রে সেখানে গেল। কিন্তু তাদের কাজটা খুব সহজ ছিল না। পল্লীবাসীর যে ভযংকর মানসিক সংকট সৃষ্টি হয়েছিল তার বোঝা হাল্কা করে সমব্যথী হয়ে তাদের সব দুঃখ, যন্ত্রণা, ব্যথা, কষ্ট, হাহাকারের উপর প্রলেপ দেওয়া ছিল দীর্ঘদিনের কাজ। কারণ ঘটনা দুর্ঘটনার উত্তাল তরঙ্গে বিধ্বস্ত হয়েছিল তাদের জীবনের অনেক কিছু। তাদের প্রেমে ঘৃণার বিষ, বিশ্বাসে সন্দেহ, ভালোবাসায় অবিশ্বাস, বন্ধুত্বে বৈরিতা এই ধারণায় তাদের মনটা শুধু আর্ত নয়, বিষাদে আচ্ছন্নও। তাই উপযাচক হয়ে কেউ তাদের সাহায্যের হাত বাড়িযে দিলে সন্দেহ হয় তাকে। হওয়ারই কথা। বিশ্বাসভঙ্গ একবার হলে জীবনের কাছে প্রত্যাশার কিছু থাকে না। আত্মবিশ্বাসের স্বক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনতে হলে চাই তাদের মনের মানুষ হযে ওঠা। মনের অয়নপথে ধরে কৃষ্ণ তাদের বন্ধু ও সমব্যথী হওয়ার চেষ্টা করল।

বনভূমিতে যেখানে গণ্ডগোল হচ্ছিল, কৃষ্ণ ও অর্জুন সেখানে গিয়ে আক্রান্ত এবং আহতদের সঙ্গে আত্মীয়ের মত কথা বলল। তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে দিল। ক্ষতস্থানে বনৌষধ বেঁধে দিল। কৃষ্ণের সহানুভূতির স্পর্শে গলে গেল তাদের ভেতরটা। উদ্গত কান্নায় দু'চোখ প্লাবিত হল। বলল : ভালো করে আর হাঁটতে পারব না কোনোদিন। হাত থাকতেও হাতটা মুখের কাছে ধরতে পারব না। এমন কি জলের গ্লাসটা পর্যন্ত মুঠো করতে পারি না। পরের উপর ভরসা করে বাকি জীবনটা কাটানোর যন্ত্রণা আমাকে কষ্ট দেয়।

এসব কথায় কৃষ্ণের মন আর্ত হয়। কথা বলতে পারে না। দু'চোখের কোণে জল টলটল করে শুধু। নিহতদের পরিবারের বাড়ি গিয়ে দেখা করল। এবং তাদের সান্ত্বনা দিল। বলল : তোমাদের জন্য কষ্ট হয়। ভালো ভালো কথা বলে মনকে আর্ত করা যায় হয়ত, কিন্তু বুকের পাষাণভার তাতে হাল্কা হয় না। তবু মানুষই মানুষের বন্ধু হয়ে

পাশে দাঁড়ায়। সান্ত্বনা দেয়। অথচ দেখ তোমাদের ক্ষয়ক্ষতির ভয়াবহ স্মৃতি ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য যুধিষ্ঠির ছাড়া একজনও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল না। কারণ গৃহহীন হওয়ার জ্বালা, দুঃখটা পাণ্ডবদের মত এত বেশি কেউ জানে না। জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব ছোট ছোট ভাই এবং মাকে নিয়ে নিরাশ্রয় হয়ে পথে পথে ঘুরেছেন কতদিন। কত দুঃখ, কষ্ট সহ্য করেছেন। তাই সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েই খাণ্ডবপ্রস্থের দুঃখী দুর্গত প্রজাদের সেবা করাকে ঈশ্বরের সেবা মনে করেন। তাদের ভাঙা ঘর নতুন করে গড়ে দিতে চান। তাদের নিজের জমিতে সোনার ফসল ফলানোর স্বপ্ন রচনা করে খাণ্ডবপ্রস্থকে পৃথিবীর স্বর্গে পরিণত করতে চান। এ হল ঈশ্বরের রাজ্য। আর যুধিষ্ঠির হলেন ঈশ্বরের দেশের রাজা। তিনি হলেন ঈশ্বরের পুত্র। জীবনে কোনো অধর্ম করেননি। মানুষ 'সত্যে সুন্দর হোক, মনুষ্যত্বে সুন্দর হোক, ধর্মে সুন্দর হোক'—এটাই হল তাঁর রাজ্যের মন্ত্র।

কৃষ্ণের কথায় অভিভূত হল জনতা। এমন হৃদয় নিঙড়ানো মন কাড়া কথা আর কারো কাছে শোনেনি আগে। তবু নিষাদ দলপতির সন্দেহ হল কৃষ্ণকে, রোষ প্রকাশ করে বলল : তুমি বিশ্বাসঘাতক। আমাদের দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে লোভ দেখাচ্ছ গোলাম করার জন্য।

জীবনরহস্য বোঝার কৌতুক হাসিতে বর্তুল হল কৃষ্ণের অধরযুগল। বলল : মনগড়া অর্থ করতেই পার। কিন্তু তাতে প্রকৃত সত্য চাপা পড়ে যায় না। দলপতির ভুলের মাশুল গোটা গোষ্ঠীকে দিতে হয়। যার যা ভাবনা তাকেই ভাবতে দাও। আমার বন্ধুত্বে কপটতা নেই। একবর্ণ মিছে বলছি না। কোন কিছুতে আমার লোভ নেই। মথুরার কৃষ্ণ আমি। চাইলেই মথুরার রাজা হতে পারতাম। কিন্তু হইনি। মানুষের বন্ধুত্ব পেলেই আমি খুশি।

কৃষ্ণের নাম শুনে নিষাদ দলপতি চুপসে গেল। শক্ত কথা বলার জোর পেল না মনে। আমতা আমতা করে বলল : আমাদের বেঁচে থাকাটাই এক মহাসমস্যা।

ওদের কথাবার্তার মধ্যে ভিড় জমে গিয়েছিল। জনতার দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণ বলল, সমস্যা ছাড়া জীবন হয়? সমস্যা সুরাহার জন্য তোমরা তো কিছুই করনি। উন্নতিটা হবে কোথা থেকে বল? এস আমরা সকলে মিলে কিছু করার কথা ভাবি। সম্প্রীতির পরিবেশ সকলের আগে ফেরাতে হবে। নিরাপত্তা এবং আস্থা সৃষ্টির কাজ করতে হবে সর্বাগ্রে। তারপরে ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে হাত ধরাধরি করে এক মানবশৃঙ্খল সৃষ্টি করল। মুহূর্তে জনপদের সড়কে এক দীর্ঘ মানুষের সারি হাত ধরাধরি করে কৃষ্ণের সঙ্গে উচ্চারণ করল : আমরা সকলে এক। বিপদ বাধার বিরুদ্ধে একসঙ্গে লড়ব। সুখেদুঃখে পাশাপাশি থাকব। আমরা আর একা নই। সকলে আমরা সকলের তরে।

মানবশৃঙ্খল কথাটা জনতার কাছে নতুন। কিন্তু শব্দটার মধ্যে একটা নতুনত্ব আছে। তাদের মনে বিশ্বাস জন্মাল এটা কোনো ফাঁকা আওয়াজ কিংবা চমক নয়। হয়তো এই বোধটা খাণ্ডব বনবাসীদের জীবনে এক নতুন আলো দেখাতে পারে। মানুষে মানুষে

মেলবন্ধন ঘটানোর এমন সুন্দর কথা একটাও নেই। কৃষ্ণের হাত ধরে এবং অন্যদের হাতে হাত রেখে যখন সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল তখন কেমন একটা দায়িত্বসচেতনতাবোধ তাদের দায়িত্বশীল করে তুলল। মানুষের জন্য মানুষ, এই গভীরবোধ জাগল তাদের মনেতে। তখনই অনুভব করল তাদের কলহের পেছনে এক বড় আত্মকলহ লুকিয়ে ছিল।

নিজের কর্মপন্থাকে সফল করে তুলতে কৃষ্ণের চাতুরী অর্জুনকে অবাক করে দিল। সবটুকু সুবুদ্ধি নিয়োগ করার ক্ষমতা শুধু নয়, কৃষ্ণের আরো বেশি ছিল মন গলানো কথাবার্তা বলার এক আশ্চর্য দক্ষতা। রাজনীতির কূট খেলায় জিতল কৃষ্ণ। তার মানবকল্যাণের মানবপ্রাচীর রাজনীতি হয়ে উঠল। জেতার জন্য কৃষ্ণ শঠতা, ছল চাতুরী, কূটনীতি সব কিছুর সাহায্য নিল। কিন্তু এরপর প্রত্যাশা পূরণের জন্য যা চাইবে তার দাবি পূরণ করতে পারবে তো? — প্রশ্নটা অর্জুন নিজের কাছে নিজেকে করল।

দুই

অনেক দুরধিগম্য পথ অতিক্রম করে তক্ষক ক্রমাগত এগিয়ে চলল সামনের দিকে। শালতরুর মত দীর্ঘ পেশীবহুল তার চেহারা। বুনো মহিষের মত বলিষ্ঠ ভারী পায়ের চাপে জঙ্গল মাড়িয়ে সে চলেছিল। তার কোনো সঠিক গন্তব্য ছিল না। ধরা পড়ার ভয়ে সে দৌড়চ্ছিল। জোরে জোরে শ্বাস পড়ছিল। বহুদূর থেকে তার শ্বাসের হিস্‌হিস্‌ আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। একটানা অনেকক্ষণ জোরে জোরে হাঁটার জন্য পেটে ফিক্‌ ধরেছিল। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছিল দেহটা। মাঝে মাঝে পেটটা চেপে ধরে পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার চলছিল।

তক্ষকের সঙ্গে কেউ ছিল না। সে একেবারে একা। এমনকী, আত্মরক্ষার জন্য কোনো অস্ত্রও নেই তার কাছে। গাছের একটা ডাল ভেঙে সে লাঠি করেছিল। এই লাঠিই তার বিপদের সঙ্গী। বনের হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের আক্রমণ এই লাঠি দিয়েই সামলাচ্ছিল।

তিনদিন তিনরাত্রি পথ হেঁটে অরণ্য পরিবেষ্টিত পাহাড় ঘেরা একদেশে পৌছল। কুরু জাঙ্গালের সীমানার বাইরে পৌঁছনোর স্বস্তি-সুখে তার ভেতরটা পুলকিত হল। এখন আর ধরা পড়ার ভয় নেই। কিন্তু দারুণ ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হল সে। ক্লান্তিতে শরীরটা অবসন্ন লাগল। তবে কনকনে ঠাণ্ডার জন্য শ্রান্তি তত বোধ হচ্ছিল না। পশুর লোমে তৈরি পোশাকে শরীর আবৃত করে সে একটা প্রশস্ত শিলাখণ্ডের উপর টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল। অমনি ক্লান্তিতে দু'চোখ বুজে গেল। তিনদিন পরে এই প্রথম একটু নিশ্চিন্তে ঘুমোল কিন্তু গভীর ঘুম নয়। প্রতিক্ষণই মনে হচ্ছিল সে জেগে আছে। তার খোলা চোখের উপর একটার পর একটা ঘটনা ঘটছে আর সে সেই ঘটনার মধ্যে প্রবিষ্ট হচ্ছে। তক্ষক স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল খাণ্ডববনে তার গৃহ, তার প্রাসাদ, রাজ্যের নরনারী। রাস্তাঘাট দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন খুঁটিনাটি ঘটনা।

রাগে ফুঁসছিল খাণ্ডবপ্রস্থের মানুষ। হঠাৎ তাদের খেপে ওঠার কারণটা তক্ষক জানত না। তবে, খাণ্ডববনকে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরীতে রূপান্তরিত করার যে পরিকল্পনা যুধিষ্ঠির করেছিল তক্ষক তা রুখে দিয়েছিল। গোটা অরণ্যবাসীকে নিয়ে সে একটা জোট গঠন করেছিল। সবাইকে তার ছত্রচ্ছায়ায় এককাট্টা করেছিল। প্রাণ দেবে তবু খাণ্ডববন দেবে না, এই অঙ্গীকারে জ্বলজ্বল করছিল তাদের ব্যক্তিত্ব। যুধিষ্ঠিরের সাধ্য ছিল না তাদের সংকল্পচ্যুত করা। বিভিন্ন গোষ্ঠীর ধর্মীয় আচার, প্রথা, সংস্কার, সংস্কৃতি, বিধি-বিধান, বিশ্বাস আলাদা হওয়ার জন্যই বৈষম্যের রন্ধ্রপথ ধরে নিয়তি অনৈক্যের ছদ্মবেশে প্রবেশ করে ঐক্য-সংহতি ভেঙে টুকরো টুকরো করল। হঠাৎই মানুষ ধর্ম ধর্ম করে উন্মাদ হল। ধর্ম যে মানুষকে কত অসহিষ্ণু, উগ্র, নিষ্ঠুর ও বিবেকহীন করে জানা ছিল না তক্ষকের। ধর্মের তাস খেলে কৃষ্ণ-অর্জুন হারিয়ে দিল তাকে। নিষাদদের ধর্মবিশ্বাসের দুর্বল ভাবাবেগকে আঘাত করতে কৃষ্ণ ও অর্জুন মিলে তার নামে যে মিথ্যে অপপ্রচার করল কার্যত তার জন্যই এক রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ হল খাণ্ডবপ্রস্থে। কৃষ্ণ ও অর্জুনের কপটতা ও শঠতার জন্যই আত্মরক্ষার্থে পরিবার পরিজনদের ত্যাগ করতে হল। এই মুহূর্তে সে একেবারে একা।

ভিতরে ভিতরে একটা দুরন্ত রাগ তাকে ক্রোধে অসহিষ্ণু করল। তার সব রাগ এখন ঈশ্বরের উপর। ক্ষিপ্ত আক্রোশে ঈশ্বরকে লক্ষ্য করেই যেন আকাশের দিকে ঢিল ছুড়তে লাগল। রাগটা কমলে ছেলেমানুষি কাণ্ডের জন্য নিজের মনেই হাসল। মনে মনে বলল : এর নাম ভাগ্যের পরিহাস। ভাগ্যই তাকে হারিয়ে দিল। কিন্তু পুরুষকার দিয়ে জয় আদায় করে নেওয়ার কথা ভাবল তক্ষক। এখন সে একা। নতুন জায়গা, নতুন মানুষ। সবকিছু নতুন করে গড়ে নিতে হবে তাকে। শূন্য থেকে শুরু করতে হবে। কারণ হেরে যেতে সে জানে না। হেরে যাওয়া বড় লজ্জার, বড় অপমানের। একজন মানুষ ভীষণভাবে জয়ের স্বপ্ন দেখলে তবে তো সে জয়ী হবে। জয় তো কেউ দেয় না। জয় অর্জন করতে হয়। অন্যের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে হয়। একথা মনে রেখে সংকল্পবদ্ধ হলেই তার জয় হবেই। নিজে থেকে নিজের কাছে হেরে না গেলে কেউ তাকে হারাতে পারে না। তক্ষক মনে মনে সংকল্প করল পাণ্ডববংশের উপর সে অথবা তার বংশধরেরা প্রতিশোধ নেবেই। বাইরে থেকে নয় খাণ্ডববনের ভেতর থেকেই সে তার আক্রমণ শানিয়ে তুলবে। হিংস্র রাগে তার চোখ দুটো যে ভয়ংকরভাবে বিস্ফারিত হল সে তা অনুভব করল। অমনি ধনুকের মত ওষ্ঠাধরে পাথর কঠিন সংগ্রামের আহ্বানে স্ফীত হল। জয়ী সে হবেই। কারণ, যাদের সাহায্য নিয়ে পাণ্ডবেরা তাদের বোকা বানাল সেই মানুষগুলোর বুকে অনুশোচনার আগুন যেদিন জ্বলে উঠবে সেদিন তাদের আর নিস্তার নেই। পুরুষানুক্রমে জমানো পাণ্ডব বিদ্বেষের বিষ উগরে দেবে পাণ্ডবদের ওপর। এখন শুধু সময়ের প্রতীক্ষা।

সেই সময় ওই পথ দিয়ে সপার্ষদ চন্দ্রকান্ত বণিক গৃহে ফিরছিল। তক্ষককে ওভাবে

আকাশকে লক্ষ্য করে নুড়ি পাথর ছুড়তে দেখে বেশ একটু আশ্চর্য হল। পথের মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে লোকটাকে খুঁটিয়ে দেখল। পিছন করে থাকার জন্য লোকটির মুখ দেখতে পেল না। কিন্তু তার ছেলেমানুষি কাণ্ড দেখে বারংবার মনে হচ্ছিল লোকটি নিশ্চয়ই কোনো পাগল। তার পরনের পোশাকও মলিন, জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া। একমাথা চুল উস্কখুস্ক, খোঁচা খোঁচা দাড়ি — সব মিলিয়ে তাকে পাগল বোধ হল। বেশ কিছুক্ষণ ধরে তাকে নিরীক্ষণ করে চন্দ্রকান্তর ধারণা জন্মাল, লোকটার জীবনে ভয়ংকর একটা কিছু ঘটে গেছে। দুরন্ত বাগে টগবগ করে ফুটছে তার পৌরুষ। যে বিধাতা তার দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী তার উপরে আক্রোশ মেটাতে নুড়ি পাথর ছুড়ে মারছিল তাকে। লোকটার উপর চন্দ্রকান্তর দয়া হল। মানুষটা বড় একা এবং অসহায়। কিন্তু জেহাদ ঘোষণা করার শক্তি ও মনোবল আছে তার।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে সন্ধানী চোখ মেলে তাকে দেখার পর অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে তার দিকে অগ্রসব হল। তাকে আসতে দেখে তক্ষক প্রশ্ন করল : এ জায়গার নাম কী ভাই?

চন্দ্রকান্ত বলল : তক্ষশিলা।

তক্ষক কিছু একটা স্মরণ করার চেষ্টা করল। অধরে স্মিত হাসি ফুটল। বলল, একেই বলে নিযতি। আমি না চাইলেও নিয়তি আমার পিছু ছাড়বে না। একটু ভেবে বলল, তার মানে নাগগোষ্ঠীর তক্ষকরা এখানে বসবাস করে।

চন্দ্রকান্ত বলল : হাঁ। রাজা তক্ষকের নামানুসারে এই রাজ্যের নাম তক্ষশিলা। এখন বাজবংশের কেউ জীবিত নেই। এ অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের সর্দার বাহুবলে তক্ষক বংশের রাজাকে হঠিয়ে দিযে নিজেই রাজা হয়ে বসল। নাগদের যে শাখাটি এখানে বসবাস করে তারা যাযাবরবৃত্তি ত্যাগ করে স্থায়ীভাবে অনেককাল ধবে এখানে বসবাস করছে। চাষ-আবাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য করে জীবিকা নির্বাহ করে।

তক্ষক তার অতীত চিন্তাসূত্র টেনে এনে বলল : তা হলে কালগর্ভে হাবিয়ে গেছে আমাদের জাতিসত্তা। উত্তরাধিকারিত্ব বলে তাহলে থাকল কি?

চন্দ্রকান্তর কানে কথাগুলো হেঁয়ালির মত লাগল। বলল : তোমাকে তো চিনলাম না ভাই। কোথায় থাক? কোথা থেকে আসছ? তোমার পরিচয় কি? কোন বংশের সন্তান তুমি? তোমার জাতিসত্তা! তুমি কি ভাগ্যহত তক্ষক বংশেব কেউ?

এতগুলো প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে তক্ষক। বলল : রোদ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খিদেও বাড়ছে। এখন খিদে মেটাতে খাবার পাই কোথায়?

তক্ষকের সুন্দর, সুঠাম, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা চন্দ্রকান্তকে আকৃষ্ট করল। তার প্রতি ভীষণ দয়া হল। সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ মায়াও। তবু মনের কথাটা বলতে দ্বিধা হল। বলল : দেখে মনে হচ্ছে তুমি সম্ভ্রান্ত বংশের কেউ। যদি চাও আমার গৃহে মধ্যাহ্নভোজন করতে পার। এমনকী চাইলে যাবজ্জীবন আমার বন্ধু হয়ে বসবাস করতে পার। তোমাকে আমার

ভালো লেগেছে। এ রাজ্যের একজন শ্রেষ্ঠী আমি। মনে করলে, আমার সঙ্গে বিদেশ বিভুঁইতে বাণিজ্যে যেতে পার।

তক্ষকের কাছে এখনই যা জরুরি তা হল একটি নিরাপদ আস্তানা। বিদেশ বিভুঁইতে এমন অযাচিতভাবে একটা ভাল আশ্রয় পাওয়া, ভাল বন্ধু পাওয়া একজন অচেনা লোকের ভাগ্যের কথা। চন্দ্রকান্ত বণিক যে একজন অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি তাতে কোনো সংশয় নেই তক্ষকের। সুতরাং তার আশ্রয়ে নিরাপদে এবং নির্বিঘ্নে থাকবে। তক্ষক তার লোকচরিত্রের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝল, চন্দ্রকান্তর কাছ থেকে বিপদের কোনো আশঙ্কা নেই। তাই আর ভাবনাচিন্তা না করে চন্দ্রকান্তর প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল। অভিভূত গলায় বলল : জান বন্ধু, জীবনে এমন অনেক কিছু অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটে যায়, যা না- হলে মানুষের জীবন এমন বিস্ময়কর ঘটনাবহুল হত না।

তক্ষকের গোটা জীবনধারাটা বদলে গেল। পুত্র, পরিবার, স্বজন হারানোর শোক, দুঃখ, কান্নার কষ্ট একটু একটু করে ফিকে হয়ে গেল। প্রাণ নিয়ে পালানোর একটা সদর্থ খুঁজে পেল। পালিয়ে বাঁচা নয়, নতুন করে সবকিছু ফিরে পাওয়ার জন্য নতুন উদ্যোগে নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য মানুষ পালায়। জীবনটা হারবার জন্য নয়, হারাবার জন্য এই প্রত্যয়ে মনটা দৃঢ় হল।

ব্যবসা-বাণিজ্যসূত্রে বিভিন্ন দেশে চন্দ্রকান্তর যাতায়াত ছিল এবং বহুদেশের খবরাখবরও রাখত। তাই বহুদেশের খবর শুনতে এবং বাণিজ্যযাত্রার অদ্ভুত অদ্ভুত রোমহর্ষক গল্প শোনার কৌতূহলে চন্দ্রকান্তর বাড়িতে প্রায়ই মজলিস হত। সেখানে তক্ষকও উপস্থিত থাকত। ভিনদেশের এই অচেনা-অজানা মানুষটির সম্পর্কে শ্রোতাদের কৌতূহলের অন্ত ছিল না। তক্ষকই ছিল তাদের একটা গল্প। বিশেষ করে তার নজর কাড়া দর্শনীয় চেহারা অবাক করত তাদের। নিজের কাছেই তারা প্রশ্ন করত কৃষ্ণবর্ণ মানুষ এমন দর্শনীয় হয়? শালতরুর মত দীর্ঘ, বলিষ্ঠ কালো দেহের ভাঁজে ভাঁজে পেশীগুলো এক একটি গোল নুড়ির মত ফুটে উঠে। চোখ তো নয় যেন গুহার ভেতর জ্বলজ্বল করে জ্বলছে চিতাবাঘের চোখ। মাথায় অপর্যাপ্ত কালো কোঁকড়া চুল তো নয়, যেন সিংহের কেশর। কণ্ঠস্বর সাগর গর্জনের মত গমগম করে। তক্ষকের সব কিছুই মনে দাগ কাটে। গল্প শ্রোতাদের মনে হত তক্ষক মানুষ নয়, ঈশ্বর প্রেরিত কোনো দূত। শ্রোতারা তার গল্প শুনতেই বেশি উৎসাহী।

তক্ষক নীরব। মুখে কুলুপ এঁটে থাকতে চায় সে। তার মৌনতায় অধীর হয়ে একজন বয়স্ক লোক অধৈর্য হয়ে বলল, তুমি কথা বলছ না কেন নতুন মানুষ? আমরা তোমার গল্প শুনতে এসেছি। তোমার রক্তবর্ণ দুই চোখের তারায় চিতাবাঘের হিংস্রতা জ্বলজ্বল করছে। কী ভয়ংকর তোমার চাহনি? চোখ ফেরাও অন্যদিকে। তোমার ওই চাহনি দেখলে ভয় করে। বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়।

শ্রোতাদের মধ্যে মধ্যবয়স্ক এক ব্যক্তি বলল, স্বর্গের পথ ভুল করে কি এদেশে এসেছ তুমি?

এরকম একটা অদ্ভুত প্রশ্নে তক্ষকের হাসি পেল, কিন্তু তার স্বভাবস্নিগ্ধ গাম্ভীর্যটুকু অটুট রেখে বলল : আমি তোমাদেরই লোক। আমার পিতৃপুরুষের দেশ ছিল তক্ষশীলা। আমার ধমনীতে নাগজাতির রক্ত বইছে। তবু কোনো সুদূরকালে আমাদের পূর্বপুরুষ ভাগ্যান্বেষণে খাণ্ডবপ্রস্থে গিয়েছিল।

চন্দ্রকান্ত বলল, সেখানে তো গৃহযুদ্ধ বেধেছে। সারা খাণ্ডববন নাকি গৃহযুদ্ধের দাবানলে দাউদাউ করে জ্বলছে। শুনতে পাই, এক জঘন্য কূট-রাজনীতির শিকার হয়েছে খাণ্ডবপ্রস্থের মানুষ।

তক্ষক একটু অবাক হল। অল্প সময়ের মধ্যে চন্দ্রকান্ত তার সম্পর্কে এত খবর সংগ্রহ করল কোথা থেকে? এই সন্ধানের উৎস কোথায়? খাণ্ডববনে গৃহযুদ্ধের পশ্চাতে তার ভূমিকা কী ছিল সেটা জানা অন্যায় নয়। এই জানাতেই তার কাছে সে আরো বিশ্বাসযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠল। গোপন পথে সংবাদ সংগ্রহে চন্দ্রকান্তর তৎপরতা এবং ক্ষিপ্রতা তাকে অভিভূত করল। কয়েকটা মুহূর্ত চুপ কবে থাকার পর বলল, এত খবর এই অল্প সময়ের ভেতর সংগ্রহ করলে কী করে? কৃষ্ণ-অর্জুনের কপটতার কাছে আমি হেরে গেছি। অসহায়ের মত কোনোরকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছি। পরিবার, পরিজন, পুত্র কন্যার ভাগ্যে কী ঘটেছে জানি না। অবস্থা একটু শান্ত হলে সুখদুঃখের স্মৃতিবিজড়িত মাটিতে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে আবার ফিরে যাব। বিশ্বাস কর বন্ধু, তক্ষশিলায় আমি থাকতে আসিনি।

বৃদ্ধ শ্রোতা জানতে চাইল, তাহলে এলে কেন? ভাই, পালিয়ে প্রাণ বাঁচানো যায় কিন্তু মান বাঁচানো যায় না। মান ছাড়া জীবনের কোনো গৌরব নেই।

তক্ষক কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারল না। অসহাযের মত বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে দীঘল কাজল কালো চোখজোড়া নামিয়ে নিল। একটু থেমে বলল, মান বাঁচানোর জন্যই তো পালিয়ে আসা। পালানো কোনো খারাপ কিছু নয়। ফিরে দাঁড়ানোর কৌশল। নির্বোধের মত অসম্মান, অপমান নিয়ে মরার কোনো গৌরব নেই। পাণ্ডবরাও শত্রুর চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য জতুগৃহ ভস্মীভূত করে কৌরবদের ধোঁকা দিয়ে আত্মগোপন করেছিল জিতবার জন্য। নিজেদের সিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্ব ফিরে পাওয়ার জন্য। তাদের কাছেই শিখেছি আত্মগোপন করা আর পালানো এক নয়, এটা একটা যুদ্ধ কৌশল। বন্ধু, যারা আমার প্রজাদের উস্কে দিয়ে অশান্তির আগুন ছড়াল, সমস্ত বনাঞ্চল জুড়ে জাতি-বর্ণ-বিদ্বেষের দাবানল সৃষ্টি করল, যাদের চিতার উপর ইন্দ্রপ্রস্থ তৈরি হল তাদের কথা আমি কী ভুলতে পারি? তাদের ক্ষমাই বা করব কী করে? আমার বুকের ভেতর প্রতিশোধের যে আগুন জ্বলছে বাইরে থেকে তা দেখা যায় না, জানাও যায় না। বন্ধুর দরদ, মমতা, সমবেদনা দিয়ে তাকে শুধু অনুভব করা যায়। চন্দ্রকান্ত আমার সেরকম বন্ধু।

ওর কথায় বিগলিত হল চন্দ্রকান্ত। তক্ষকের হাত দুটি ধরে দোলায় এনে বসাল। বলল, মন ভার করার সময় পাবে অনেক। এখন মন চাঙ্গা করার গল্প বল।

তক্ষক কথা বলবে কি? চন্দ্রকান্তর বন্ধুত্বপূর্ণ সমাদরে তার চোখ ঝাপসা হল। সমবেত শ্রোতার দিকে অশ্রুসিক্ত দুটি চোখ মেলে চেয়ে রইল। কষ্টের সঙ্গে শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে বলল : আপনাদের কৌতূহলিত জিজ্ঞাসা আমার অন্তরে তীরের মত বিঁধছে। আমার জীবনে যা ঘটেছে তার নাম দুর্ভাগ্য। সবচেয়ে দুঃখজনক হল কুরুকুলপতি ধৃতরাষ্ট্র আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি অবিচার করেছেন। তবু যা হয়েছে সবই দৈব-নির্ভর। বিধাতা বড় রসিক। এক হাত দিয়ে তিনি দেন, অন্য হাত দিয়ে তা ফিরিয়ে নেন। শেষপর্যন্ত জমাখরচের হিসেব মিলিয়ে তৃপ্ত হবার অবকাশ থাকে না। আমার বেলাতেও এর অন্যথা হয়নি।

বৃদ্ধ বলল : তুমি ভাই রসিক আছ। তোমার মধ্যে একজন দার্শনিক আছে। জীবনের সব কিছুকে রস রহস্যে ভরে নেবার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে তোমার।

দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারণ করল তক্ষক। জীবনের সব সাধ অনায়াসে কিংবা অক্লেশে পূর্ণ হয় না। জীবননদী বইতে বইতে এক পাড় ভাঙে অন্য পাড় গড়ে। এক হাত পূর্ণ হয় অন্য হাত শূন্য হয়। জমাখরচের খাতায় লাভ লোকসান দুটোই লেখা থাকে। যোগ-বিয়োগ করে স্থির করতে হয় কোনটা লাভ কোনটা লোকসান? লোকসান মানে হেরে যাওয়া, লাভ মানে জয়ী হওয়া। জয়টা জয়ই। তা কোনপথে কীভাবে হল, কেউ তা মনে রাখে না। আমার মনে রাখাব মত কোনো ঘটনা নেই। যা আছে তা লজ্জা এবং আত্মগ্লানির। এরকম না হলেই ভালো হত। মনের মধ্যে এত ব্যথা জমত না।

চন্দ্রকান্ত বলল, বন্ধু, দুঃখ, দুর্নামের অভিমানে তোমার বুকটা ভরে আছে। ওসব কথা নয়, মানুষের সুখ দুঃখ হাসির বিচিত্র জীবনকথা বল।

তক্ষকের কপালে চিন্তার বলিরেখাগুলো স্পষ্ট হল। বিষণ্ণ হাসিতে গালে ভাঁজ পড়ল। বলল, তোমাদের সবকিছু শোনা চাই। কিন্তু ভাই, জীবনের সব কথা কী সবার সামনে বলা যায়? উল্লেখযোগ্য সব ঘটনার মধ্যে অব্যক্ত কিছু থাকে। তবু তোমাদের মনের আনন্দের সঙ্গী হওয়ার জন্য এক অদ্ভুত গল্প বলব।

শ্রোতারা সমস্বরে বলল, খাণ্ডববনের তাজা গল্প চাই।

তক্ষক একটু ভাবল। তারপর নাটকীয়ভাবে শুরু করল খাণ্ডববনের তাজা গল্প। জীবনের গল্প। আরম্ভটা করল বড় অদ্ভুতভাবে।

আকাশ কালো মেঘে সমাচ্ছন্ন। ঋষিপুত্র মন্দপালের ভেতরটা উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠায় কেমন ব্যাকুল হয়ে উঠল। সঙ্গিনী লপিতাকে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল, আকাশে অত মেঘ কেন? না, না, ওতো মেঘ নয় — ধোঁয়া! আগুনের লেলিহান শিখা লাফিয়ে লাফিয়ে যেন কিছু আঁকড়ে ধরতে চাইছে। ওখানেই তো খাণ্ডববন, তাই না?

লপিতা বলল : বনভূমিতে আগুন লাগা তো নতুন ঘটনা নয়। এত বিচলিত হওয়ার কী আছে ?

আছে, আছে। ও তুমি বুঝবে না। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ ওখানে গচ্ছিত আছে। অগ্নির একটু কৃপা পেলে আমি ধন্য হয়ে যাই।

বিস্ময়ে দু'চোখ কপালে তুলল লপিতা। বলল, তাই বুঝি? লপিতার চেয়েও তারা তোমার কাছে দামি? কোন ভাগ্যবান তারা?

মন্দপাল অসংকোচে বলল, তারা আমার আত্মজ! আমার আত্মার স্ফুলিঙ্গ থেকে তাদের জন্ম। তারা আমার সন্তান। আমার সর্বস্ব। আমার ইহকাল, পরকাল।

অমনি এক হিংস্র ক্রোধে লপিতা ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মত মন্দপালের বুক থেকে ছিটকে গেল। দুচোখে আগুন জ্বেলে সরোষ বলল, ঋষি, তুমি মিথ্যেবাদী, আমাকে ঠকিয়েছ।

মন্দপাল নিরুত্তর। লপিতার কথা তার কানে গেল না। সে কি গভীর চিন্তায় মগ্ন। জীবনের এক মাহেন্দ্রক্ষণে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল লপিতার। প্রথম দর্শনেই ভালো লেগেছিল। বলল, মনের মধ্যে যাকে নিরন্তর খুঁজি সে তুমি।

এমন মনকাড়া কথা কার না ভালো লাগে? মন্দপাল অভিভূত হল। সহসা মুখে কোনো কথা জোগাল না তার। বলল, সুন্দরী একটা তীব্র মানসিক কষ্টের মধ্যে আছি, আমি চাই রমণীর প্রেম। চাই, সন্তানের পিতা হতে। বাল্যসখী ঋষিকন্যা জরিতা আমার প্রতীক্ষা করছে। তার কাছেই যাব আমি।

মন্দপালের দিকে বক্র কটাক্ষ হেনে লপিতা হাসল। বিদ্রূপের হাসি। বলল, যে নারীর প্রেমে পুত্রবান হবে, সে নারী কি প্রেমে আনন্দ দিতে পারে? তোমার সন্তানরা সাধের নারীর বুকের অমৃতে ভাগ বসাবে যখন, নিজেকে বড় হতভাগ্য মনে হবে। নারীসঙ্গ বঞ্চিত হওয়ার দুঃখে সন্তানদের ঈর্ষা করতে থাকবে। প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে হবে আপন আত্মজকে। তখন নিজের প্রিয় সন্তানদের সহ্য করতে পারবে না।

শুকনো গলায় মন্দপাল বলল, এটাই তো জীবনের নিয়ম। সব মেয়ের মধ্যে জায়া থেকে জননীর ভাগ বেশি।

তবু নারী হল মূর্তিমতী ভালবাসা। নারীকে ছাড়া ভালবাসা কোথাও নেই। কিন্তু যে জীবনের জন্য ভিতরে ভিতরে তুমি তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠেছ, দুদিন পরে সেখান থেকে ক্লান্ত হয়ে ফিরবে। কিন্তু আমার প্রেম পারে এ জীবনকে চিরমধুর করে রাখতে। আমার প্রেমে শুধুই চিরবসন্ত। শিশুর কণ্ঠস্বর থাকবে না তার মধ্যে। এ প্রেম শুধু তোমার আমার। এর মধ্যে কোনো ভাগাভাগি নেই। ছাড়াছাড়িও না। সবটাই তোমার আমার।

মুখেচোখে ভয়ের ভাব ফুটে উঠল মন্দপালের। বলল, আমার সব গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে লপিতা। ভয় করছে।

লপিতার বুকে হাল্কা রাগের বাতাস বয়ে গেল। বলল, মন্দপাল আমি শুধু প্রেমিকা হয়ে বেঁচে থাকতে চাই। সন্তান প্রেমের পথে বাধা। আমি তাই একাকিনী। হয়তো এভাবেই জীবন কাটাতে হবে।

মন্দপালের বুকটা করুণার আর্দ্র হয়। বলল, সুন্দরী, তোমার কথা সত্য হলে, ভিতরটা প্রেমে কাঙাল হলে তোমার কাছে ফিরে আসব।

একদিন সত্যিই সংসার ও সন্তানের মধ্যে মন্দপালের প্রেম হাঁফিয়ে উঠল। জরিতার কাছে থাকা সত্ত্বেও নিজেকে অপূর্ণ মনে হল। এক বুক তৃষ্ণা নিয়ে লপিতার কাছে ছুটে গেল। লপিতার প্রেমে ভরে উঠল সে। মনে হল, এই অনন্ত প্রেমই সে চেয়েছিল জীবনে। মন্দপাল ভুলে গেল জরিতা এবং তার সন্তানদের কথা।

মানুষ নিজেকে সত্যিই কম চেনে। তাই, মন্দপালকে একদিন কঠিন অগ্নিপরীক্ষার সামনে দাঁড়াতে হল। খাণ্ডববনের বিশাল অরণ্যে হঠাৎই প্রাকৃতিক কারণে আগুন লাগল। দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। সেই প্রলয়ংকারী অগ্নিশিখার আলোয় মন্দপাল দেখল নিজেকে এবং তার প্রেমকে। জীবনের পরম সত্যকেও আবিষ্কার করল সেই সঙ্গে। খাণ্ডববনের অগ্নিশিখা প্রশ্নে প্রশ্নে তাকে জর্জরিত করল। শিশুর কণ্ঠস্বর শোনা যায় না যে প্রেমে সেই অনুরাগদীপিত প্রেমসর্বস্ব জীবন সুন্দর, না সন্তানের কলরব ও ক্রন্দন মুখরিত যে প্রেমময় গৃহধর্ম বেশি সুন্দর? মনে হল, খাণ্ডববনের দাবাগ্নি তাকে জীবনসত্য চিনিয়ে দিল। তার পিতৃহৃদয় বিপন্ন শিশুদের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল। বলল : লপিতা, আমার স্বপ্ন, কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা সব খাণ্ডববনের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে হাওয়ার আগেই জরিতা এবং তার সন্তানদের কাছে পৌঁছতে হবে। ওদের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে আমি শঙ্কিত। আর অপেক্ষা করতে পারছি না। এখনই ওখানে যাওয়া জরুরি আমার।

ক্ষুব্ধ আক্রোশে লপিতা বলল, মিথ্যে কথা। শুধু সন্তানের জন্য নয়, তাদের সন্তানের জননীর জন্য তোমার অন্তঃকরণ কাঁদছে। বোধ হয়, এই অপূর্ণতার দুঃখ যন্ত্রণায় আর্ত হয়েছিল তোমার মন, কেবল জানতে না তাদের অস্তিত্বের কথা। যখন জানলে, আমার প্রতি তোমার কোনো টান থাকল না আর। আমার প্রেমের মধ্যে কী শুধুই ক্লান্তি!

মন্দপাল যেতে উদ্যত হলে লপিতা তার পথ আগলে দাঁড়াল। বলল, সত্যি করে বল ঋষি, কার জন্য তোমার হৃদয় ব্যাকুল হয়েছে? সে কী পুত্রদের ফিরে পাওয়ার জন্য, না তাদের জননীর কণ্ঠলগ্ন হওয়ার জন্য? কথা দাও সন্তানদের দেখে ফিরে আসবে আমার কাছে। যদি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হয় তাহলে আমার অভিশাপে তোমার পুত্রেরা ধ্বংস হবে।

শ্রোতাদের বুকের গভীর থেকে লম্বা শ্বাস পড়ল। সেই সঙ্গে দু'একজন থাকতে না পেরে মন্তব্য বরল, কী কঠিন মেয়েমানুষ রে বাবা!

তক্ষক ওদের কথায় কান দিল না। নিজের ভাবনায় নিমগ্ন হয়ে বলল, মন্দপালের মুখখানা শুকিয়ে গেল। করুণ চোখে লপিতার দিকে চেয়ে বলল, তুমি তো জননী নও তাই সন্তানের স্নেহ-মমতার মর্ম বোঝ না। শুধু সন্তানের মঙ্গলের জন্য তোমার কাছে ফিরে আসতেই হবে। নইলে তোমার আক্রোশ থেকে বাঁচবে না তারা।

অলক্ষ্যে লপিতা মন্দপালকে অনুসরণ করল। অগ্নির কৃপায় মন্দপালের কুটির এবং সন্তানদের কোন ক্ষতি হয়নি। অবাক হয়ে লপিতা দেখল, একে একে চারপুত্রকে কোলে

নিয়ে মন্দপাল আদর করছে, প্রলাপের মত কত অজস্র কথা বলছে। লপিতা আরো দেখল জরিতা নতমুখে স্বামীর সামনে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে আছে, আর মন্দপাল মুগ্ধ চোখে জরিতার দিকে চেয়ে রয়েছে। দেহহীন অব্যক্ত প্রেম যত নীরব এবং মৌন হোক না কেন তা অনির্বচনীয় সুন্দর। চোখের ভাষায় মুখের রেখায় তা বাঙ্ময় হয়ে উঠে। লপিতা এ প্রেমের মর্ম জানে না। তবু এই প্রথম অনুভব করল প্রেম শুধু দেহে হয় না, মনের প্রেমই প্রেম। মনের ভালবাসাকে বোধ হয় দেহ দিয়ে বাধা যায় না। প্রসন্নতায় দেহ মন স্নিগ্ধ হয়। লপিতা অন্তরাল থেকে দেখল, মন্দপালের সমস্ত হৃদয়খানি উন্মুখ হয়েছিল জরিতাকে একটু কাছে পাওয়ার জন্য। লপিতাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হয়ে জরিতাকে বুকে টেনে নিল সোহাগে। বলল, আর এখানে নয় জরিতা। চল, আমরা অন্য কোথাও চলে যাই। বিপদ আমাদের পিছু নিয়েছে। আমাকে হয়তো কোনোদিন ছাড়বে না।

কুটিরের অন্তরাল থেকে লপিতা খিলখিল করে হেসে উঠল। মনে হল ডাইনি হাসছে যেন রাতের অন্ধকারে। বলল, ধরা পড়ে গেছ মন্দপাল, লপিতা নয়, জরিতাই তোমার প্রেমিকা। তোমার প্রেম তার জন্যই বাধা। আমি হলাম স্রোতে ভেসে আসা ফুল।

মন্দপাল তার কঠিন প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করে ভয় পেল। লপিতার কিছু বলার আগে আর্তকণ্ঠে মন্দপাল বলল, ক্ষমা কর লপিতা। দিও না সর্বনাশা অভিশাপ। আমার অপরাধের শাস্তি দিতে শাপ দিও না আমার নিরপরাধ সন্তানদের। ওরা আমার প্রাণ, আমার জীবন। তোমার সব রাগ, অভিযোগ তো আমার ওপর। আমাকে অভিশাপ দাও।

জরিতা স্বামীকে আড়াল করে দাঁড়াল। বলল, না বোন, তোমার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমার সঙ্গে। আমি তোমার প্রেমের বাধা। আমাকে শাপ দিয়ে তোমার ক্ষোভ নিবারণ কর?

লপিতার অধরে হাসির ঝরনা। এক-পা, এক-পা করে মন্দপালের সন্তানদের দিকে এগিয়ে গেল। ভয়ে আঁতকে উঠল মন্দপাল। সভয়ে চিৎকার করে বলল, লপিতা তুমি তো রাক্ষসী নও। তুমিও নারী। মাতৃত্বে তুমিও সুন্দর হতে পার। তুমি শুধু প্রেমিকা নও। তুমি আমার প্রেম। ক্ষমা কর আমার শিশুসন্তানদের। ক্ষমা কর জরিতাকে।

মন্দপালের চারপুত্রকে কোলে নিয়ে চুম্বন করল লপিতা। তারপর নিজের কণ্ঠের ফুলমালা জরিতার গলায় পরিয়ে দিয়ে বলল, জয় হল তোমার। আমি হার মেনেছি যাদের কাছে তাদের মাকে এই মালা পরিয়ে দিয়ে মন্দপালের প্রেমকে সুন্দর করলাম। তোমার প্রেম বেশি সুন্দর মন্দপাল। তার কাছে হেরে যেতে কোনো লজ্জা নেই আমার। হেরে যাওয়াও যে কত সুখের, আনন্দের এবং শান্তির হয় তা তোমাকে না পেলে জানা হত না। সুখী হও তোমরা। তোমাদের জীবন আরো সুন্দর হোক।

অভিভূত হল মন্দপাল। তার কণ্ঠস্বর সহসা আর্দ্র হল। বলল, লপিতা তুমিও থাক আমাদের মধ্যে।

লপিতার অধরে বিষণ্ণ, মলিন হাসি। তাতেই অপরূপ দেখাল তাকে। বলল, আমি স্বপ্নের মানুষ। স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই। বিদায় বন্ধু বিদায়।

শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। গল্প শেষ হওয়ার পরও গোটা মজলিশটা স্তব্ধতায় থমথম করছিল। স্বপ্নোত্থিতের মত শ্রোতাদের মধ্যে থেকে একজন বলল, চমৎকার। সত্যিকারের জীবনের গল্প। চিরদিন মনে থাকবে, সেই সঙ্গে তুমিও মনে আঁকা থাকবে চিরকাল।

তক্ষক বিতাড়িত হওয়ার পরে খাণ্ডবপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যস্থাপনে কোনো বাধা রইল না। বিস্তৃত বনভূমি ধ্বংস করে নতুন রাজ্য ইন্দ্রপ্রস্থ নির্মিত হল। স্থাপত্য সৌন্দর্যে, নগরপরিকল্পনায় ইন্দ্রপ্রস্থ সবার নজর কেড়ে নিল। নগর তো নয় মর্তের অমরাবতী। নবনির্মিত প্রাসাদ ও রাজধানীর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে অনেকে পাণ্ডবদের শত্রুর চোখে দেখতে লাগল। নানারকম অপপ্রচারও হল। নিরীহ মানুষের রক্তে রাঙানো মাটির ওপর ইন্দ্রপ্রস্থের যে সৌধ নির্মিত হল তার প্রতিটি প্রস্তরখণ্ড মানুষের চোখের জলে ভেজা। স্বজন হারানোর দীর্ঘশ্বাসে অভিশপ্ত। নতুন রাজ্য পাণ্ডবদের সত্যি সহ্য হল না। নানারকম বাধাবিপত্তির মধ্যে দিয়ে তাদের দিন কাটল। যুধিষ্ঠির নিজেকে ধর্মপুত্র বলে অভিহিত করেও শান্তির ঘট প্রতিষ্ঠা করতে পারল না। রাজত্ব করার অল্পকাল পরেই বনবাসে যেতে হল তাদের। কার্যত রাজ্য অরক্ষিত থাকল তেরো বৎসর।

অপরপক্ষে নিজেদের অন্তর্বিদ্রোহে ও সংঘর্ষে খাণ্ডববনের অধিবাসীরা এতই শক্তিহীন হয়ে পড়েছিল যে খাণ্ডবপ্রস্থের ওপর পুনরাধিকার প্রতিষ্ঠা ও দাবি করাব সাহস ও মনোবল ছিল না তাদের। এমনকী সর্বজনমান্য একজন নেতাও ছিল না। তক্ষকের শূন্যতা এবং অভাব প্রতিমুহূর্তে সব গোষ্ঠীর মানুষ অনুভব করল। আস্তে আস্তে তারা বুঝল, একটা অপপ্রচারের শিকার হয়ে যে হঠকারিতা করল তার খেসারত তো দিতেই হবে তাদের। তাই পাণ্ডবদের ওপরে এক বিজাতীয় ঘৃণা, বিদ্বেষ তাদের মনে অঙ্কুরিত হল। পাণ্ডবদের ছত্রচ্ছায়ায় তারা বেশ সুখে-শান্তিতে এবং নিরুপদ্রবে বাস করত। তথাপি নিজের দেশে পরবাসী হয়ে থাকার যন্ত্রণায় চিত্ত ক্ষতবিক্ষত হত তাদের।

বাণিজ্য থেকে প্রত্যাবর্তন করে চন্দ্রকান্ত বণিক খাণ্ডববনের বর্তমান পরিস্থিতি এবং সেখানকার মানুষের মনের গতিবিধি সংক্রান্ত সব খবর দিল তক্ষককে। এছাড়া, তার মত দুঃসাহসী বীরপুরুষের নেতৃত্বের অভাবটা তারা ভীষণভাবে অনুভব করছিল। দুর্ভাগ্যের জন্য নিজেদের অদৃষ্টকে নয়, কৃষ্ণ-অর্জুনের প্ররোচনাকে দায়ী করছিল।

তক্ষক সব শুনেও নির্বিকার রইল। তাকে ভীষণ মৌন এবং নীরব দেখে চন্দ্রকান্ত বলল, চুপ করে আছ কেন? কিছু বল। আমার তো মনে হয়, খাণ্ডবপ্রস্থে প্রত্যাবর্তন

করতে হলে এখনই করা উচিত। কারণ, ইন্দ্রপ্রস্থ এখন অরক্ষিত। চার ভ্রাতা ও পাঞ্চালীর সঙ্গে যুধিষ্ঠির বনবাসী হয়েছে। বারো বছরের মধ্যে তারা ফিরছে না। প্রশাসন বলতে কিছু নেই। এটাই হল স্বদেশে ফেরার সঠিক সময় তোমার।

তক্ষকের কপালে ভাঁজ পড়ল। চিন্তার বলিরেখাগুলো দড়ির মত ফুলে ফুলে উঠল, আস্তে আস্তে নিজের উদ্বিগ্ন অসহায়তার উপর সে একটা একটা করে কথা বসাতে লাগল। বলল, আমিও মানি। কিন্তু খালি হাতে ফিরি কী করে? আমার ফেরা তো সাধারণ মানুষের মত নয়। অনেক কিছুর উপর ঝুলে আছে। প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হারানো নেতৃত্ব কেউ তুলে দেবে না আমার হাতে। ক্ষমতার তপ্তস্বাদ যে একবার পেয়েছে সে অন্যের হাতে তা সমর্পণ করবে না। ক্ষমতার মাদকতা রূপসী রমণীর যৌবন ভোগের মতই নেশাপ্রদ। বোধ হয়, তার চেয়ে বেশি বন্ধু। রমণীর নেশা কাটে কিন্তু ক্ষমতার মাদকতা কাটতে চায় না। একদিন প্রাণভয়ে জীর্ণবস্ত্রের মত যা ফেলে এসেছি তার গায়ে যে কাদা লেগে রয়েছে এই জ্ঞানটুক কদাচ হারাতে নেই। রাজনীতির আসরে এই জ্ঞানটুকু বাঁচিয়ে না রাখলে আনুগত্য দাঁড়ানোর জায়গা পায় না, পদ্মপাতার শিশিরবিন্দুর মত টলটল করে। বন্ধু যাদের নিয়ে, যে কৌশলের ব্যবহার করে আমি জিতব, তাদের হাতের পুতুল হয়ে থাকতে হবে। তাদের স্বার্থে ঘা লাগলে একেবারে নীচে নামিয়ে আনবে। অতীতের ভুল আর করব না। সংগ্রামে নামব বলে মনে মনে যে সংকল্প করেছি তাতে জয়ী হওয়া আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। আমি আর হারতে এবং হারাতে চাই না।

আঙুরের থলে থেকে একটা একটা করে আঙুর ছিঁড়ছিল চন্দ্রকান্ত আর গালের মধ্যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছিল। গভীর মনোযোগ দিয়ে তক্ষকের কথাগুলো শুনল। তার মনের অস্থিরতা এবং বিপন্নভাবটা লক্ষ্য করে বলল, এসব কথা আমারও যে মনে হয়নি তা নয়। তবে তোমার মত এত গভীর করে ভাবার প্রয়োজন হয়নি। সে যাই হোক, বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তুমি কী করবে বলে স্থির করেছ।

তক্ষক বলল, একটা কথা মাথার মধ্যে ঘুরছে। যারা আমার নেতৃত্ব ভাঙার ষড়যন্ত্র করল তাদের মেরুদণ্ড ভাঙতে না পারলে আমার তৃপ্তি নেই। ক্ষমতার নেশা আছে জানি, কিন্তু এ জেদ আমার নেশাজাত নয়। খাণ্ডববনে আমাকে ফিরতেই হবে। কিন্তু তার আগে পায়ের তলায় একটু মাটি চাই। সব কিছুর জন্য চাই একটা অনুকূল পরিবেশ। সে পরিবেশ তৈরি না করে সেখানে যাই কী করে?

চন্দ্রকান্ত বলল, সকলে তোমাকে চায় কিন্তু। জনতার দাবিকে উপেক্ষা করার কোনো অধিকার তোমার নেই।

জনতা! বিস্ময়ে উচ্চারণ করল তক্ষক। অধর কোণে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের একটুকরো হাসি ফুটল। বলল, জনতা কে? কোথায় তাদের অস্তিত্ব। তারা ছা-পোষা শ্রমিক, চাষি, মজুর। রাজনীতির কী বোঝে তারা? তাদের চাওয়া ভরসা করে বোকারা। তাদের চাওয়া না

চাওয়ায় কিছু এসে যায় না। তবু, তাদের সামনে রেখে রাজনৈতিক ফয়দা লোটাই নিয়ম। সাধারণ মানুষ এই রাজনৈতিক সত্যের মর্ম বোঝে না বলে স্বার্থান্বেষীরা তাদের দিয়ে যা খুশি করায়। যদি রাজনীতি বুঝত তা-হলে, খাণ্ডববনে অত বড় হঠকারিতা সৃষ্টি করে নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারত না। যাই হোক, খাণ্ডববনে নাগদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। কিন্তু তার জন্য খাণ্ডববনের বাইরে একটা নিরাপদ আশ্রয় চাই। তক্ষশিলায় বসে বিদ্রোহ, বিপ্লবের সে নকশা যদি করি, রাজনৈতিকভাবে তুমি আমায় সাহায্য করবে তো।

বিস্ময়ে চমকে তাকাল চন্দ্রকান্ত। একটু ভেবে বলল, রাজনীতির কঠিন কথার মর্মার্থ বুঝি না। তবে তোমার মত আমার রক্তেও নাগজাতির রক্ত বইছে। রক্তের টানেই তোমার পাশে আছি এবং থাকবও।

তক্ষক অভিভূত হল। চন্দ্রকান্তর কথার তাই জবাব দিতে পারল না। বেশ কিছুক্ষণ এক অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা থমথম করছিল। চন্দ্রকান্ত তার নীরবতায় অসহিষ্ণু হয়ে বলল, কিছু বলবে তো।

তোমার মত সমস্ত নাগজাতিকে আমার পাশে পেতে চাই বন্ধুর মত, সহকর্মীর মত। মুশকিল হল নাগেরা ছড়িয়ে আছে। তাদের দলে পাওয়াটা খুব জরুরি। অন্তত বাইরে থেকে তাদের রাজনৈতিক সমর্থন এবং সাহায্য পেলেই হবে।

চন্দ্রকান্ত বণিকের তৎপরতায় তক্ষশিলার অভিজাত মহলে তক্ষকের যাওয়া-আসা লেগে রইল। দিন দিন তার খাতির বাড়তে লাগল। ব্যক্তিত্বের চুম্বক আকর্ষণ তাকে স্বল্পদিনের ভেতর একটা বিশেষ জায়গায় পৌঁছে দিল। তক্ষশিলায় সে আর অপরিচিত নয়। এদেশের মানুষও বন্ধুভাবে নিয়েছে তাকে। থাকতে থাকতে তক্ষকও এদেশকে, এদেশের মাটি-মানুষজন, এদেশের আকাশ-বাতাস, ধুলোর গন্ধ, সূর্যাস্তের রঙ সবকিছুকে এত গভীর করে ভালবেসে ফেলল যে সাধারণ মানুষও তা অনুভব করত। ভাললাগা আর ভালবাসার সত্যি একটা গন্ধ থাকে আলাদা। ফুলের সুবাসের মত তা আপনা থেকেই চারপাশ সুরভিত করে। সে সুগন্ধ নাক ভরে নিতে ভাল লাগে। আবার তার কথায় এত মাধুর্য যে তা অন্তরে সুধাসিন্ধু বইয়ে দিতে পারে।

মনটা ক'দিন ধরে আনচান করছিল তক্ষকের। কিছু ভাল লাগছিল না। কেবলই মনে হচ্ছিল, স্বপ্ন মরে আছে পায়ের কাছে শীতের বিকেলের মরা রোদের মত। কত কি ভাবে তবু কিছুই করা হল না। অথচ, কত কিছু করতে ইচ্ছে করে। এ জীবনে কটা ইচ্ছেই-বা পূর্ণ হল তার?

তবু জীবনে এমন অনেক কিছু ঘটনা ঘটে যায়, যা না ঘটলে একজন মানুষের জীবনটা ইতিহাস হয়ে উঠত না। এক-একজন মানুষ থাকে যারা নিজেদের অজান্তে

ইতিহাসের নায়ক হয়ে ওঠে। দেশকাল-এর ঘূর্ণিপাকে এমন করে জড়িয়ে পড়ে যা থেকে তার পালানোর পথ থাকে না আর। সব মানুষই বৃহতের স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে। ঘটনার উত্তাপে তার অন্তরে ঘুমন্ত সকল আকাঙ্ক্ষাগুলো জেগে ওঠে। তক্ষকের বেলাতেও হল তাই।

তক্ষক কী ভাবতে পেরেছিল তক্ষশিলার রাজা হবে সে! অথচ, একদিন সত্যি সত্যি সে রাজা হল তক্ষশিলার। এজন্য তাকে যুদ্ধ করতে হয়নি, চক্রান্ত করতে হয়নি, তদ্বির করতেও হয়নি। তক্ষশিলার লোকেরা একরকম জোর করে তাকে সিংহাসনে বসিয়ে দিল। সৌভাগ্য, আচমকা রাজমুকুট পরিয়ে দিল। সে এক বলার মত গল্প তক্ষকের

একদিনের জ্বরে মারা গেল তক্ষশিলার রাজা। রাজ্য জুড়ে শোক পালিত হচ্ছিল। সাতদিন ধরে এরকম চলল। তারপর নতুন রাজার অভিষেক হবে বেশ সমারোহ করেই। নতুন রাজা নির্বাচন এবং তাঁর অভিষেক আর পাঁচজন রাজার মত হয় না। একেবারে অভিনব। বংশপরম্পরায় রাজবংশ রাজত্ব করতে পারে না তক্ষশিলায়। সিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্ব কখনও মৃত রাজার সন্তান-সন্ততির মধ্যে বর্তাবে না। রাজা মারা গেলে তার জায়গায় নতুন রাজা হবে জনগণের মনোনীত। সেজন্য একদল প্রবীণ ব্যক্তি তক্ষশিলা ঘুরে ঘুরে ভাল বংশের ছেলে, ভাল স্বভাব-চরিত্রের মানুষ এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, বুদ্ধিদীপ্ত, তেজদৃপ্ত রাজচক্রবর্তীর চিহ্ন এবং লক্ষণযুক্ত একজন মানুষকে নির্বাচন করে। কিন্তু যাকে নির্বাচন করা হল, সে যে রাজা হবে তা জানানো হয় না তাকে। এমনকী অভিষেকের সময়ও সে তার বিন্দুবিসর্গ জানতে পারে না। কারণ, রাজা হওয়ার জন্য অনেকগুলো পরীক্ষা দিতে হয়। সেই পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলে তার মাথায় মুকুট পরিয়ে দেয় রাজপুরোহিত।

রোজই প্রত্যুষে কলরব মুখরিত নদীর জলে স্নান করে সূর্যবন্দনা করে তক্ষক। হঠাৎ একদল লোক হৈ হৈ করে জড়ো হল সেখানে। তক্ষক ভাবল, এরা দল বেঁধে নদীতে স্নানে এসেছে। তাদের জায়গা করে দেওয়ার জন্য নদী থেকে তীরে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু লোকগুলোর একজনও বিতস্তায় নামল না। গোল হয়ে ঘিরে ধরল তাকে। কিন্তু কেন? নিজের অজান্তে তবে কী কোন অপরাধ করল? যথাসম্ভব নিরাবেগচিত্তে নিজেকে শান্ত ও সংযত রাখার চেষ্টা করল। কিন্তু লোকগুলোর অদ্ভুত আচরণ তাকে অবাক করল। বিস্ময় কাটার আগেই লোকগুলো অকারণে কুশ্রীভাষায় তাকে গালিগালাজ করতে লাগল। তার সংযম ও সহিষ্ণুতার বাঁধ ভেঙে দেওয়ার জন্য মুখে একরাশ থুতু ছিটিয়ে দিল। পাল্টা প্রতিরোধ সৃষ্টির আগেই দলবদ্ধ হয়ে কিল, চড়, লাথি মারতে লাগল তারা। আচমকা এই আক্রমণের কোনো কারণ ছিল না। তবু নির্দয়ভাবে সে প্রহৃত হল। ভিড়ের মধ্যে হাত বাড়িয়ে যারা মারতে পারল না নিষ্ফল আক্রোশে তাকে লক্ষ্য করে ধুলোকাদা ছুড়তে লাগল তারা। এমনকী তক্ষকের চোদ্দপুরুষ তুলে গালমন্দও করল। চিৎকার,

চেঁচামেচি, ধস্তাধস্তির মধ্যে তক্ষকের প্রাণান্তকর অবস্থা হল। মুখ চোখ তার ফুলে গিয়েছিল। অনেক জায়গায় কালশিটে দাগ পড়েছিল। অনেক জায়গায় ক্ষত হয়ে রক্ত ঝরছিল।

অত্যাচারের পর্ব শেষ হলে লোকেরা বলাবলি করছিল কী মানুষ রে বাবা, শরীরে রাগ নেই। এত হেনস্তা হল, এত মার খেল তবু ফোঁস করল না। গাল-মন্দও করল না। লোকটি জানে না একটু পরে আমরা ওকে রাজা করব। তখন ও হবে আমাদের দন্ডমুন্ডের কর্তা। ওর আদেশ নির্দেশ সব মেনে চলতে হবে। কিন্তু যতক্ষণ তা না হচ্ছে ততক্ষণ না হয় মনের সুখে যা পারি করে নিই। নিজেদের মধ্যে ফিস্‌ফিস্ করে এসব কথা বলা-কওয়া করে তারা আবার কিল, চড়, লাথি মারা শুরু করল। চলল অনেকক্ষণ ধরে।

জনতার হাতে তক্ষক শুধু প্রহৃত হল না, জনতা তাকে ঘিরে রাখল। সারা শরীর জুড়ে তার যন্ত্রণা। দেহটা নুয়ে পড়ছিল। হাঁটু কাঁপছিল। দাঁড়ানোর মত পায়ে বল ছিল না। ঐ অবস্থায় জনতা বন্দী করে তাকে হাঁটিয়েই রাজবাড়ি আনল। সেখানে তখন উৎসবের ধুম লেগেছিল। তক্ষকের আসার পরেই গোটা অঞ্চলটা রূপ-রঙ, পরিবেশ নিমেষে বদলে গেল। অভ্যর্থনা করার জন্য সুবেশা সুন্দরী রমণীরা বিশাল অলিন্দে প্রতীক্ষা করছিল। দীপ জেলে বরণ করল সদ্যপ্রয়াত রাজার রানী কস্তুবা। কপালে চন্দনের তিলক পরিয়ে দিল।

স্নানগৃহে এনে তার ধূলিমাখা বসন, ধূলিধূসরিত গায়ে গন্ধবারি ছিটিয়ে সারা অঙ্গ পরিষ্কার করা হল। তারপর রাজকন্যা নানা সুগন্ধী জলে তক্ষকের ক্ষতস্থানগুলো ধুয়ে, শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে ওষুধ লাগাল। তার কোমল হাতের সেবা, যত্ন ও পরিচর্যা পেয়ে তক্ষক চাঙা হল। এত খাতির যত্ন পাওয়ার পর লাঞ্ছনার কষ্ট ও গ্লানির কিছু উপশম হল। তাকে নিয়ে এত কাণ্ডকারখানার রহস্যটা যে কোথায় তার বিন্দুবিসর্গ আঁচ করতে পারল না। তবে যা কিছু হচ্ছিল তা দেশের লোকাচার এবং প্রথা মেনেই হচ্ছিল।

রাজসভায় নয় রাজগৃহের প্রাঙ্গণের বিশাল চত্বরে তক্ষককে আনা হল। স্থানটি আগেই লোকে লোকারণ্য হয়েছিল। তক্ষক আসতেই জনতার মধ্যে ঠেলাঠেলি পড়ে গেল। রাজপুরোহিত হাত উত্তোলিত করে শান্ত হওয়ার আবেদন করল। তারপর রাজপুরুষরা একে একে তক্ষককে মাল্যশোভিত করল। মাল্যদানের পর্ব শেষ হয়ে গেলে রাজপুরোহিত জনতাকে উদ্দেশ করে বলল, রাজা হওয়ার সব গুণ তক্ষকের আছে। রাজপুরোহিতের বাক্যে রোমাঞ্চিত হল তক্ষক। একজন বিদেশি হয়ে এত বড় সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়ার বিস্ময়ে তার দুই চোখের কোণ সিক্ত হল। মুহূর্তের জন্য আত্মবিস্মৃত হয়েছিল তক্ষক। রাজপুরোহিতের কণ্ঠস্বরে তার আত্মবিস্মৃত ভাবটা দূর হল।

রাজপুরোহিত বলছিল, তক্ষক বীর হওয়া সত্ত্বেও শক্তির বড়াই করেনি। বরং জনতার আক্রমণ এবং লাঞ্ছনা সকৌতুকে অবহেলা করল। তার সহিষ্ণুতায়, ক্ষমায়, মহানুভবতায়

আমরা মুগ্ধ। ইচ্ছা করলে জনতার নির্যাতনের প্রতিরোধ করতে পারত। কিন্তু সে তা করেনি। সবদিক বিবেচনা করে আমরা তাকে তক্ষশিলার রাজপদে বরণ করেছি। এখন থেকে তাঁকে তক্ষশিলার রাজা বলে আমরা মান্য করব। তাঁর আদেশ-নির্দেশ সব মানব।

ঘোষণা শেষ হলে রাজকন্যা তানানা তক্ষকের মাথায় পাতার মুকুট পরিয়ে দিল। ধন্যধন্য করল সকলে। করতালি দিয়ে নতুন রাজাকে অভিনন্দিত করল জনগণ। তক্ষক অভিভূত। কথা বলার মত অবস্থা ছিল না তার।

এখানে শেষ নয়। ছ'দিন ধরে চলল উৎসব। এই কটা দিন রাজাকে বিনিদ্র থাকতে হয়। ক্লান্তিতে চোখ বুজে এল তক্ষকের। তবু বিশ্রাম নেবার উপায় নেই। এমনকী দু'চোখের পাতা পর্যন্ত এক করতে পারল না। কারণ, এটা হল তাদের প্রতীকী প্রথা। সংকটকালে প্রজাদের ভাবনা রাজাকেই ভাবতে হয়। সিদ্ধান্তও নিতে হয় তাঁকে একা। তাই রাজার প্রজাপালনের আন্তরিকতা পরখ করার জন্য অভিষেকের সময় রাজাকে নানাভাবে পরখ করতে হয়। সসম্মানে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে রাজবেশ পরানো হয় তাঁকে। প্রবীণ রাজকর্মচারী তাঁকে সতর্ক করে বললেন, সিংহাসন হল রাজার সুখ ও বিলাসের জন্য নয়। প্রজাসাধারণের মঙ্গল ও কল্যাণ দেখা হল তাঁর কর্তব্য। দেশের মানুষের বিপদে আপদে রাজা তাদের পাশে থাকবে। সন্তানের মত পালন করবে।

কথাগুলো মন দিয়ে শুনল তক্ষক। অভিষেকের অভিনবত্ব তক্ষককে আপ্লুত করল। সখী পরিবৃত হয়ে রাজকন্যা তানানা বরমাল্য দিয়ে নতুন রাজাকে পতিত্বে বরণ করল। নতুন রাজা নতুন রানির হাত ধরে সিংহাসনের পাশে বসাল। তারপর সভাস্থ ব্যক্তিবর্গকে উদ্দেশ করে বলল : বন্ধুগণ, আমার ভাগ্যই আমাকে তক্ষশিলার অধিপতি করল। এদেশের রাজা হয়ে আমি শপথ করছি, আমার রাজত্বের শেষদিন পর্যন্ত প্রজারা যাতে দুধেভাতে থাকে মহাসুখে ও মহানন্দে দিনাতিপাত করতে পারে তার সব ব্যবস্থাই থাকবে। অশুভ শক্তির বেলাতেও তাই।

তক্ষকের ঘোষণা শেষ হওয়ার পরে একজন অপরাধীকে দড়ি দিয়ে পিঠমোড়া করে বেঁধে তার সামনে হাজির করা হল। ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিল লোকটি। রাজার একটি বাক্যের উপর তার বাঁচা-মরা নির্ভর করছিল। সবটাই রাজার মর্জি। হাতজোড় করে লোকটি রাজার করুণা চাইছিল। রাজপুরোহিত বলল, রাজা, মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত এই লোকটিকে আপনার কোষবদ্ধ তরবারি দিয়ে দুষ্টকে দমন ও শাসন করার শপথ পালন করুন।

হকচকিয়ে গেল তক্ষক। যুদ্ধে মানুষকে শত্রু মনে করে হত্যা করতে একটুও হাত কাঁপে না। কিন্তু সেই হাত তার ঠকঠক করে কাঁপছিল। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লোকটি হাউমাউ করে তার করুণা ভিক্ষা করতে লাগল। তক্ষকের অন্তরের মধ্যে কেমন একটা করুণা গলে গলে পড়ছিল। তক্ষক অবাক হয়ে দেখছিল, কী ব্যাকুল কৃপা প্রার্থনা তার দু' আঁখি-তারায়। লোকটাকে শাস্তি দিতে তক্ষকের মায়া হল। ঠাণ্ডা মাথায় অতর্কিতে একজন অপরাধীকে নিজের হাতে শিরচ্ছেদ করা যে কত কঠিন কাজ আগে জানা

ছিল না। দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা সে। তার নিজের ইচ্ছেই শেষ কথা। বিচারকের সিদ্ধান্ত অমান্য করলে আইন অমান্য কবা হয়। তারও উচিত নয়, স্বেচ্ছাচারিতা প্রশ্রয় দেওয়া। তবু এক গভীর সংকটে পড়ল তক্ষক। মরিয়া হয়ে একবার তাকাল রাজকন্যা তানানার দিকে। বীভৎস মৃত্যু দেখার আগেই সে চোখ বুজে ছিল। একটা দুরন্ত ভয়ে তার সুন্দর মুখখানা মলিন, বিবর্ণ এবং বিষণ্ণ। জনতা উৎকণ্ঠিত কৌতূহল নিয়ে কিছু একটা হওয়ার প্রহর গুনছিল। নৈঃশব্দ্যের মধ্যে সারি সারি মানুষগুলো অসহায়ভাবে রাজার দিকে তাকিয়ে ছিল। অপরাধী দু'চোখ বন্ধ করে জীবনদীপ নিভে যাওয়ার আশঙ্কায় শেষ মুহূর্তটির প্রহর গুনছিল।

দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংশয়ের অবসান ঘটল অবশেষে। তক্ষক মুক্ত কৃপাণে অপরাধীর দিকে এগিয়ে গেল। কৃপাণের তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ দিয়ে তার হাতে একটু খোঁচা দিয়ে রক্ত বের করল। অপরাধী চোখ খুলে তার রক্তঝরা ক্ষতের দিকে চেয়ে রইল।

তক্ষকের অধরে টেপা হাসি। বলল, তোমার শাস্তি হয়ে গেল। একজন মানুষকে হত্যা করার সময় তার অনুভূতি কী হয় নিজেকে দিয়ে তো অনুভব করলে। সব মানুষের ক্ষেত্রেই বাঁচার জন্য এমন হয়। এ কথাটা জীবনে কখনও ভুলবে না। মানুষের সমব্যথী হয়ে বেঁচে থাক। যাও, মুক্ত তুমি।

অপরাধীর সংশয় কাটে না। দু'চোখে তার অবিশ্বাসের ঘোর। তক্ষকের ক্ষমার আলো পড়ে মুখখানি লাবণ্যময় হয়ে উঠেছে তার। বিগলিত গলায় বলল, আপনি মহান। আপনার ক্ষমায় নবজীবন পেলাম। ভীষণ মৃত্যুভয়ের আতঙ্ক মুক্ত হওয়াও যে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর নবজীবন লাভ করা আপনার ক্ষমা না পেলে তা জানা হত না। অস্ত্রের সামান্য খোঁচাটুকুর মধ্যে মৃত্যুর এক আতঙ্কময় বিভীষিকা যে কী ভয়ংকরভাবে লুকনো ছিল সারা শরীরে তার এক কষ্টকর অনুভূতির শিহরন লেগে রইল। মনে হচ্ছে আমি মরে যেন নতুন করে বেঁচে উঠলাম।

তক্ষকের অধরে স্ফুরিত হাসি। বলল, তাই বলে, কোনো অধর্ম, অন্যায় কিছু করিনি। যা করেছি তাও স্বেচ্ছাচার নয়। একটু ভাবলেই স্পষ্ট অনুভব করতে পারবেন, আইন, ধর্ম, নীতি মেনে রাজধর্ম ও কর্তব্য সাধন করেছি। একটা প্রতীকী খুনেই অপরাধের মৃত্যু হয়েছে। অপরাধী নতুন জীবন পেয়েছে। মৃত্যুভয় থেকে মুক্ত হয়ে নতুন বিশ্বাসে বেঁচে ওঠার নাম পুনর্জীবন লাভ। অপরাধ থেকে অপরাধীর উত্তরণের অপর নাম জন্মান্তর।

যুক্তির অমবদ্যতায় এবং বাচনভঙ্গির চমৎকারিত্ব উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ এবং প্রবীণদের অভিভূত করল। যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দ সভাসদবর্গের সারা শরীরে এক অদ্ভুত পুলকানুভূতির শিহরন তুলল। সবাই মিলে সাধু, সাধু করল।

তিন

তক্ষশিলার অধিপতি হয়ে তক্ষক ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা নাগ বংশোদ্ভূত নাগকুলকে জাত্যভিমানের নিবিড় বন্ধনে বাঁধার জন্য এক মহাসম্মেলনের আয়োজন করল। এই সভার আহ্বায়ক তক্ষক। নাগজাতির পারস্পরিক সম্পর্ককে উন্নত করা, সৌহার্দ্য, ও সম্প্রীতির পরিবেশ তৈরি করার প্রয়োজন ব্যাখ্যা করল। পরিশেষে বলল, সবাই মিলে চাইলে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ঐক্য হওয়া কোনো অসম্ভব ঘটনা নয়। অতীতে দেখা গেছে নাগজাতিরা মিলেমিশে থাকতে পারে না। ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও ঘৃণা নিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে। সম্পর্ক ছিন্ন করে অন্যত্র চলে গেছে। অস্তিত্বের এই সংকট যদি নাগজাতি কাটিয়ে উঠতে না পারে তাহলে একদিন মুছে যাবে তারা। আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সময় হয়েছে। সেজন্য বংশগৌরব বোধটি মনের মধ্যে অনুক্ষণ জাগিয়ে রাখতে হবে। তাই অনুশাসন মেনে চলতে হবে স্ত্রী-পুরুষ সকলকে।

কথাগুলো বলার পর তক্ষক কিছুক্ষণের জন্য থামল। কার কী প্রতিক্রিয়া হয় সেটা বোঝার জন্যই সকলের মুখ নিরীক্ষণ করল। প্রত্যেকের মুখে চোখে একটা আগ্রহের ভাব ফুটে উঠল। বলল, আমরা সকলেই নাগ। স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে নাগচিহ্ন ধারণ করলে জাত্যভিমানের নিবিড় বন্ধনে নাগকুল বাঁধা পড়বে। অন্যদের থেকে আলাদা করে নাগরা নাগদের চিনবে এবং ভাই বলে সমাদর করবে। এক পরিবারবোধে উদ্বুদ্ধ হবে তারা। বিপদে-আপদে প্রত্যেকে তারা প্রত্যেকের হয়ে পাশে দাঁড়াবে। এভাবেই পারস্পরিক সহযোগিতা ও ঐক্যের এক বাতাবরণ সৃষ্টি হবে। বিপদে-আপদে এবং দুর্দিনে নাগরাই যদি নাগেদের পাশে না দাঁড়ায় তাহলে ভরাডুবি থেকে এ জাতকে কেউ কূলে পৌঁছে দিতে পারবে না। আজ তাই অঙ্গীকার করার দিন। আমি শুধু সেই বার্তা বহন করে এনেছি।

তক্ষকের কথাগুলো সকলে মন দিয়ে শুনল। তার যুক্তিগুলি ছিল অকাট্য। নাগকুলমণি শেষনাগ সকলকে উদ্দেশ করে বলল, জীবন ও জীবিকার কারণে নাগকুল আজ ছন্নছাড়া। আত্মস্বাতন্ত্র্যের কথা তারা ভুলতে বসেছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নাগকুল ছড়িয়ে থাকলেও তাদের নিয়ে যে ঐক্য সম্ভব এবং তারা যে আবার বিরাট জনশক্তি হতে পারে তক্ষকের মত করে কেউ ভাবেনি। বরং কর্তব্য ভুলে নিজেদের কাছ থেকে দূরে থেকেছি। কেউ কারো পাশে দাঁড়ানোর চিন্তা করেনি, কিন্তু তক্ষক অন্য ধাতুর মানুষ। সাহস করে একবার রুখে দাঁড়ালে ভয় পালিয়ে যায়। ভয় তাড়ানোর জন্য চাই অস্ত্র। হাতিয়ার হল শক্তির উৎস। তক্ষক আমাদের মরাপ্রাণে নতুন করে জীবন সঞ্চার করল। এক নতুন গণজাগরণের মন্ত্র দিল। আমি বিশ্বাস করি, এবার নাগরা এককাট্টা হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে।

শেষনাগের কথাগুলো শুনতে ভাল লাগছিল তক্ষকের। মনে হচ্ছিল, দিগ্বিজয় করে যেন ফিরে এসেছে সে।

বাসুকিনাগ মনে সংশয় এবং দ্বিধা রেখে বলল, নাগকুলকে একত্রিত করে বৃহত্তর নাগরাজ্য গঠনের যে স্বপ্ন তক্ষক দেখছে এবং অন্যদের দেখাচ্ছে, তার সাফল্য আমিও চাই। কিন্তু যে অধীনতা নিয়ে নাগেরা বিভিন্ন রাজ্যে বসবাস করছে এই বোধের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যদি গতানুগতিক জীবনযাপন থেকে মুক্ত হতে পারে তাহলে সর্বাধিক খুশি হব আমি। তাই বলছিলাম, কোনো কিছু চাইলেই তা হয় না। তবে হাঁ, জাতীয় সংকট এবং জাতীয় বিপর্যয় জাতিকে বিভেদ-বৈষম্য ভুলতে দ্রুত সাহায্য করে। সংকটেই মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়। সকলকে এক জায়গায় করে তক্ষক যেভাবে ঐক্যপ্রস্তাবে সর্বসম্মতি আদায় করল তার বিরুদ্ধে আমার কোনো নালিশ নেই। তবু সংশয় থেকে যায়। কারণ, রাজনৈতিক স্বার্থে যারা সহমত পোষণ করল তারা যে ব্যক্তিগত দুর্বলতায় অথবা প্রলোভনে শত্রুতা করবে না তার অঙ্গীকার কিন্তু কেউ করল না। মানুষ বড় স্বার্থপর বলেই ভয় হয়। এমনও হতে পারে, তক্ষক নিজেও তা থেকে মুক্ত নয়।

বাসুকির অদ্ভুত কথার প্রত্যুত্তরে তক্ষক মুখ টিপে হাসল। বলল, সন্দেহ করা সহজ। সন্দেহ করা ভালোও। তাতে সন্দেহমুক্ত হওয়ার জন্য সাবধান থাকা যায়। তবু বলি, আপনার নঞর্থক কথার কোনো মাথামুণ্ডু নেই। শিশুকে মানুষ করে কী লাভ, বড় হওয়ার আগে সে তো মরে যেতে পারে, এ হল সেরকম প্রশ্ন। সন্দেহের বিষে মনটাকে বিষিয়ে দেওয়া কোনো কঠিন কাজ নয়, কিন্তু সন্দেহের মাটিতে বিশ্বাস ও আনুগত্যের বীজ রোপণের জন্য তাকে ভালো চাষি হতে হয়। সন্দেহ একবার মনে জাগলে মরীচিকার মত টানে। বিচারবুদ্ধি লোপ পায়। কার কোন কথায় ইতিহাস কীভাবে প্রতিশোধ নেবে মানুষ জানে না। তাই বলছি, নিজের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ। খল মানুষের কথায় বিভ্রান্ত হওয়ার খেসারত একজন মানুষকে জীবনভর দিতে হয়। শুধু নাগজাতির কথা ভাবুন। কী করলে একটা ঐতিহ্যসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ জাতি পুনরায় গৌরবের অধিকারী হতে পারে দিবারাত্র তার জপ করুন।

অনন্তনাগ তক্ষকের কথায় আপ্লুত হল। বাসুকিনাগকে কটাক্ষ করে বলল, তক্ষকের যোগ্যতাকে আমি সমাদর করি। আমাদের চাওয়া না-চাওয়ার ওপর তার নেতৃত্ব নির্ভর করে না। নিজের কর্মকুশলতার গুণে নাগকুলের সবার ওপর নিজের স্থান করে নিয়েছে। আমি মনে করি, তার নেতৃত্বে নাগজাতির এক গৌরবময় উত্থান হবে। যে কথা আমরা কেউ ভাবিনি অথচ ভাবা যেত এবং যার দায়িত্ব গ্রহণের দায় আমরা সযত্নে এড়িয়ে গেছি তক্ষক সে কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে আমাদের চোখ খুলে দিল। আশ্চর্যের কথা, ভারতবর্ষের নাগজাতিরা ভীষণভাবে চাইছিল জাতিসত্তার গৌরব, মর্যাদা এবং অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকার সম্মান। মনের গোপনে লুকোনো ইচ্ছের দরজাটা কেউ হাট করে খুলে ধরেনি। তক্ষকই সাহসের সঙ্গে, প্রত্যয়ের সঙ্গে সেই কাজটা শুধু করল না সমগ্র নাগজাতিকে নিয়ে তক্ষশিলায় এক মহাসভাও করল।

তক্ষক কিছু বলতে চেষ্টা করলে অনন্তনাগ তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, তোমার কথার মধ্যে আমি কোনো বাধা দিইনি। আমার কথা শেষ হলে তুমি বলবে। তারপর

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনারাও অনুভব করেছেন তক্ষকের অসাধারণত্ব। তাই তার প্রস্তাবে কেউ না করল না। সকলের চোখে স্বপ্ন। ভারতসভায় নাগেরা আবার তাদের পূর্ব-গৌরব ফিরে পাবে। তবু ছিদ্রান্বেষণ করা মানুষের স্বভাব। ওঁর কাজের জন্যই ওঁকে শ্রদ্ধা করি। সকলকে নিয়ে সকলের সঙ্গে মিলে সকলকে সমান সম্মানে সমবেত করে কাজ করার যোগ্যতা শুধু তক্ষকের আছে। আমি আরো বিশ্বাস করি, তাঁর হাতেই আছে জনজাগরণের চাবিকাঠি। নাগকুলকে আত্মসচেতন করে এক বিরাট জাতি অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেবার শক্তি ভগবান তাঁকে দিয়েছে। বহু স্বার্থের মিলিত মঞ্চ থেকে যে রাজনৈতিক দাবি উঠল রাজনীতির ধারায় তাকে বাস্তবায়িত করার সমস্ত ক্ষমতা তক্ষককে অর্পণ করার জন্য আমি আবেদন করছি। তক্ষক জানে কোন পথে গেলে নাগজাতির আত্মনিয়ন্ত্রাণাধিকার সম্ভব। কথাগুলো বলে বাসুকির দিকে তাকাল।

বুকের পাশে হাত রাখল বাসুকিনাগ। মনে হল, কোথায় যেন বুকের মধ্যে কোনো এক প্রাচীন তন্ত্রীতে ব্যথার সুর বেজে উঠল। একটা দীর্ঘশ্বাসও পড়ল সেই সঙ্গে।

মুক্তিনাগের নজর এড়াল না। মনে মনে খুশি হয়ে অনন্তনাগের গা টিপে বাসুকি নাগের অবস্থা দেখাল। সেই সঙ্গে একটু হাসলও। চোখে ও মুখে কৌতুকের ভাব ফুটে উঠল। বলল, তোমার কথার হুলটা বুড়োর গায়ে বিঁধেছে। বৃদ্ধবয়সেও ক্ষমতা ও সম্মানের লোভ। গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল হতে চায়। লোকটাকে একেবারে দু'চক্ষে দেখতে পারি না।

অনন্তনাগ শুনল, মন্তব্য করল না।

সভাস্থ ব্যক্তিরা তক্ষককে তাদের নেতা করতে চাইলে একবাক্যে রাজি হল সবাই। সাধু সাধু বলে তাদের সমর্থন উগরে দিল। কেবল বাসুকিনাগ মৌন হয়ে রইলেন, প্রস্তাবটা মনঃপুত হল না বলে হাঁ-না কিছু বলল না। তক্ষকের অধরে কৌতুক হাসি। বলল, কিন্তু নেতা হওয়ার ইচ্ছে আমার নেই। নাগজাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি আমি দেখতে চাই। যে যেখানে বাস করে, সেখানেই মানুষের সম্মান, মর্যাদা ও গৌরব নিয়ে বাস করুক শুধু এটাই আমাদের লক্ষ্যের বিষয়। আমরা অবহেলার পাত্র নই। সংখ্যালঘু বলে আমাদের কৃপা ও অনুগ্রহ দেখাবে সেও আমরা নই। আমরা ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিসম্পন্ন এক জাতি। আমাদের একটা জাতীয় ইতিহাস আছে। সেটা সকলে সম্মান করুক, তাকে মর্যাদা দিক এটাই আমাদের চাওয়া। কিন্তু যেখানে তা হচ্ছে না, সেখানে তাদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের সকলের নৈতিক কর্তব্য। অন্য দেশের এক্তিয়ার হলেও সে দেশের নাগ-নাগরিকদের সহায়তায় তাদের সংরক্ষণের জন্য যৌথভাবে যে যার মত প্রভাব বিস্তার করবে। এতে বোঝানো যাবে যে তারা একা কিংবা অসহায় নয়। তারা সংগঠিত এবং ঐক্যবদ্ধ জানলে অবজ্ঞা এবং অবহেলা করবে না তাদের। আমি তো শুধু পথটা বাতলিয়েছি। এর সঙ্গে দায়িত্ব গ্রহণের সম্পর্ক কোথায়? বরং প্রবীণ যাঁরা, এবং এসব সাংগঠনিক কাজে বেশি যোগ্য তাঁরা দায়িত্ব নিলেই ভাল

হয়। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি নয়, নাগজাতির মঙ্গল ও উন্নতিকল্পেই আত্মনিয়োগ করতে হবে। যদিও জানি, আপনারা আমার পাশে আছেন তবু নিজেকে সেভাবে তো তৈরি করেনি। বয়োজ্যেষ্ঠ বাসুকিনাগ আছেন। সকলে চাইলে জাতীয় সংহতি ও ঐক্যরক্ষার সব দায়-দায়িত্ব তাঁর ওপর দেওয়া যেতে পারে।

একথা শুনে নড়েচড়ে বসল বাসুকি। বলল, বৃদ্ধবয়সেও এ গুরুভার বইবার সাহস আমি রাখি। আমার বল-ভরসা যা কিছু সব আপনারা। তক্ষক তো আছেই।

সমবেত নাগদের মধ্যে অনেকে ফোঁস করে উঠল। বলল, তক্ষক যখন এই ভাবনার উদ্ভাবক, তখন তার সঠিক রূপায়ণের ভার তাকেই অর্পণ করা হোক। এক্ষেত্রে তার নিজের অনিচ্ছার কানাকড়ি দাম নেই। কী করলে নাগজাতির উত্থান হয় তার রূপরেখা নির্মাণের উদ্দেশ্যেই আমরা একত্রিত হয়েছি তক্ষকের নেতৃত্বে। সুতরাং তার আদেশ, নির্দেশ মেনে চলব। তক্ষক আমাদের নেতা। অমনি সকলে মিলে তক্ষকের জয়ধ্বনি করল। তার মৃদু প্রতিবাদ জয়ধ্বনির মধ্যে শোনা গেল না।

তক্ষকের খুব আশ্চর্য লাগে। মানুষও জানে না কখন কোথা থেকে তার কর্মের আহ্বান আসে। কত নতুন দায়িত্ব এবং অভিনব সংগ্রামে অংশ নিতে হয়। জয়-পরাজয়ের কত বিচিত্র অনুভূতি, কী বিপুল আবেগে চিত্ত প্লাবিত করে যায়।

অথচ, খাণ্ডববন থেকে উৎখাত হয়ে তক্ষক ভীষণ ভেঙে পড়েছিল। তখন বারংবার মনে হত, সে একেবারে একা। একা হয়ে কিবা করতে পারে? কিন্তু ভাগ্যের স্রোত তার দিকেই বইছিল। তাই সাফল্যেব আনন্দে, বিজয়ের নিশ্চিত প্রশান্তিতে তক্ষকের ভেতরটা কেমন রসাপ্লুত হয়ে উঠল। বলল, আমরা সবাই বেঁচে আছি বিপুল প্রত্যাশা নিয়ে। আমরা কেউ আলাদা নই। আবার অন্যের কাছ থেকে সরে থাকার জন্য আসিনি। ঐ নীল আকাশ, মেঘ, সূর্য, অপরূপ লতাপাতা, তৃণ, গুল্ম, গাছপালা, নদী, প্রান্তর, মাটি, মানুষ সকলের সঙ্গে একত্রে, এক বিরাট জীবনস্রোতের অংশ হয়ে আছি। এভাবে দেখলে একবারও মনে হবে না আমরা বিচ্ছিন্ন। আমরা একাও নই আবার। আমরা আছি মিলিত হবার জন্য। সবার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পাশাপাশি থাকার জন্য।

বিপুল হর্ষে, করতালিতে মুখরিত হল জায়গাটা। সকলে ধন্য ধন্য করল তক্ষককে। জয় হল তক্ষকের।

চার

তক্ষশিলার অধিপতি হয়ে তক্ষক সর্বাগ্রে চিন্তা করল খাণ্ডববনই হল তার নিজের জায়গা। সেখান থেকে উৎখাত হওয়ার অপমানটা সে কিছুতে ভুলতে পারছিল না। পাকা ফোড়ার মত বুকের ভেতর টনটন করে। তার হারানো রাজ্য পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত অপমানের কষ্টটা তার যাবে না। যাদের চক্রান্তে সে রাজ্যছাড়া হল, সংসার, পরিজন হারাল তাদের ওপর এখনও প্রতিশোধ নেওয়া হয়নি। এই অসন্তোষটা তাকে স্বস্তিতে থাকতে দেয় না। কৌরব, পাণ্ডবদের মত শক্তিশালী রাষ্ট্রের সঙ্গে একটা বিরাট যুদ্ধ ছাড়া নাগদের

ওপর থেকে তাদের শাসন, শোষণ, নির্যাতনের অবসান হবে না। কিন্তু নাগরা যুদ্ধে নারাজ। যুদ্ধ করার অস্ত্র, অর্থ, বাহুবল এবং মনোবল তাদের নেই। তারা অত্যন্ত দরিদ্র এবং দুর্বল চিত্তের ভীরু ও অসংগঠিত মানুষ। তাদের নিয়ে বড় সংকল্প করা আকাশকুসুম কল্পনামাত্র। তবু তক্ষকের ভাবনা-চিন্তা থেমে থাকে না। প্রতিহিংসাপরায়ণ মনটা টগবগ করে ফোটে। মথুরার কথা মনে হয়। তারাও নাগদের মত দুর্বল, ভীরু ছিল। কংসের মত অত্যাচারী শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করার মনোবল, বাহুবল, অর্থবল, সাহস, মথুরাবাসীর ছিল না। কিন্তু কিশোর কৃষ্ণের দুঃসাহসিক উদ্যোগে অসংগঠিত গোকুলবাসীরা সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হল। তাদের মনে শক্তি-সাহসের বীজ বুনে জাত্যভিমানে গর্বিত করে কৃষ্ণ তাদের জীবনধারা এবং মনোভাবকে আমূল বদলে দিল। গোকুলকে নতুন প্রাণ দিল। কংসের সঙ্গে এক দীর্ঘকালীন সংগ্রামের জন্য সংঘবদ্ধ হল। কৃষ্ণের নেতৃত্বের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখল। কৃষ্ণের উদ্যোগে মথুরা থেকে কংসের অপশাসন মুক্ত হল। কৃষ্ণ দেখাল, সমস্ত মানুষ মিলেমিশে একটা বড় কিছু চাইলে তার জয় অবশ্যই হবে। এ কোনো গল্পকথা নয়। একান্ত বাস্তব। শুধু দরকার একজন উদ্যোগী পুরুষসিংহ'র। কিন্তু সংঘভাবনা উস্কে দেয়ার সেই লোকটির অভাব। সে এসেছে তাদের সেই শূন্য জায়গা পূরণ করতে।

রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দিয়ে তক্ষক বুঝল, সব নাগ প্রধানেরা নিজ নিজ অস্তিত্ব নিয়ে একটা সংকটের মধ্যে আছে। রাজ্যের দখল রাখতে অর্থ চাই, সৈন্য চাই, অস্ত্র চাই, কিন্তু কী উপায়ে সেটা সম্ভব তার কোনো পরিষ্কার চিন্তা-ভাবনা নেই। জমানা বদলাচ্ছে এটা সবাই জানে কিন্তু কোন্ রহস্যকাঠির ছোঁয়ায় নিজেকে বদলানো যায় তার রহস্যটাই জানে না।

এদিকে হস্তিনাপুর ও পাঞ্চাল-পাণ্ডবদের রাজনৈতিক জোটের মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগির যে লড়াই শুরু হয়ে গেছে তাতে কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব নয়। অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কোনো না কোনো শিবিরে তাকে যোগ দিতে হবে। এ নিয়ে সব রাজ্যেই নতুন ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়েছে। তাই সব অঞ্চলের নাগপ্রধানদের নিয়ে এক বিস্তারিত আলোচনা বসল তক্ষশিলায়।

একটার পর একটা অলিন্দ পেরিয়ে তক্ষক যখন সভাকক্ষে যাচ্ছিল বারংবার মনে হচ্ছিল তার মত ভাগ্যবান খুব কম জন্মে। ছিল চালচুলোহীন এক মানুষ। ভিখারি বললেই হয়। অথচ, কী আশ্চর্য, ভাগ্য তাকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে সিংহাসনে বসাল। সমগ্র নাগকুলের ওপর খবরদারি করার ক্ষমতা পেল। অদৃষ্ট তার প্রতি প্রসন্ন এখন। এমনকী, এদেশের কন্যাকে রানি করেছে। এক আশ্চর্য আত্মতৃপ্তিতে তক্ষকের অধরে হাসি খেলে গেল। নিজের মনেই নিরুচ্চারে বলল : ইতিহাস হয়তো তাকে দিয়ে কোন নতুন অধ্যায় সূচনা করতে চায়। কেবল সেই জানে না। তবে কিছু একটা করতে চায়, এসব হল তার ভূমিকা।

বুকের ভেতর তার প্রসন্নতার হাওয়া বইছিল। অধরে স্মিত হাসি স্ফুরিত হল। সভাগৃহে প্রবেশ করে সকলকে করজোড় করে অভিবাদন করল। নমস্কার প্রতি নমস্কারের

পর্ব শেষ হলে নাগপ্রধান এবং তাঁদের পার্ষদগণ একে একে আসন গ্রহণ করল। সকলের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করার সময় তক্ষক এক ঝলক সকলকে দেখল। তাদের মনের অয়নপথটা পরখ করল। তারপর সকৌতুকে বলল, 'আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরই মাথায় নাচি' — মানেটা বুঝেছেন তো। কৃষ্ণের নাগ-নিগ্রহ সম্পর্কে কথাগুলো বললাম। কারণ আমাদের সকলের ভাবনাটা একস্তরে চলে না। সংহতি নির্মাণের কাজটা শক্ত হাতে আমায় করতে হবে, এটা ভেবে নিয়েই কথাগুলো বললাম। মস্তিষ্কের মধ্যে একসঙ্গে অনেক প্রশ্ন ঘুরছে। আমাদের সকলে মিলে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। সমবেত হওয়ার উদ্দেশ্যটা তাই।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে বাসুকি তক্ষকের দিকে তাকিয়ে একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, এখানে যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ আমি। অকপটে বলছি, এসব কঠিন কাজে আমাদের কারো মেধা তোমাব মত দুরন্ত ক্ষিপ্রতায় কাজ করে না বলে নাগজাতির বিপন্ন অস্তিত্ব নিয়ে কেউ কখনও মাথা ঘামায় না। হঠাৎ বিপন্ন নাগকুলকে নিয়ে কিছু একটা করার ফন্দি এঁটেছ তুমি। স্বার্থ ব্যতিরেক কেউ কিছু করে না বলেই ভাবনা হয়।

তক্ষকের রাগ হল খুব। কিন্তু কথোপকথনের গায়ে রাগের আঁচটুকু লাগতে দিল না। বাসুকিনাগ তার গোপন মনেব অভিসন্ধি অনুমান করায় সে নিজে খুব সাবধান থাকল। মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটিয়ে সকৌতুকে বলল, কাউকে সন্দেহ করা সহজ। সন্দেহ করার জন্য প্রমাণ দরকার হয় না, বিচার বুদ্ধিও খবচ করতে হয় না। কিন্তু এ ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্যের মূল্য দিতে হয় সন্দেহকারীকেই। কোনো কিছুতে আমার লোভ নেই। নাগজাতির রক্ত বইছে আমাব ধমনীতে। নাগজাতির ভালো চাওয়া যদি আমার দোষের হয় তা হলে আমি দোষী। অকারণ সন্দেহের তীর নিক্ষেপ করে আপনি বোধ হয় সুখ পান। ছোট মুখে একটা বড় কথা বলছি, সন্দেহ আমাদের কিছুই দিতে পারে না। পরস্পরের মধ্যে অবিশ্বাস আর শত্রুতাব বিষ ছড়াতে পারে। একটা বিরাট কর্মযজ্ঞকে অকালে পণ্ড করতে পারে। তাই বলছিলাম, খোলা মন নিয়ে ভাবুন নাগদের আত্মস্বাতন্ত্র্যের কথা। নাগরা যদি নাগদের পাশে না থাকে তাহলে কেউ তাকে অসম্মানের পঙ্ক থেকে সম্মানের আসনে বসাতে পারবে না। আমরা হীনতায়, নীচতায় যে ক্ষতি নাগজাতির করেছি তার বিষ দাঁত ভেঙে বেরিয়ে আসুন। তাহলে আমরা মুক্ত হব এবং মুক্তি পাব। এটা কোনো একজনের একার সদিচ্ছার ফল নয়। সকলের মিলিত সদিচ্ছাতেই সে পরিবেশ তৈরি হতে পারে।

তক্ষকের বলার মধ্যে এমন একটা স্পষ্টতা থাকে এবং এত জোর দিয়ে বলে যে মনের মাটিতে তা গেঁথে যায়। হর্ষোৎফুল্ল হয়ে সবাই বাহবা দিল। সাধু সাধু করল। তক্ষক রোমাঞ্চিত হল। মুখে তার হাস্যচঞ্চলভাব, চোখের চাহনিতে সামান্য কৌতুক। কিন্তু খুব সামান্যক্ষণের জন্য। তারপরই মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল।

মণিনাগ বলল, একমাত্র সৌভ্রাত্র বন্ধনেই এই পরিবেশ গড়ে ওঠে। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার মতই কঠিন কাজ সেটা। নাগরা নিজেদের ভাল বোঝে না, যে যার নিজের পথে চলেছে নিজের মত। কারো জন্য কারো মাথাব্যথা নেই। দীর্ঘকাল

স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে বসবাস করার ফলে ঐ আকাঙ্ক্ষাটা তাদের শুকিয়ে গিয়েছে। তাই, জাতিগত আত্মপ্রতিষ্ঠা কাকে বলে নাগকুল তা ভুলে গেছে। মহামান্য তক্ষক আমাদের সে কথাটা নতুন করে স্মরণ করে দিলেন এজন্য তাঁর কাছে সমগ্র নাগকুলের সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

মুক্তিনাগের অধরে স্মিত হাসি। বলল, হাঁ ভাই, আমার মনের কথাটা আপনি জানলেন কী করে? আমি এসেছি উত্তর থেকে আর আপনি এসেছেন দক্ষিণ থেকে। কিন্তু কী আশ্চর্য! মনের মিলে উত্তর ও দক্ষিণ এক হয়ে গেল।

তক্ষক মৃদুস্বরে বলল : সত্যি কথা মহামান্য মুক্তিনাগ। আপনাদের এই মিল তো বাস্তব — তাই এত সত্য। বৃহত্তর জাতিগত স্বার্থে এই মিল হল। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক হলেই সৌভ্রাত্র এবং ঐক্য অবশ্যই হবে।

মণিনাগ বলল, খণ্ড খণ্ড ভূখণ্ড একসূত্রে গাঁথবেন কী করে? আমরা কেউ শক্তিশালী নই; আমাদের ক্ষমতাও সীমিত। কুরু-পাণ্ডব, মগধ, পাঞ্চাল এদের সামনে দাঁড়িয়ে মার খাব, নিঃশেষ হয়ে যাব।

তক্ষক বলল, কোনো বড় কাজ একদিনে হয় না. তার জন্য সময় দবকার। নাগজাতিরা যে হীন অবস্থার মধ্যে অসহায়ভাবে দিন যাপন করে সে অবস্থা থেকে একটা সম্মানজনক জায়গায় পৌছতে তো একটু সময় লাগবে। কতদিন লাগবে সেও নিশ্চয় করে বলার নয়। একজীবনে নাও হতে পারে। এজন্য হতাশায় ভেঙে পড়ার কিছু নেই। যদিও হতাশ হওয়া স্বাভাবিক। কারণ, অনন্ত প্রতীক্ষা কাউকে খুশি করতে পারে না। তবু সব কিছুর একটা নির্দিষ্ট সময় থাকে। সে সময় প্রত্যাশার আগে আসতে পারে আবার বিলম্বেও আসতে পারে। সেটা নির্ভর করে একতাবোধ এবং একজাতীয়তাবোধ গড়ে ওঠার ওপর। তবে নাগরা যদি এককাট্টা হয়ে সুশৃঙ্খলভাবে একটি পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে ঠিকঠিকভাবে বিশ্বস্ততার সঙ্গে সৌভ্রাত্রের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে তাহলে একজাতীয়তাবোধের বাতাবরণ সৃষ্টি হবে। কোনো কিছু অসম্ভব মনে হবে না তখন।

তক্ষকের কথা সকলকে চমৎকৃত করল। কিন্তু কার কতটা বোধগম্য হল তা নিয়ে একটা সংশয় হওয়ার জন্য বিস্ময়ে এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ইশারায় জবাব খুঁজল। কেবল বাসুকিনাগই যা বলার জন্য উশখুশ করছিল। বেশ কিছুক্ষণ ধরে ইতস্তত করার পরে নিজের বোঝার সমস্যাটি ব্যক্ত করল। বলল, তোমার কথার মধ্যে মারপ্যাঁচ আছে। গোটা নাগকুলকে নিয়ে শূন্যে ঝাঁপ দিয়ে তোমার কী লাভ? তোমার কথা অন্ধভাবে মানলে নাগদের লাভ কিছু হবে না, তবে তোমার সঙ্গে ডুবতে পারবে।

বাসুকির কথায় উত্তেজিত হল না তক্ষক। অসহিষ্ণু হয়ে হঠকারিতাও করল না। বাসুকিনাগের সন্দেহ উড়িয়ে দেবার জন্য নিপাট ভালমানুষের মত হেসে বলল, আপনি কিন্তু বেশ মজা করতে পারেন। রসিকতা সবাই করতে জানে না। তবে নাগজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আমার নিজের কতকগুলো ভাবনা-চিন্তা আছে। সকলকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য এবং নাগ বলে তাদের সনাক্তকরণের জন্য এবং একাত্মবোধ গড়ে ওঠার জন্য কতকগুলো অনুশাসন দৈনন্দিন জীবনে মানা বাধ্যতামূলক। আমি বিশ্বাস করি নতুন

জাতিসত্তা গড়ে তোলার জন্য অনুশাসনগুলি মানতে বাধ্য করার জন্য একটু কঠোরও হতে হবে সকলকে। মনে রাখবেন, প্রতি মুহূর্ত পুরনো জীবন জীর্ণ হয়ে খসে পড়ছে, নতুন জীবন অঙ্কুরিত হচ্ছে। আত্মবিকাশের পথে কোনো কিছুর যাত্রা থেমে নেই। আমাদের পুনরুজ্জীবনও অনন্ত যাত্রার পুনরাবৃত্তি মাত্র।

তক্ষকের প্রতিটি কথা অনন্তনাগ মন দিয়ে শুনল। অভিভূত গলায় বলল, বন্ধু, আজ থেকে তুমি আমাদের নেতা হলে। আমরা তোমার আদেশ-নির্দেশ মানব। তোমার কথা শুনব। তুমি চুপ করে থেকো না। যা ভাবছ, অসংকোচে বল।

মনের মধ্যে এক ভীষণ আলোড়ন সৃষ্টি হল তক্ষকের। খাণ্ডববনের ওপর তার পুনরধিকার ফিরে পাওয়ার দিকে তাকিয়ে তক্ষক নাগ-ভ্রাতৃসংঘ গঠনের যে নিয়মগুলো মনের ভেতর রচনা করেছিল আস্তে আস্তে তার ওপর কথা বসাতে লাগল। বলল, জাত্যাভিমানের নিবিড় বন্ধনে নাগকুলকে এককাট্টা করার জন্য নারী-পুরুষ সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলের নাগচিহ্ন ধারণ করা আবশ্যিক। নাগচিহ্নেই তাকে সকলের মধ্যে আলাদা করে চেনা যাবে। পোশাকেও সাম্য আনতে হবে। পোশাক পরিধানে নারী-পুরুষ সকলকে একটা বিশেষ রীতি মানতে হবে। নাগচিহ্ন দেখেই এক নাগ আর এক নাগকে ভাই বলে সমাদর করবে। অন্য জাতি বা গোষ্ঠী থেকে তারা যে আলাদা এই বোধে সর্বক্ষণ সচেতন থাকবে। ধীরে ধীরে তাদের ভেতর একটা আলাদা জাতিসত্তা জন্ম নেবে। তখনই ভ্রাতৃত্ব এবং মৈত্রীবোধ জাগবে। তারা এক নতুন জাতি হয়ে উঠবে। ঐক্যসংহতির বাতাবরণে এক নতুন নাগকুলের উদ্ভব হবে। নতুন মনের, নতুন চেতনার এক নাগবংশের সূচনা হবে। অন্য গোষ্ঠী ও জাতি থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র করে দেখবে এবং একতাবোধ জাগবে। আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ এবং একতাবোধ সম্প্রদায়ের মধ্যে ছোট-বড় ভেদরেখা মুছে দেবে। সীমারেখা উঠে গেলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে কোনো বাধা থাকবে না। আস্তে আস্তে এক জাতি, এক কুল হয়ে যাবে। জন্ম নেবে এক নতুন সৌহার্দ্য। সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব এবং মৈত্রীচেতনা। বিপদে-আপদে তাদের এই একতা অক্ষুণ্ণ থাকবে আত্মীয়তায়, ভালবাসায় এবং রক্ত সম্পর্কে। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের জন্য কোনো নাগকুল যদি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে তাহলে অন্যেরা যে রাজ্যের বা অঞ্চলের হোক না কেন অর্থ ও অস্ত্রর নিয়মিত সরবরাহ করবে তাকে।

বিনা বিতর্কে তক্ষক বোঝাতে সমর্থ হল, নাগেরা যদি নাগদের পাশে না দাঁড়ায় তা-হলে একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তারা। এহেন আশাবাদের বিপক্ষে কারো কোনো হতাশাজনিত প্রশ্ন ছিল না। সকলের চোখে ঐক্যের স্বপ্ন।

মুক্তিনাগ খুশিতে বিগলিত হয়ে বলল, আপনি জাদু জানেন। এতগুলো লোককে নির্বাক করে দিয়েছেন। টুঁ-শব্দটি কেউ করল না। বাসুকিনাগও ফোঁস পর্যন্ত করল না।

অনন্তনাগের অধরে তৃপ্তির হাসি স্ফুরিত হল। বলল, জয় হল তোমার। শত্রু-মিত্র সকলকে কাছে টেনে নিয়েছ। সকলের বুকে যে আগুন লুকোনো আছে তুমি তার ফুলকি দেখতে পেয়েছ। ঐ ফুলকি যে দাবানল নয় কে জানে?

তক্ষকের অধরে বিচিত্র হাসির বিদ্যুৎ খেলে গেল।

মণিনাগ বলল, সকলকে মাতিয়ে তো তুললেন! এমন একটা উন্মাদনার প্রয়োজন ছিল।

কৃতজ্ঞ তক্ষক বলল, আপনাদের আস্থা ভালবাসার জয় হল। এই জয় সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিলে তবেই তা সফল হয়। রাজনীতিতে অসম্ভব বলে কিছু নেই। অতর্কিতে কত কী যে ঘটে যায় তার বিন্দুবিসর্গ আগে থেকে আঁচ পর্যন্ত করতে পারে না। আমাদের প্রত্যাশাও আকাশ-কুসুম কিছু নয়। খুব সাধারণ চাওয়া। না হওয়ার কিছু নয়। নাগবংশের সবাই মিলে একটু চাইলেই সবার চোখে বড় হওয়ার দৃষ্টান্ত গড়া যায়।

সবাই মিলে সাধু, সাধু করল।

তক্ষকের অধরে জীবন-রহস্য বোঝার কৌতুক হাসি। সাফল্যের গৌরবতৃপ্তি তার হাবেভাবে প্রকাশ পেল।

পাঁচ

খাণ্ডববন থেকে তক্ষক বিতাড়িত হওয়ার পরে সেখানে শান্তি ফিরল। যুধিষ্ঠিরের পুরোপুরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। বহুকালের একটা স্বপ্নমাত্র পূরণ হল জননী কুন্তীর। খাণ্ডবপ্রস্থের নতুন নাম হল ইন্দ্রপ্রস্থ। আবেগের মোহন আবরণে মোড়া। ইন্দ্রের অমরাবতীও হার খেয়ে যায়। নিঃসম্বল পাণ্ডবদের একমাত্র গর্ব ইন্দ্রপ্রস্থ। বোধ হয়, এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ নগরী খুব কম হয়। সব কেমন স্বপ্ন মনে হয় পঞ্চপাণ্ডবের। বিস্ময়াবিষ্ট দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে গর্বে ও আনন্দে পঞ্চপাণ্ডবের বুকখানা ভরে যায়। সেই মুহূর্তে ফেলে আসা জীবনের কত কথা মনে পড়ে। অতীতের এই চর্বিত চর্বণ যুধিষ্ঠিরের ভাল লাগে। বেশ একটা স্বস্তি পায়। যুধিষ্ঠিরের খুব ইচ্ছে সমারোহে, সমৃদ্ধিতে এবং উন্নতিতে ইন্দ্রপ্রস্থ সবার চোখে লেগে থাকুক। ঠোঁট ফেটে বেরিয়ে আসুক তাদের ঈর্ষা, বিস্ময় এবং প্রশংসা। নিন্দুকের নিন্দে হল ইন্দ্রপ্রস্থের মূল্যায়ন।

সাধারণ পোশাকে নগর পরিভ্রমণের সময় অনেক কথাই শুনতে পায় যুধিষ্ঠির। মানুষের মন তো তাই মনটা খারাপ হয়ে যায়। মন খারাপ হলে মার কাছে বসে। অসংকোচে বলে ইন্দ্রপ্রস্থর ভিতরটা ফাঁপা। সমৃদ্ধি ঐশ্বর্য সবই বাইরের শোভা। ভেতরটা একেবারে অন্তঃসারহীন। শ্রেষ্ঠীরা বাণিজ্য করতে এসে বুঝেছে এখানকার মানুষ খুব গরিব। তাদের ক্রয়ক্ষমতা নেই বললে হয়।

কুন্তী পুত্রকে ভরসা দিয়ে বলল, একেবারে শূন্য থেকে শুরু করেছি। পায়ের তলায় মাটি পর্যন্ত ছিল না। পরগাছা হয়ে বেড়ে উঠেছি। ইন্দ্রপ্রস্থের রাজকোষ তো পাঁচজনের কাছ থেকে নিয়েই হয়েছে। উপঢৌকনের গায়ে দিগ্বিজয়ের তক্‌মা আঁটা। আমাদের নিজস্ব কোনো অর্থভাণ্ডার নেই। সবই সাহায্য থেকে আসে। একটু কথা তো শুনতেই হবে। গায়ে না মাখলে হল। এমন গ্লানি তো অনেক থাকে।

যুধিষ্ঠিরের কণ্ঠস্বরে যুগপৎ হতাশা এবং অসহায়তা ফুটল। বলল, কৃষ্ণ দ্বারকায় থাকায় নানা সমস্যায় ভুগছে ইন্দ্রপ্রস্থ। সব জায়গা থেকে কত রকমের বৃত্তির লোক আসছে — চাষি, তাঁতি, জোলা, জেলে, মুচি, দোকানি, ক্ষেতমজুর, চামার, কুমার, কাঠুরে, ব্যাধ, বণিক। জনস্রোতের ঢল নেমেছে। এত মানুষের কর্মসংস্থান করব কী করে?

কুন্তী বলল, এমনটাই তো চেয়েছিলে। এখন ভয় পেলে হবে কেন? এদের সবার উপর থাকতে হয় কৌশল করে।

চারদিকে থেকে শুধু দাও-দাও করছে। কিন্তু দেব কোথা থেকে? আমাদের আছে কি, যে দেব! মানুষের দাবি মেটাতে না পারলে ইন্দ্রপ্রস্থ থাকবে না। লাখ লাখ মানুষের রোষের আগুনে এ নগর দাউ-দাউ করে জ্বলতে থাকবে। সেদিন বোধ হয় খুব দূরে নেই।

এত তাড়াতাড়ি হতাশ হওয়ার কারণ নেই। আতঙ্কিত হওয়ার মত কিছুই হয়নি। তুমি মিছে ভয় পাচ্ছ।

ভয় পাওয়ারই কথা। ব্যক্তিগত স্বার্থ, জাতীয় স্বার্থ-গ্রাস করছে। দেশকে সমৃদ্ধশালী করার নামে একশ্রেণীর রাজকর্মচারী নগরবাসীকে ভিখারি বানাচ্ছে। বিত্তবানদের হাতে অর্থ আছে বলে অন্যায় আব্দার রাখতে হয়। আমি চাইলেও তাদের অসন্তোষ হয় এমন কোনো কাজ করতে পারি না।

তাহলে তুমি করবে কী?

কিছুই করতে পারব না। নতুন রাজ্য, শাসনকার্যে অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিচ্ছে একশ্রেণীর মানুষ। এদের অদৃশ্য হাতে ছোঁয়ায় সব গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। অথচ, দিগ্বিজয় থেকে বহু অর্থ এসেছে। কিন্তু উন্নয়নের চিহ্ন কোথায়? দেশে দারিদ্র্য বাড়ছে। বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে। একদল ঠাঁই না পেয়ে তলিয়ে যচ্ছে, অন্যদল সাঁতার কাটছে স্বপ্নের সাগরে। দেশকে ওরা চেনে না, জানে না, বোঝে না — ওরা জানে শুধু যুধিষ্ঠিরকে। তাদের বিশ্বাসভঙ্গ করে এই রাজ্য ভোগদখল করতে চাই না আমি। জাতীয় স্বার্থবিরোধী এই শোষণ, প্রতারণার বিপক্ষে আমি। উত্তেজনায় যুধিষ্ঠিরের বাক্‌রোধ হল। দুঃখে, ক্রোধে, কপটতায় রাগ হলে কেঁদে ফেলে যুধিষ্ঠির।

পুত্রকে সান্ত্বনা দেবার জন্য কুন্তী নিজের কাছেই প্রশ্ন করল। সত্যি তো নগর জুড়ে এই অচল অবস্থা কেন? কারা এর স্রষ্টা? অথচ, তুমি কত আন্তরিকভাবে চাইছ, একটা নতুন রাজ্য স্বয়ম্ভর করতে, নবাগত মানুষের ভাল করতে। তবু তোমার স্বপ্ন ও সাধ পূর্ণ হচ্ছে না। এটাই দুঃখের কথা।

কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর যুধিষ্ঠির বলল, ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা হয়ে হাজার হাজার মানুষের মুখ দেখে কী ভাল লেগেছিল। কিন্তু একদশক পরেও নেংটি পরা মানুষগুলো থেকে গেল।

কুন্তির চোয়ালে কাঠিন্য ফুটে ওঠে। বলল, তুমি কী চাও?

আমি শুধু শঙ্কিত হই নিজের কথা ভেবে। যে কাজটা জরুরি মনে করে দ্রুত সম্পন্ন করতে চেয়েছিলাম, তা করা হল না।

কুন্তীর অধরে বিষণ্ণ হাসি। বলল, নিজের অযোগ্যতার তুমি একজন কঠোর সমালোচক।

অসংকোচে যুধিষ্ঠির বলল, সত্যকে সত্য বলতে যুধিষ্ঠির ভয় পায় না। আমার যা কিছু দোষ, ত্রুটি তার দায় আমার নিজের। অন্যে তার ভার বইবে কেন? অথচ, আমার কারণেই রাজ্যের মানুষদের সেই বোঝা বইতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, যে কাজের জন্য আমি নিযুক্ত তার উপযুক্ত হওয়া সময়ের ব্যাপার। এই সময়টুকু ইন্দ্রপ্রস্থের বাইরে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থাকলে মন্দ হয় না।

পুত্রের নির্বুদ্ধিতায় কুন্তীর চোখ ক্রোধে রক্তবর্ণ হল। চোয়াল শক্ত হল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পুত্রের দিকে তাকিয়ে তার মনটাকে জরিপ করল। থমথমে গলায় বলল; কী ভেবে বলছ, জানতে পারি।

হঠাৎই একটা জোরে হাঁচি পড়ল যুধিষ্ঠিরের। আর তাতেই আড়ষ্ট এবং দ্বিধার ভাবটা কেটে গেল। বলল, অনায়াসেই পারি। সামর্থ্য এবং সঙ্গতির চেয়ে আমাদের দায় বেশি। রাজ্যের পরিধি খুব ছোট। এখনও অর্ধেক খাণ্ডববনের ওপর আমার কোনো কর্তৃত্ব নেই। সেখানে উপজাতিদের দলপতি সমান্তরালভাবে রাজত্ব করছে। মেরেধরে তাদের এলাকার লোক এখানে ঠেলে দিচ্ছে। ফলে, ভূমির চাইতে লোক বেশি হয়ে গেছে। নগরে নাগরিকরা যেটুকু কর দেয়, জনপ্রিয়তা বজায় রাখতে রাজাকে বেশি ছাড় এবং ভর্তুকি দিতে হয়। অনাদায় থাকে আরো বেশি। সব মিলে রাজ্যের অর্থনৈতিক হাল খুব খারাপ। দারিদ্র্য মানুষকে মরিয়া এবং আরো নৃশংস করে তুলেছে। বাঁচার জন্য তাদের ধন চাই। লুট-পাট সর্বত্র অবাধ। শাসন শৃঙ্খলার জন্য যেটুকু রক্ষী দরকার তা নিয়োগ করার অর্থবল আমার নেই।

ইন্দ্রপ্রস্থ যে ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়ে গেছে কুন্তী তা জানে। যুধিষ্ঠিরের অকপট বক্তব্য কুন্তীকে নিরুৎসাহ করল। পুত্রকে উৎসাহিত করার মত কথা খুঁজে পেল না। তাই কেমন একটা বিষণ্ণতায় কাতর দেখাল তাকে।

আবার একটা হাঁচি পড়ল যুধিষ্ঠিরের। কুন্তীর আচ্ছন্ন ভাবটা ছিন্ন হল। বলল, অসময়ে এত হাঁচি কেন? ঠাণ্ডা লাগল কী করে?

যুধিষ্ঠিরের চোখেমুখে একটা হাসির ভাব ফুটল। বলল, ও কিছু না। খাণ্ডবপ্রস্থের আদি বাসিন্দারাই আমার ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু। কারণ তারা মনে করে কৃষ্ণ-অর্জুনকে বিশ্বাস করে ভুল করেছে তারা। তক্ষক বিতাড়িত হওয়ার জন্য নিত্য নতুন দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। তক্ষকের অভাবটা এখন যেমন বোঝে, আগে তা বোঝেনি। তক্ষক তাদের ভালো করতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা কেউ তার কথা শোনেনি বলেই ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে তারা বিতাড়িত হয়েছে। সেই জায়গাগুলো বিত্তবানেরা দখল করে ঘরবাড়ি করে সুখে বসবাস করছে। আর তারা আশ্রয়হীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কার্যত, এই উদ্বাস্তুরা পাণ্ডবদের রাজত্বে অভাব এবং ক্ষুধা ছাড়া কিছু পায়নি।

কুন্তী ওর কথার মধ্যে বাধা দিয়ে বলল, তোমার আজ কী হয়েছে বল তো?

কিছু হয়নি। অশান্ত মনটাকে কেবল মায়ের কাছেই উন্মোচন করা যায়। তোমার

অপদার্থ ছেলের মনে কত ক্ষোভ, অনুশোচনা, দুঃখ জমা আছে মা হয়ে তুমিও খোঁজ রাখ না তার। অথচ, আমার স্বীকারোক্তিতে লেশমাত্র মিথ্যে নেই। মনগড়া বলে একে উড়িয়ে দিতে পারবে না। তাহলে নিজেকেই প্রতারণা করা হবে।

কুন্তী অধোবদন হল। যুধিষ্ঠির ঠাণ্ডা গলায় বলল : আমার কথাগুলো তোমার মনঃপূত হল না। কিন্তু আমি যে ভিতরে ভিতরে ক্ষতবিক্ষত করছি নিজেকে। আমার বুকের রক্তক্ষরণ বাইরে থেকে চোখে দেখা যায় না। মনের কষ্টটা তাই একটু উগরে দিলে শান্তি পাই। নতুন করে প্রাণ পাই।

কুন্তী ওর পাশে দাঁড়িয়ে চুলের মধ্যে বিলি কেটে দিতে লাগল। আরামে যুধিষ্ঠির মার করপুটে হাত রাখল। মাকে তার মস্ত অবলম্বন মনে হল। এই মহিলার জন্য তার যশ, খ্যাতি, সম্মান, প্রতিষ্ঠা। এই মহিলা না থাকলে কোথায় থাকত তার সিংহাসন, কে দিত তাকে ইন্দ্রপ্রস্থের অধিকার? অসীম কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল তার অন্তঃকরণ। কুন্তীও অভিভূত হল। কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বলল, তোমার উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। সত্যি আমরা কোথায় যাচ্ছি জানি না। এই সময় কৃষ্ণও কাছে নেই। বেচারা দ্বারকায় সৌভরাজের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। কবে যে তা মিটবে জানি না। কত বছর ধরে চলছে তাদের যুদ্ধ। তার অনুপস্থিতির সুযোগ সদ্ব্যবহার করছে শত্রুরা। সমস্যা-কণ্টকাকীর্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে রাজার গৌরব নিয়ে রাজত্ব করা দিন দিন কঠিন হয়ে উঠছে।

যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ বলল, এই বাস্তব সত্যটা বুঝতে হবে। সুযোগের অপেক্ষায় থাকা শত্রুদের দোষ নয়। সুযোগ তো আমরাই করে দিচ্ছি তাদের। কী যুদ্ধে, কী রাজনীতিতে, কী জীবননীতিতে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করাই নিয়ম। আমার ও হস্তিনাপুরের দুর্বলতার রন্ধ্রপথ ধরে আমাদের স্থান করে নিয়েছি সেখানে। খাণ্ডববনের তক্ষকও নিজের দেশে ফিরে আসার স্বপ্ন দেখছে। নিজের কৃতিত্বে তক্ষশিলার অধিপতি হয়েছে। আমার কাছে খবর আছে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করার কর্মসূচি নিয়েছে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে যেসব নাগজাতি বাস করে তাদের সংগঠিত করে ইন্দ্রপ্রস্থের ওপর আঘাত হানার পরিকল্পনা তার। এজন্য ইন্দ্রপ্রস্থের সকল শ্রেণীর নাগরিকের ক্ষোভকে উস্কে দেয়ার চক্রান্ত করছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গুপ্তচরেরা সে কাজ ইতিমধ্যে আরম্ভও করে দিয়েছে।

কুন্তী উদ্বিগ্ন গলায় বলল, আমিও শুনেছি, খাণ্ডববনে নাগমুনি শমীকের পুত্র শৃঙ্গীর তত্ত্বাবধানে একটা জেহাদি গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। যে কোনো মুহূর্তে বিদ্রোহ করতে পারে তারা। একটা গণ্ডগোল পাকানোই তাদের উদ্দেশ্য। তুমি একটু হুঁশিয়ার থেকো।

হুঁশিয়ার হওয়ার জন্য চাই সৈন্য, অস্ত্র, রথ, অশ্ব, গজ। এসব কোথায় আমাদের? যা আছে তা দিয়ে শান্তি-শৃঙ্খলাও রক্ষা করা যায় না। বীরবাহু ভীম এবং অর্জুনের শৌর্য-বীর্যের ভয় দেখিয়ে আর কতকাল শত্রুকে সংযত রাখব। তক্ষক চুপ করে বসে নেই। আমাদের ফাঁক-ফোকরগুলো সে ভাল করে জেনে গেছে। হারানো রাজ্য ফিরে পাওয়ার জন্য খাণ্ডববনে যাওয়া আসা শুরু করেছে সে। দুর্যোধনও তক্কে তক্কে আছে। আমাদের দুর্দিনে কিংবা বিপদে হস্তিনাপুরকে পাশে পাবে না। তাই বলছি, আমরা নিরাপদে

নেই। এক ভয়ংকর বিপদ আমার দিকে তেড়ে আসছে। তাই, মিত্রশক্তি সংগ্রহ করতে অর্জুনকে বিভিন্ন দেশ সফরে পাঠিয়েছি। পাছে আমাদের দৈন্য এবং অসহায়তা প্রকাশ পায় তাই ব্রাহ্মণদের গাভী হরণের এক নাটক করতে হল। এই সঙ্গে টক-ঝাল-মিষ্টির মত দ্রৌপদী ও আমাকে নিয়ে এক রসাল গল্প উপহার দিলাম। এক ঢিলে দু'পাখি নয়, তিন পাখি মরল তাতে।

কুন্তীর অধরে স্ফুরিত হাসি। বলল, কীরকম?

মুখে মুখে সকলের জানা হয়ে গেল অস্ত্রাগারের কথা। দুই, কৌশলে মিত্রতা সৃষ্টির জন্য শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে অর্জুনকে বিদেশ সফরে পাঠানো গেল। তিন, জনগণ বোকা বলেই বিশ্বাস করল রাজপ্রাসাদে নয়, অস্ত্রাগারের মত একটি জায়গায় আমরা প্রণয় নিবেদন করছিলাম। যাই হোক, অর্জুন তার সঠিক দায়িত্ব পালন কবল। নাগদের এবং তক্ষকের সংগঠিত দুর্গে আঘাত হানার জন্য নাগরাজ কৌরবের সুন্দরী কন্যা উলুপীকে পত্নীত্বে বরণ করে তাদের সঙ্গে একটা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করল।

কুন্তী বলল, কৌরবনাগ মহারাজ পাণ্ডুর অনুগত ছিল।

কিন্তু তাঁর আনুগত্য দীর্ঘস্থায়ী হওয়া নিয়ে আমার মনে শঙ্কা জেগেছে। অর্জুন যখন নাগরাজ্য ত্যাগ করল তখন উলুপী তার সঙ্গী হল না। নাগরাজ্য ত্যাগও করল না। অর্জুন অন্যদেশ পরিভ্রমণের সময় যাত্রাপথে যেভাবে উপজাতিদের নিধন করেছে এবং বসতি ধ্বংস করে পাণ্ডব-অনুগত ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিলিবণ্টন করছে তাতে দেশে দেশে আমাদের শত্রুসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শত্রুরা এইসব নিগৃহীত নিপীড়িত মানুষগুলোকে জেহাদের মন্ত্রে দীক্ষিত করে কাছে টেনে নেবে।

কুন্তীর ভুরু কুঞ্চিত হল। বিমর্ষ গলায় বলল, সফরে পাণ্ডবদের লাভও হবে বিস্তর। যারা পাণ্ডবদের সম্পর্কে কিছু জানত না তারা কৌতূহলী হবে। নাগকন্যা উলুপীকে বিয়ে কবে অর্জুন নাগদের কাছ থেকে কিছুটা জয় আদায় করে নিয়েছে। অন্তত কৌরব-নাগ এবং তার পরিজনেরা পাণ্ডবদের বিপক্ষে যাবে না। এটুকু লাভই বা কম কিসে? ব্যাপারটা একটা রাজনৈতিক চাতুরীমাত্র। মুখ্য উদ্দেশ্য গোপন করে ঘর গুছনোর কাজটা অর্জুন ভালই করছে বলে আমার বিশ্বাস।

যুধিষ্ঠির চুপ করে থাকল। নিজের মনে নিরুচ্চারে বলল, কাউকে না জানিয়ে একদিন রাজ্যপাট ছেড়ে বনে চলে যাব। খাণ্ডববনের মানুষ তখন কার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে? তাদের সব রাগ তো ইন্দ্রপ্রস্থের ওপর। ইন্দ্রপ্রস্থ কৌরবদেরও ঈর্ষার বস্তু। যুধিষ্ঠির চলে গেলে বিদ্রোহ কিংবা ঈর্ষার মজা থাকবে না। মজা গেলে সে তো নিরানন্দ। তার কোনো আকর্ষণ নেই। সেই সময়টা হল হারানো মহিমা পুনঃপ্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ সময়। হঠাৎই এরকম একটা গভীরবোধে তাকে অন্যমনস্ক এবং উদাসীন দেখাল।

দ্যূতপণে সর্বস্ব খুইয়ে যুধিষ্ঠিরের বনবাসী হওয়ার খবরটা ঝড়ের বেগে ছড়িয়ে গেল দেশময়। তক্ষশিলাতেও তার ধাক্কা এসে লাগল। খবরটা তক্ষককে উৎফুল্ল করল। আপন ব্যর্থতা গোপনের জন্য যুধিষ্ঠির যে এরকম কিছু করবে তক্ষক আগেই অনুমান করেছিল।

কিন্তু সে যে এত ত্বরান্বিত হবে কেবল সেটা জানা ছিল না।

যুধিষ্ঠির আচমকা ইন্দ্রপ্রস্থ ত্যাগ করল কেন এই প্রশ্নটা তক্ষককে সন্দিহান করল। কোথাও একটা গভীর রহস্য লুকোনো আছে। যুধিষ্ঠিরের হেরে যাওয়াটা ইচ্ছাকৃত। হেরে গিয়ে যেন নিজের সঙ্গে কৌতুক করল। কৌতুকের কিনারা করতে আরো কটাদিন কাটল। তবু সমাধানে পৌঁছতে পারল না।

যুধিষ্ঠিরের বনবাস তক্ষকপত্নী তানানাকে বিচলিত করল। তক্ষককে হারানোর আশঙ্কায় তার মন কাতর হল। কতসব অদ্ভুত অমঙ্গলকর কথা মনে হতে লাগল। চোখের কোণ বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। এ কী তবে প্রিয় বিচ্ছেদের দুঃখ? সুখের দিন কী তার ফুরোল? প্রশ্নটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে পাক দিয়ে দিয়ে হাহাকারের মত ছড়িয়ে পড়ল ঘরময়।

কিন্তু তক্ষকের মনে মুক্তির হাওয়া বইছিল। আনন্দ এমন এক বস্তু যে তা গোপন করা যায় না। চোখে মুখে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে খুশির তরঙ্গ উছলে পড়ল। তক্ষক এর ব্যতিক্রম নয়। ঘটা করে কথাটা বলার জন্য তানানার ঘরে প্রবেশ করল।

প্রসাধন সমাপ্ত করে দর্পণে নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। তক্ষককে প্রবেশ করতে দেখে দাসীরা নিঃশব্দে প্রস্থান করল। চোখ তুলতেই তানানা দর্পণে তক্ষকের প্রতিবিম্ব দেখল। শিকারি ব্যাধের মত পা টিপে টিপে আসছিল তার দিকে। তক্ষকও দেখছিল তানানার অধরে কৌতুক হাসি। পিছন থেকে তানানার চোখ চেপে ধরার আগেই সে ঘুরে দাঁড়াল। থমকে গিয়ে হাত দুটো সামলে নিল তক্ষক। একগাল হেসে বলল, আচ্ছা বেরসিক তুমি। একটু মজা করার আনন্দটুকু মাটি করে দিলে।

অধরে টেপা হাসি তানানার। চোখ দুটো উত্তর থেকে দক্ষিণমেরু পাক দিয়ে এল যেন এক মুহূর্তে। বলল, এত উচ্ছ্বাসের কারণ কী জানতে পারি?

আজ বড় আনন্দের দিন। নিজেকে বড় সুখী মনে হচ্ছে তানানা। এ সুখ আমার তৈরি নয়, অদৃষ্টের দানও নয়। এ হল দেবতার আশীর্বাদ। যুধিষ্ঠিরের নিয়তি। আমার গভীর আনন্দ ও প্রসন্নতার উৎস। আমার সব সুখ ও আনন্দ তোমার সঙ্গে ভাগ করে নিতে এসেছি।

এক গভীর সুখের অনুভূতি হঠাৎ বিষাদে ভারাক্রান্ত করল তানানাকে। বিষণ্ণ গলায় বলল, এত সুখ কী আমার সইবে?

বিস্ময়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকল তক্ষক। তারও কণ্ঠস্বরে বিব্রতভাব ফুটল। বলল, এমন করে বললে কেন? তোমার এত উদ্বেগের কারণ কী?

তানানা ব্যাকুল গলায় বলল, না-গো না। ভয়! সব সময় একটা হারানোর ভয়ে ভেতরটা কুঁকড়ে থাকে।

তোমার ভীত হওয়ার মত কোনো কাজ তো করি না। তাহলে এত আতঙ্কিত হওয়ার কী আছে? আমার ওপর ভরসা রাখ। জীবনে অনেক হারিয়েছি আমি। হারানোয় আমার বড় ভয়। আমি আর হারাতে চাই না। তোমাকেও না। যা কিছু আমার নিজের তা

কাছ ছাড়া করব না আর।

তানানার মন থেকে তবু সংশয় যায় না। পুরুষরা নারীর মন ভেজানো আর মন কেড়ে নেওয়ার মত এমন সুন্দর সুন্দর কথা বলে যে মন আপ্লুত হয়ে যায়। মনের বাঁধ কেটে যায়। সমর্পণের আবেগে ভেতরটা আকুল হয়ে ওঠে। তখন কোনো নারীর অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না তাকে। সেই দুর্বল মুহূর্তে মেয়ে জাতটা পুরুষদের বেশি বিশ্বাস করে স্বপ্ন দেখে। এজন্য দুঃখ পায় বেশি। অথচ, নারীমাত্র পুরুষকে খুশি করার জন্য এবং সুখী করার জন্য কত কী করে। তাকে প্রেম দেয়, নতুন নতুন প্রেমতৃষ্ণা সৃষ্টি করে, সন্তানের পিতা করে, তার গৃহকে গৃহ করে তোলে। তবু তার প্রতি উদাসীন সে। একটুও কৃতজ্ঞতাবোধ নেই পুরুষের অন্তঃকরণে। তাই প্রবৃত্তিপরায়ণ হয়ে অন্য নারীর সংসর্গের তাড়নায় যখন ঘর ছাড়ে তখন একবারও পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে না যে, একজন মিনতি ভরা চোখে তার গন্তব্য পথের দিকে তাকিয়ে আছে। পাছে তার জীবনে অনুরূপ কোনো-ঘটনা ঘটে তাই সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকে তানানা। তক্ষকের উক্তিতে হঠাৎই সে ভরসা পায়। বুকে কিছু সাহস সঞ্চয় করে তানানা তক্ষককে দিয়ে অঙ্গীকার করার জন্য হাতখানা তার নিজের মাথায় ছোঁয়াল। বলল, আমার গা ছুঁয়ে বল খাণ্ডববনে আর কোনোদিন যাবে না।

তক্ষকের চাপল্য থমকে যায়। বিস্ময়াবিষ্ট চোখে তানানার দিকে চেয়ে রইল। ডুবুরির মত ডুব দিল তানানার হৃদয়ের গভীরে। স্মিত হাস্যে মুখখানি উদ্ভাসিত হল। বলল, আচ্ছা, সবার চোখে ছোট হয়ে যাওয়ার মত কোনো কাজ করতে বলবে তুমি? আমাকে দিয়ে একটা মিথ্যে অঙ্গীকার করে নিলে তুমি কী খুব সুখ পাও! তোমাকে তুষ্ট করতে গেলে আমার আমিকে অসন্তুষ্ট করতে হয়। তুমি বল, কোনো সুখ কিংবা আনন্দ কী জোর করে পাওয়া যায়? তাতে আনন্দটাই মাটি হয়ে যায়। আর সুখটা মরা রোদের মত পায়ের তলায় পড়ে থাকে। তুমি কী এমন সুখ চাও আমার কাছে। ছিঃ, নিজেকে ছোট কোর না তানানা।

তানানা অধোবদন হল। ওই সামান্য ক্ষণটুকুর মধ্যে নিজেকে প্রশ্ন করল স্বামীর ওপর তার পূর্ণ আস্থা কিংবা নির্ভরতার অভাব হল কেন? জোর করে তাকে অঙ্গীকারবদ্ধ করার মত সত্যি কিছু হয়নি। এভাবে কাউকে বাধ্য করে আনন্দ পাওয়া যায় না। এর মধ্যে কোনো সুখের অনুভূতিও নেই। সামাজিক অর্থে শুধু স্বামী-স্ত্রী হয়ে থাকা যায় তাতে। কিন্তু তার মধ্যে ভালবাসা নেই, বন্ধুত্ব নেই, সম্পর্ক নেই। তাহলে সেরকম শপথ করার মানে কী? এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তক্ষকের দিকে তাকাল তানানা। নিজেকে তার বড় অসহায় আর একা লাগল। তক্ষকের একান্ত কাছে এসে দাঁড়াল। বুকের ছাতিতে মাথা রেখে কেঁদে ফেলল। বলল, সত্যি আমি কী যেন? বড় স্বার্থপর। তুমি আমাকে একটুও বোঝ না। একটা বিস্ফোরণ হল বলে জানা হল, তুমি শুধু আমার একার নও, বিপন্ন নাগকুলের সকলের।

তক্ষক বুকের মধ্যে ওকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে একটা চুমু খেল। তাতেই তানানার

চোখের তারায় এক অপরাজিত হাসি চলকে উঠল। বলল, একদিন চক্রান্ত করে কৌরব ও পাণ্ডবেরা মিলে খাণ্ডববনের নাগকুলকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছিল। দেশত্যাগ করার সে অপমান, গ্লানি কোনোদিন ভুলব না। এটাই হল অপমান প্রতিশোধ নেওয়ার শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত। এটাই হল খাণ্ডববনের সঙ্গে আমার যোগসূত্র গড়ে তোলার শ্রেষ্ঠ সময়।

অমনি তানানার মুখখানা আঁধার হয়ে গেল। সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তক্ষক বলল, তোমার মন খারাপ করার কিছু নেই। তক্ষশিলায় বসে সব কাজ করব। তবে সাংগঠনিক কাজকর্মের তদারক করতে মাঝে মাঝে তো যেতে হবে। অনেক পরিকল্পনা এখন বাকি। রাজ্য ছেড়ে যুধিষ্ঠির বনবাসী হল কেন, তা পর্যালোচনা করা এই মুহূর্তে জরুরি। একটা অভিসন্ধি নিশ্চয়ই আছে। আমার মনে হচ্ছে দ্যূতপণে পরাজিত হওয়া তার একটা নাটক। ওরা যখনই কোনো সংকটে পড়ে তা থেকে উদ্ধার হওয়ার জন্য এরকম নাটক করে লোককে বোকা বানায়। প্রত্যেকটি নাটকই অভিনব। সব নাটকই এক মঞ্চে অভিনীত।

তানানা প্রশ্ন করল, সে মঞ্চ বাস্তবে কোথাও নেই। তার মঞ্চ কী তোমার মনোভূমিতে?

মুচকি হাসল তক্ষক। জানতে চাওনি বলে পরিহাস করছ। একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে, কোনো গভীর সংকট সৃষ্টি হলেই পাণ্ডবরা অরণ্যে চলে যায়। অরণ্যের কাছে হাত পেতে ওরা অনেক কিছু পেয়েছে। তাদের এই বনবাসে যাওয়াটা তেমনি কোনো গভীর সংকটের কারণ। দ্যূতক্রীড়া শুধু একটা অছিলা।

তোমার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে উড়িয়ে দেব এমন জোর পাই না মনে।

একটু গভীর করে ভাবলে তুমিও ওদের বনবাসের পেছনে লুকোনো রহস্যের তাৎপর্য খুঁজে পাবে। শতশৃঙ্গ পর্বতের বনাঞ্চলে পাণ্ডবদের জীবননাট্যের সূচনা। প্রস্তুতি শেষ করে তারা হস্তিনাপুরে পদার্পণ করল। হস্তিনাপুরে বসবাস তাদের সুখের না হওয়ার জন্য তারা বারণাবতে গেল। তারপর ফাঁক বুঝে বারণাবতে একটা বড়সড় অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে সকলকে বোকা বানিয়ে অরণ্যে আত্মগোপন করল। এটা হল তাদের জীবননাট্যের দ্বিতীয় অঙ্ক। নাট্যদৃশ্যের তৃতীয় অঙ্কে যাজ্ঞসেনীসহ যদুপতি কৃষ্ণকে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করল হস্তিনাপুরে। এবার তারা একা নয়, রাজনৈতিক মৈত্রীলাভ হয়েছে তাদের। রাজ্য এবং রাজধানী প্রতিষ্ঠার জন্য খাণ্ডববন পুড়িয়ে শ্মশান করল। অমানবিকতার এক নয়া ইতিহাস সৃষ্টি হল ইন্দ্রপ্রস্থ নির্মাণের সময়। রাজ্যপাট ভালই করছিল। হঠাৎ কী হল কে জানে। ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ার মতলবেই যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় ইচ্ছে করে হারল। নাট্যাঙ্কের চতুর্থ অঙ্কেও সেই অরণ্যকে আঁকড়ে ধরল তারা।

তানানা সবিস্ময়ে বলল : আশ্চর্য তো!

অরণ্য ওদের জীবনে আত্মসংশোধনের পাঠশালা। পাছে লোকচক্ষে ওদের অসম্পূর্ণতা ধরা পড়ে তাই গোপনে অনুশীলন করতে এবং প্রস্তুতি শেষ করতেই ওরা অরণ্যকে নির্বাচন করে বলে আমার বিশ্বাস। প্রকৃতির মত বড় শিক্ষক ও শিক্ষালয় আর কোথাও নেই। আমিও অরণ্যের ছাত্র। অরণ্যের মধ্যে বিকশিত হয়েছি। তাই ওদের গতিবিধি, অরণ্যপ্রীতি অন্যদের থেকে একটু বেশি করে অনুভব করি।

তানানা টের পায় তক্ষক তার জীবনের তটভূমি থেকে অনেকদূর সরে গেছে। তাদের সম্পর্কটা আগের মত আন্তরিকতায় মধুর নয়। রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার সঙ্গে যত বেশি যুক্ত হয়ে পড়ছিল তত বদলে যাচ্ছিল সে। তানানার কাছ থেকে ততই দূরে সরে যাচ্ছিল। এখন তো ইন্দ্রপ্রস্থ এবং খাণ্ডবপ্রস্থের জননীতি-রাজনীতি-ক্ষমতানীতির ক্রমবর্ধমান পরিসরের মধ্যে এত বেশি ব্যস্ত যে স্ত্রীর সান্নিধ্যও তার মনে কোনো উন্মাদনা জাগায় না। তার ধ্যানজ্ঞান এখন খাণ্ডবপ্রস্থ।

মনের মধ্যে পুষে রাখা ক্ষোভ নিয়ে একদিন তক্ষকের মুখোমুখি হওয়ার কথা ভাবল। আহারান্তে নিজের কক্ষে যখন বিশ্রাম নিচ্ছিল তক্ষক তখন চুপিচুপি তানানা তার শয্যাপার্শ্বে বসল। পরিচারিকাদের বিদায় দিয়ে নিজেই পাখা নিয়ে হাওয়া করতে লাগল তাকে। তক্ষকের অর্ধমুদ্রিত দুই চোখের উপর চোখ রেখে বলল, খাণ্ডবপ্রস্থ নিয়ে অনেক কথা শুনতে পাই। তোমার কাছ থেকে আরও ভাল করে শুনব বলে এসেছি।

পান চিবোতে চিবোতে তক্ষক নিস্পৃহভাবে বলল, কী শুনতে চাও বল?

চারদিকে কত ধরনের গুজব। সত্যমিথ্যে নিয়ে সংশয়।

গুজবে কান দিও না।

কিন্তু গুজব ছড়িয়ে লোকের লাভ কী? তাছাড়া কথায় বলে যা রটে তার কিছু ঘটে।

হাঁ, লোকে মিথ্যে আর নিন্দে শুনতে ভালবাসে। স্বার্থান্বেষীরা তক্ষকের ভাবমূর্তি কলঙ্কিত করতে চায়। সাধারণ মানুষকে যা বোঝানো যায় তাই বোঝে তারা। ভালমন্দ বোধ তাদের নেই। খাণ্ডববাসীর মনে আমার সম্পর্কে বিদ্বেষভাব জাগিয়ে তোলা ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য তাদের নেই। পাণ্ডবদের নীতি হল নোংরামি করে সম্মানিত ব্যক্তিকে অপদস্থ করা। এর প্রতিবাদ করলে সংঘাত সৃষ্টি হয়। কিন্তু তাতে প্রতিপক্ষের ফাঁদেই পা দিতে হয়। তার চেয়ে চুপ করে থাকলে প্রতিপক্ষ নিজেই জব্দ হয়। একসময়ে শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে থেমে যায়।

তানানার গৌরবর্ণ মুখে অবিশ্বাসের মৃদুহাস্য মিলে এমন এক অভিব্যক্তি ফুটল যা দেখে তক্ষক বিব্রতবোধ করল। তানানা বলল, তোমার বন্ধু চন্দ্রকান্ত বণিকের কাছে যা শুনেছি তাকে মিথ্যে বলবে?

তক্ষক পাশ ফিরে শুতে শুতে বলল, চন্দ্রকান্ত তোমার মগজে কী ঢুকিয়েছে আমি জানি না।

নিশ্চয়ই খারাপ কিছু ঢোকায়নি! তুমি গুজব বলে যা উড়িয়ে দিচ্ছ আদৌ সে তা বলেনি। মিছেই তুমি ভয় পাচ্ছ। আসলে, নিজেই নিজের ঘটনা জালে বন্দী তুমি। তাই সবসময় একটা কিছু ঘটার আশঙ্কায় আতঙ্কিত। বলতে পারি একটা ভয়ংকর মানসিক সংকটের মধ্যে তুমি আছ। অথচ, স্ত্রী হিসেবে আমি তা জানি না। গোপন করলে কেমন করে জানাব? বাইরে থেকে খাণ্ডববনের স্বার্থ নিরাপদ করার যে কাজ করছ তার প্রতি যথেষ্ট উদ্বেগ থেকে এক ধরনের অন্তর্বিরোধের শুরু হয়েছে তোমার মধ্যে।

চন্দ্রকান্ত তোমাকে ঠিক কী বলেছে সেটা শুনতে বেশি আগ্রহী।

চন্দ্রকান্ত মিথ্যে কিছু বলেনি। যা হয়েছে তাই বলেছে। জরাসন্ধকে হত্যা করে পাণ্ডবেরা ভারতের রাজন্যবর্গকে অভিভাবকহীন করেছিল। রাজশক্তির নতুন মেরুকরণ করার আগে তারা দিগ্বিজয়ে যাত্রা করে জানল ছোট বড় মাঝারি রাজ্যগুলির মনোভাব। কোন পক্ষে কে থাকবে তাও চিহ্নিত করেছিল তারা। শুধু তাই নয়, নবপ্রতিষ্ঠিত পাণ্ডবরাজ্যের সঙ্গে কোনোরকম সংঘাতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তবে রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হলে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা করেই তা মিটিয়ে নেবে ভেবেছিল। যেহেতু রাজনৈতিক আনুগত্য তখনও স্পষ্ট হয়নি, তাই রাজসূয়যজ্ঞ করে মহারাজ যুধিষ্ঠির একসঙ্গে রাজশক্তি ও নেতৃত্বের এক নয়া মেরুকরণ করল। কৃষ্ণের হস্তেই তার নেতৃত্ব অর্পণ করল। এরকম একটা সাফল্যের সময় তুমি কৃষ্ণের বিপক্ষ শিবিরের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করছ কেন? কৃষ্ণের শত্রু হওয়া কী ভালো কাজ? এতে তোমার লাভ কী?

রাজনীতি বড় জটিল রানি। লাভালাভের অঙ্কটাও সহজ নয়। পাণ্ডবদের জন্য আমি রাজ্য, সিংহাসন, স্বজন হারিয়েছি। তাদের উপর এখনও প্রতিশোধ নেওয়া হয়নি আমার। নাগকুলের বৃহত্তর স্বার্থে এবং খাণ্ডববন পুনরধিকার করতে পাণ্ডবদের বিপক্ষে যাওয়া ছাড়া আমার গত্যন্তর ছিল না, ওরা আমাকে শত্রুর চোখে দেখে। তাই তোমার বোঝার মধ্যে কিছু ভুল আছে।

বিরক্তিতে তানানা ভুরু কুঁচকাল। সবিস্ময়ে উচ্চারণ করল— ভুল! কৃষ্ণকে সর্বভারতীয় নেতৃত্বে অভিষেক করাকে ভুল বলছ?

ভুলের বিচারক মহাকাল। সর্বভারতীয় নেতৃত্বের অভিষেক কিন্তু শান্তিপূর্ণ হয়নি। রাজনৈতিক শক্তির নয়া মেরুকরণে কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অর্ঘ্য দেওয়া ভীষ্মের একার সিদ্ধান্ত। সর্বসম্মতিতে তাঁর অভিষেক হয়নি বলে উপস্থিত রাজন্যবর্গের উষ্মা, ক্ষোভ, বিদ্রোহের রূপ নিল। শিশুপালের প্রকাশ্য বিদ্রোহ ছিল রাজনৈতিক হঠকারিতা। রাজসূয় যজ্ঞ করে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের বন্ধুত্ব অর্জন করল। কিন্তু সারা ভারতের অধিকাংশ রাজন্যবর্গের কাছে তিনি কিন্তু জাত-শত্রু হয়ে থাকলেন। কার্যত, এই যজ্ঞে পাণ্ডবদের লাভের চেয়ে লোকসান হল বেশি। যে শত্রুতা ছিল শতরঞ্চির নিচে ঢাকা তাকেই প্রকাশ্যে টেনে আনল পাণ্ডবেরা।

তানানা বেশ একটু বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, রাজনৈতিক লাভ-লোকসান তো যে যার নিজের মত বিচার করে। তোমার কাছে যা লোকসান পাণ্ডবদের কাছে তা লাভ হতে পারে।

তক্ষক বলল, এটা অঙ্কের যোগ-বিয়োগের হিসেব। ও তুমি বুঝবে না। বাকিটুকু জান না। রাজসূয় যজ্ঞ কিন্তু শান্তিতে সম্পন্ন হয়নি। তারপরের দিনগুলো কৃষ্ণ ও যুধিষ্ঠির শান্তিতে ছিল না। রাজসূয় যজ্ঞের অব্যবহিত পরেই সৌভ-রাজ শল্য কৃষ্ণের দ্বারকা আক্রমণ করল। দীর্ঘকাল ধরে তাঁদের মধ্যে যুদ্ধ চলল। কিন্তু নেপথ্যে আর এক নাটকের

মহড়া চলল হস্তিনাপুর এবং ইন্দ্রপ্রস্থে। ভারতের অধিকাংশ রাজন্যবর্গ নিয়ে একটা বিরাট রাজনৈতিক শক্তি পাণ্ডবদের বিপক্ষে জোটবদ্ধ হল। দুর্যোধনের নেতৃত্বে নতুন জোটের অভ্যুদয় হল। ভারত রাজনীতিতে রাষ্ট্রজোটের আর এক নয়া মেরুকরণ হল নিঃশব্দে। পাঞ্চাল এবং যাদব রাজ্যগুলি ছাড়া পাণ্ডবদের পাশে কেউ রইল না। এরকম একটা সংকট সময়ে পাণ্ডবরা অসহায় এবং বিপন্ন বোধ করছিল। সুতরাং তাদের এই রাজনৈতিক অসহায়তার সুযোগ গ্রহণ করা আমার দিক থেকে কোনো অন্যায় নয়। রক্তারক্তি করে নয়, খাণ্ডববনের মানুষের অসন্তোষকে উস্কে দিয়ে পাণ্ডবদের রাজনৈতিকভাবে বিব্রত এবং বিপন্ন করার উদ্দেশ্যে অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্মের মাত্রা আরো বাড়ানোর জন্য লুকিয়ে খাণ্ডববনে যেতে হয় আমায়। তাই পাণ্ডবরা রটাচ্ছে নিজের স্বার্থে তক্ষক খাণ্ডববনের মানুষদের তাতিয়ে তাদের মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গল করছে বেশি। খাণ্ডববনের দুর্বৃত্তদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে সে সন্ত্রাস ছড়াচ্ছে তাতে নিরীহ মানুষগুলো মরছে। তক্ষক দেশের আতঙ্ক দশের শত্রু। সে মানুষরূপী শয়তান।

তানানা বলল : সাধ করে এসব অপবাদ ঘাড়ে নেওয়ার কী দরকার তোমার? বেশ তো আছ এখানে।

তক্ষকের অধরে সাফল্যের প্রত্যয়পূর্ণ হাসি। বলল, রটনা মিথ্যে ছিল বলেই লোকে নিজে থেকে প্রত্যাখ্যান করল। খাণ্ডববনের মানুষজনের মধ্যে অন্তর্কলহের যে আগুন পাণ্ডবেরা ছড়াচ্ছিল তা কার্যত ব্যর্থ হয়ে গেল। রাজ্যের অভ্যন্তর থেকে একটা বড় ধরনের প্রত্যাঘাত আসতে পারে আশঙ্কা করে পঞ্চপাণ্ডব উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছিল। ঠিক এই মুহূর্তে দুর্যোধনের কাছ থেকে পাশা খেলার আমন্ত্রণ এল। যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল। এবং পাশার সব দানেই সে হারল। সসম্মানে ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ার উদ্দেশ্যেই সর্বশেষ পণ রাখল দ্রৌপদীকে। পণে পরাজিত দ্রৌপদীকে সভাকক্ষে লাঞ্ছনা করে কার্যত কৌরবেরা নিজের গৌরব ও মর্যাদা হারাল। ধৃতরাষ্ট্র ভুল শোধরাতে পরাজিত পাণ্ডবদের মুক্ত করেছিল। তাতে যুধিষ্ঠির পুনরায় অসহায়বোধ করল। বিপন্ন রাজনৈতিক দুরবস্থা থেকে সসম্মানে নিজেকে মুক্ত করার লক্ষ্য ব্যর্থ হয়ে গেলে যুধিষ্ঠির পুনরায় পাশাখেলার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করল। এবারে একদানে হয় রাজ্যলাভ, না হলে বনবাসে রাজি হয়ে যুধিষ্ঠির আবার পাশা খেলল এবং সর্বস্ব হারাল। সসম্মানে ইন্দ্রপ্রস্থ ত্যাগ করার রাস্তা খুলে গেল। আমারও ভাগ্য খুলল মিত্রপক্ষর সহায়তায় স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তনের।

তানানা বলল, পঞ্চপাণ্ডব ইন্দ্রপ্রস্থ ছেড়ে বনবাসী হল কেন তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমার সব ভাবনা তোমাকে নিয়ে। তক্ষশিলায় তোমার কোনো শত্রু নেই। বিপক্ষেও কেউ নেই। তৎসত্ত্বেও এদেশকে তোমার নিজের রাজ্য, নিজের দেশ মনে করতে পার না কেন? তক্ষশিলার অধিপতি তো তোমাকে কেউ করে দেয়নি। এদেশের মানুষ তোমাকে রাজপদে নির্বাচন করেছে। তাহলে, খাণ্ডবপ্রস্থের প্রতি তোমার এত টান কেন?

জন্মভূমির টান। স্বদেশের টান। ও তুমি বুঝবে না। অধিকার অন্যকে কেউ দিতে চায় না।

পৃথিবীতে কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়। কোনো অভাবই অপূরণীয় নয়। সন্তান মরে গেলে ক'দিন পরে মাও শোক ভুলে যায়। সন্তানহারা জননীর মুখেও একসময় হাসি ফিরে আসে। তাহলে তুমি ভুলতে পারছ না কেন। তক্ষশিলা তোমাকে অনেক দিয়েছে। আমিও উজাড় করে দিয়েছি তোমায়। কিন্তু তুমি পারনি সব সঁপে দিয়ে শান্ত হতে।

নাগকুলের গণ্যমান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা আমাকে শান্ত থাকতে দিচ্ছে কই? নাগকুলের মঙ্গলের কথা, উন্নতির কথা যেভাবে আমি ভাবি সেভাবে অন্যরা ভাবে কোথায়? সাহস, দৃঢ়তা, উদ্ভাবনী শক্তির আকাল চলেছে নাগকুলে। লড়াকু মনোভাবটাই নেই। তাই এত দুর্দশা। নাগকুলের পরম শত্রু কৃষ্ণর সঙ্গে নাগপ্রধানেরা মিত্রতা স্থাপন করল কোন আক্কেলে? কৃষ্ণ তাদের কী দিতে পারে?

সব জেনেও তুমি একা কেন লড়াইয়ের মাঠে নামতে চাইছ। বৃহৎ নাগরাজ্য গঠনের স্বপ্ন তোমার স্বপ্নেই রয়ে যাবে। ব্যর্থতাজনিত হতাশায় কষ্ট পাবে। এত ছোটাছুটি যে পণ্ডশ্রম হবে না কে বলতে পারে? শুনেছি কৌরবনাগের কন্যা উলুপী অর্জুনের কণ্ঠে বরমাল্য দিয়ে পতিত্বে বরণ করেছে। এর অর্থ একশ্রেণীর নাগরা তোমার পাশে নেই। তোমার ঐক্যচেষ্টার মূলে কুঠারাঘাত করে তারা তোমাকে একা করে দিচ্ছে। তুমি একা ঠিক করছ, অন্যরা ভুল করছে এটা তো নাও হতে পাবে। আমার তো মনে হয় তোমার পথের তুমিই একমাত্র নিঃসঙ্গ অভিযাত্রী। নিজের ভাল যারা চায় না তাদের ভাল কোনোদিন করা যায় না।

তবে, খাণ্ডবপ্রস্থের কথা আলাদা। ওখানকার মানুষের মনে আগুন জ্বলছে। খাণ্ডববনের নাগরিকরা হস্তিনাপুরের অধীনে ছিল ঠিকই কিন্তু তারা একপ্রকার স্বাধীন ছিল। তাদের নিজস্ব একটা সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও ইতিহাস ছিল। পাণ্ডবদের হাতে তা নিশ্চিহ্ন হল। তাদের স্বাধীনসত্তা এবং জাতীয় ইতিহাস তারা মুছে দিল। তাই ইন্দ্রপ্রস্থকে আমি ক্ষমা করতে পারি না। পাণ্ডবেরা এবং আমরা আলাদা আলাদা জাতি। আলাদা আলাদা সম্প্রদায়। অনেক সম্প্রদায়ের বাসভূমি খাণ্ডবপ্রস্থ। একটি পৃথক জাতিরূপে আত্মপ্রকাশের স্বপ্ন দেখছে তারা। কিন্তু একদিন একতাবদ্ধ হতে না পারার জন্য খাণ্ডববন ধ্বংস হল। তার নাম পর্যন্ত মুছে ফেলা হল। নতুন করে নামকরণ করা হল। ইন্দ্রপ্রস্থ নামে নতুন রাজ্যের পত্তন হল। হস্তিনাপুরের এ সিদ্ধান্তকে খাণ্ডবপ্রস্থের মানুষ মেনে নেয়নি, কেবল গুটিকয়েক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রতিপত্তি-লাভ ও ক্ষমতালোভের পথ সুগম করার জন্য খাণ্ডবপ্রস্থের মানুষের স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার অধিকারকে খর্ব করা হল। অথচ, অনার্যরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তবু পাণ্ডবেরা ক্ষমতালোভে উন্মাদ হয়ে এক গৃহযুদ্ধ সৃষ্টি করে রক্তের নদী বইয়ে দিল। সে কথা কী ভুলতে পারি।

তানানা বলল, পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে নেই, কিন্তু পাণ্ডবজননী মহীয়সী কুন্তী পুত্রদের সঙ্গে এবার বনবাসে গেলেন না। পুত্রবধূরাও ইন্দ্রপ্রস্থে থাকলেন। কার্যত বিদুরের সহায়তায় কুন্তী ইন্দ্রপ্রস্থের প্রশাসনিক কাজকর্ম ভালভাবেই করছেন। পাণ্ডবরা নেই, কিন্তু

তাদের ছায়া আছে। সেই ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ চালানোর কাজটা খুব সহজ নয়। সেখানে পাঞ্চাল এবং যাদবরাজ্যের পর্যবেক্ষকরা মোতায়েন আছে। সুতরাং পাণ্ডবরা একেবারে একা এবং সহায়হীন এরকম ভেবে আত্মপ্রসাদে থাকা মূর্খতা। তুমিও জান রাজনীতির সবচেয়ে বড় কাজ হল জনসংযোগ রক্ষা এবং নেতৃত্বের প্রতি জনগণের আস্থাকে কব্জায় রাখা। এ কাজটা যে পঞ্চপাণ্ডবদের অনুপস্থিতিতে থেমে নেই তুমিও তা জান।

বিগলিত গলায় তক্ষক বলল : তুমি তো রাজনীতি ভালই বোঝ। কিন্তু কৌশলগত দিকটা নানাভাবে জিইয়ে রাখতে হয়। খাণ্ডববাসীর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করতে হবে যে পাণ্ডবরা বিদেশি। তারা হিমালয় থেকে এসেছে। গায়ের জোরে আমাদের অধীনে রাখতে চায়। সেজন্য বিচ্ছিন্নতাবাদের ভ্রান্ত দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষনীতি প্রয়োগ করে আমাদের মধ্যে এক খণ্ডযুদ্ধ বাধিয়ে দিচ্ছে। সাম্প্রদায়িকতার বিষে সদ্ভাবের পরিবেশ বিষিয়ে গেছে। তাই বন্ধুত্বে বৈরিতা, বিশ্বাসে সন্দেহ নিয়ে পুনরুভ্যুত্থানের কথা ভাবা যায় না। এ অবস্থায় মানুষের বন্ধু হয়ে তাদের বোঝাতে হবে, আমরা এক দেশের মানুষ, আমাদের জাতীয়তা এক, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এক; তাহলে কৃত্রিম ভেদাভেদ কেন? শত্রুর সঙ্গে লড়াই না করে নিজেদের সঙ্গে সংগ্রাম করে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। আমাদের শত্রুদের চিনতে হবে। আমাদের সব জেহাদ তাদের বিরুদ্ধে। যারা সাম্প্রদায়িকতা এবং দ্বিজাতিতত্ত্বের কথা বলবে, তারাই শত্রু। নিজেদের গোষ্ঠীর লোক হলেও তারা শত্রু পদবাচ্য। তাদের খতম করে মুখ বন্ধ করে দাও।

পেটে খিদে নিয়ে এই জেহাদ হয় না বুঝলে।

জানি বলেই, বেতনভোগী জেহাদি বাহিনী গড়ছি। কাজ পাওয়ার লোভে খাণ্ডববনের অভাবী মানুষেরা দলে দলে ভিড় করবে। জন্মভূমির জন্য আত্মবলিদানের মত পবিত্র কর্মে উৎসাহী হয়ে মরতেও ভয় করবে না তারা। তাদের আত্মবলিদানের পথ ধরে একদিন পাণ্ডবদের সন্ত্রস্ত করে তুলব। খাণ্ডবের মাটি থেকে তাদের উচ্ছেদ করব। এক জীবনে না হলেও আর এক জীবনে করব। এ আমার প্রতিজ্ঞা। আমার জেহাদ থেমে থাকবে না। পাণ্ডবদের অধিকার থেকে খাণ্ডববনকে একদিন মুক্ত করবই। প্রয়োজনে সন্ত্রাসের পথে সমূলে বিনাশ করব পাণ্ডববংশ। এ আমার হুঙ্কার নয়, অঙ্গীকার। ইতিহাসের চাকার তলায় তার জয়ের রাজপথ তৈরি হচ্ছে। পাণ্ডবদের বনগমনের মধ্য দিয়ে তার এক নতুন ইতিহাস সূচনা হল।

তানানা কথা বলতে পারল না। একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল তার। বলল, তোমার কথাগুলো শুনতে ভীষণ ভাল লাগে। মরা মানুষের বুকেও স্বপ্ন তৈরি হয়।

ছয়

পাণ্ডবদের বনগমনের অব্যবহিত পরেই তক্ষক খাণ্ডবপ্রস্থে প্রত্যাগমন করল। সরজমিন করে বুঝল, কৌরবরা তার বিপক্ষে যাবে না। বরং, ইন্দ্রপ্রস্থ যত অশান্ত হয় ততই তাদের মঙ্গল। তাই খাণ্ডববাসীকে জনযুদ্ধের জন্য তৈরি করার এক কর্মপন্থা নিল।

ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের প্ররোচনায় যুধিষ্ঠির সারা অরণ্যভূমিতে ত্রাস সৃষ্টি করতে কৃষ্ণার্জুনের সহায়তায় যে দাবানল সৃষ্টি করেছিল তা থেকে পরিত্রাণের কোনো রাস্তা খোলা ছিল না। বন্যপ্রাণীদের সঙ্গে সাধারণ বনবাসীদেরও নিরাপদ আশ্রয়ের বদলে দাবাগ্নির মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। সেই নিষ্ঠুর অমানবিক বর্বরতার কথা স্মরণ করে দিয়ে তাদের মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বালল। সেজন্য তাদের সংঘবদ্ধ হওয়ার শিক্ষা দিল সর্বাগ্রে। এক হয়ে সকলকে লড়ে বাঁচতে হবে অথবা স্বাধীনতার জন্য মরতে হবে। ভূমিহীন, গৃহহীন মানুষদের স্বভূমিতে প্রত্যাবর্তনের স্বপ্ন দেখাল তক্ষক। যারা তাদের জমিজমা কেড়ে নিয়েছিল তাদের ঘরে কেউ মজুর খাটবে না, দাস-দাসীর কাজ করবে না, তাদের স্বার্থে স্বজাতির বিরুদ্ধে কেউ লাঠি ধরবে না। সর্বব্যাপী অসহযোগিতার নির্দেশ প্রত্যেককে অক্ষরে অক্ষরে মানতে বাধ্য থাকতে হবে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের রক্তচক্ষুর ভয়ে কেউ যদি তক্ষকের নির্দেশ না মানে তাহলে প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করে তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হবে। নিজের জাতির বিরুদ্ধে যে দাঁড়াবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হবে জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে তাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। আবার তার মনিবরাও একজন চাকরের বা মজুরের প্রাণ বাঁচাতে যে এগিয়ে আসবে না সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হল। জাতির সঙ্গে শত্রুতা করা মানে ঘরে বাইরে সে একা।

মানুষকে সংঘবদ্ধ করার জন্য, এক মন, এক প্রাণ হওয়ার জন্য, মন্দিরের প্রতি জনগণের আনুগত্যকে মূলধন করে যত্রতত্র নাগমন্দির এবং দেবনিকেতন তৈরি হল। প্রতি বৃহস্পতিবারে সেখানে পূজারতি করা, দেখা এবং ধর্মকথা শোনা বাধ্যতামূলক করা হল। ধর্মের উপাখ্যানে নাগজাতিদের যে ঐতিহ্যের গৌরবও বীরত্ব গাথা আছে তা থেকে কী করে তারা বিচ্ছিন্ন হল, কাদের জন্য এই দুরবস্থায় এসব কথা ও কাহিনী। তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথ প্রশস্ত করল। নিজেরাই বুঝল অপপ্রচারের ফলে তারা সকলের চোখে ছোট হয়ে গিয়েছিল। এমনকি নিজের কাছেও। তাই এদের কোনোদিন ক্ষমা না করার ডাক দিল তক্ষক। শত্রুর শেষ রাখবে না বলে এক খতম অভিযান শুরু হল সর্বত্র। ইন্দ্রপ্রস্থের সুখ, শান্তি, নিরাপত্তা বলে কিছু থাকল না। সন্ত্রাস কবলিত হল ইন্দ্রপ্রস্থ।

খাণ্ডববাসীর চোখে পাণ্ডবরা ছিল বহিরাগত। খাণ্ডবপ্রস্থের ওপর তাদের কর্তৃত্ব ও অধিকারকে এদেশের অধিবাসীরা মানল না। বরং তাদের চোখে পাণ্ডবরা এক নিষ্ঠুর ক্রূর প্রকৃতির মানুষ এবং নিকৃষ্ট জীব ছাড়া কিছু নয়। তাই তাদের ক্ষমা করল না।

তক্ষকের কাজকর্ম নিয়ে কে কী ভাবল বা বলল, তার পরোয়া করল না। বরং ভারতের সর্বপ্রান্তে ছড়িয়ে থাকা নাগকুলকে কী করে একজোট করা যায় তার কথাই গুরুত্ব দিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতে লাগল। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত পরিদর্শন করে তক্ষক দেখাল যেখানেই নাগকুল বাস করে তাদের ধর্মকর্ম, সামাজিক উৎসব, রীতি-নীতির সঙ্গে কারো কোনো প্রভেদ নেই। বরং একটা আশ্চর্য মিল আছে। এই মিলের সূত্র ধরে গোটা নাগকুলকে একত্র করা যাবে বলে তার বিশ্বাস। ধর্মীয় অনুশাসন সামাজিক

রীতি-নীতি আনুগত্যের মধ্যে লুকিয়ে আছে জাতীয় সুশৃঙ্খলা, প্রীতির বন্ধন ও সাম্প্রদায়িক একাত্মতা। ধর্মের মত শক্তিশালী সামাজিক বন্ধন সম্বন্ধে সকলকে আরো সচেতন করার জন্য প্রতি বৃহস্পতিবারে প্রত্যেককে গাছ-পূজায় সমবেত হতে হত। নাগকুলকে অবহিত করার জন্য নাগপুরোহিতরা তক্ষকের বক্তব্যই বলত।

তোমরা তো তোমাদের ধর্ম, তোমাদের ঠাকুর, তোমাদের ঐতিহ্যকে ভালবাস। তোমাদের মনের সব খুশি তো এসব দেবতার কীর্তিকাহিনীর কাছ থেকে পাওয়া। তোমরা ধর্মের কথা, দেবদেবীর কথা এত বেশি শুনতে চাও বলে বৃহস্পতিবারের জন্য অধীর আগ্রহে বসে থাক। একটা দিনও এখানে না এসে পার না। এই সামান্য কথাগুলোর মধ্যে কিছুই নেই, তবু তা শোনার জন্য তোমাদের চোখের পাতা তিরতির করে কাঁপছে। আগ্রহের আলো পড়েছে প্রত্যেকের মুখের ওপর। তাতেই তোমাদের রূপ বদলে গেছে। শ্রীময় হয়ে উঠেছে তোমাদের তনুমন। মনে হচ্ছে ঈশ্বরের আশীর্বাদের স্বর্গীয় আলো চুঁইয়ে পড়ছে তোমাদের গা বেয়ে। তোমরা যে এত ফলমূল, চাল-ডাল দিয়ে গাছকে ঠাকুর ভেবে পূজা কর, তাঁর কাছে মঙ্গল কামনা কর — সে কার জন্য? শুধু নিজের জন্য, না পরিবারের জন্য, সমাজের জন্য। দেশের মানুষের ভাল চাও তাঁর কাছে। তোমাদের নৈবেদ্য পেয়ে খাণ্ডববনের গাছঠাকুর আজ জেগে উঠেছেন। অসংখ্য শাখাপ্রশাখার হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলছেন : আমাকে তোমরা ভিখারি ভেব না। আমি তোমাদের ফল দেই, আশ্রয় দেই, ছায়া দেই। কিন্তু মনের কথা বোঝাতে পারি না। এখন মনে হচ্ছে, বোঝানোর সেই দিনটা হয়েছে। তোমাদের বেঁচে থাকার জন্য একটা জরুরি শর্ত হল : একত্র হও। এককাট্টা হয়ে কাঁধে কাঁধ দিয়ে সম্মানের জন্য, অধিকারের জন্য লড়াই কর। সম্মান কী করে পেতে হয় শিখে নাও বাসুকিনাগের কাছে। নারায়ণের অনন্তশয্যা হয়ে সে সকলের দ্বারা পূজিত হতে লাগল। আবার দেখ, অহির্বুধ্ন্য শিরঃভূষণ হয়ে শিবের মাথার মুকুট হয়ে রইল। নাগজাতি কোনোকালে মানে-মর্যাদায় গৌরবে হীন ছিল না এই সত্যটা ভুলে যাওয়ার মূল্য দিতে হচ্ছে আমাদের।

তক্ষকের কথাগুলো বনের গন্ধের মত নাকে লেগে রইল জনতার। তক্ষকের প্রত্যেকটি কথা তাদের মনেতে অনুরাগে, শ্রদ্ধায়, লাল সাদা ফুল হয়ে ফুটল। সন্ধ্যা আকাশে তারার মত মিটমিট করে জ্বলছিল তাদের বুকে। কথা তো নয়, যেন ছিলে কাটা হীরে। কতরকমের দ্যুতি তার। কত রঙ, কত আলো তার। গৃহে ফেরার পথে মনটা রাঙিয়ে রাখল। সেই সময় আত্মদানের এমন এক অনির্বচনীয় আবেগে মন ভরপুর হয়েছিল যে দেশ ও জাতি ছাড়া আর কারো কথা মনে পড়ল না।

তক্ষকের কথার মধ্যে এমন কিছু ছিল যার অস্তিত্ব তার মনের মধ্যে অনেকক্ষণ লেগে রইল। তক্ষকের কোঁকড়া চুলে ঘেরা ওর সুন্দর মুখের ওপর একরাশ চাঁদের আলো পড়েছিল। কী অসাধারণ লাগছিল তাকে। মনে হল, চাঁদের দিকে তাকিয়ে ঊর্ধ্বমুখে কিছু যেন প্রার্থনা করছিল। হয়ত কোনো অজ্ঞান, অশুভ আশঙ্কায় তার ভেতরটা অস্থির হচ্ছিল। শৃঙ্গি সবিস্ময়ে তার চোখের ওপর চোখ পেতে রাখল। তার হৃদয়ের কথাটা কান পেতে শোনার জন্য উৎসুক হয়ে উঠল। হঠাৎ শৃঙ্গির উপর চোখ পড়তে

তক্ষক জিগ্যেস করল, অমন করে তাকিয়ে আছ কেন?

শুকনো গলায় ঢোঁক গিলে বলল, আপনাকেই খুঁজছি। মনে হচ্ছে, কোন সুদূরে হারিয়ে গেছেন যেন। এক মুহূর্তে ধরাছোঁয়ার বাইরে অন্য এক মানুষকে দেখছিলাম। কেবলই ভাবনা হচ্ছিল, পারব কি অত বড় দায়িত্বের বোঝা বইতে? কত সামান্য কথা দিয়ে মানুষের বুকে সুধাসিন্ধু বইয়ে দিতে পারেন। প্রত্যেক সম্পর্কের মধ্যে আর একটা গভীর গোপন অর্থ আছে যা দেশকাল ও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে অভিন্নরূপ লাভ করে। বাসুকিনাগের অনন্তশয্যা নিয়ে যে নবব্যাখ্যা করলেন তা কিন্তু কিংবদন্তির গল্প ও ঘটনাকে একটুও বিপর্যস্ত না কবে যথাস্থানে তার অর্থকে রেখে তার থেকে যতটুকু পাবার তা গ্রহণ করে মানুষের কাছে তাকে মহার্ঘ্য করে তোলার এই কৃতিত্বের কোনো তুলনা হয় না। এমন করে পুরনো ঘটনার পূর্ণ মূল্য চুকিয়ে দিয়ে তাকে সমসাময়িক ঘটনার সঙ্গে মেশানোর এই মুনসিয়ানা তো সকলের নেই। অন্তরের গভীরতম স্থানে কাহিনীব নবনির্মাণকে পৌঁছে দেবার এই আশ্চর্য মায়াজাল সৃষ্টির জাদু তো আমি জানি না। তার ধারের কাছেও কোনোদিন পৌঁছতে পারব না। কত সুন্দর হাতে মানুষের প্রাণের দীপটাকে উজ্জ্বলতর করলেন।

কথাগুলো বলার সময় এক অদ্ভুত ভাবান্তর সৃষ্টি হল শৃঙ্গির মধ্যে। তার ভাবাবেগের মধ্যে একটা তবঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল। খাণ্ডববনের মাটি থেকে পাণ্ডবদের উৎখাত করার যে বীজ বপন করেছে তক্ষক — তা যে খুব দ্রুত শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে একদিন এক বিরাট মহীরুহ হয়ে মানুষের মনের ভেতর যে ডাল-পালা মেলে দেবে তাতে কোনো সংশয় নেই শৃঙ্গির। অদ্ভুত একটা পরিতৃপ্তি নিয়ে বলল, বাবা বলেন, কাল শুধু আকর্ষণ করে। আমার মনে হচ্ছে, আপনি সেই কাল প্রেরিত ব্যক্তি। নাগকুলের মুক্তিদূত। মনের জানলা খুলে বাইরের আলো-হাওয়া নিয়ে একেবারে খাণ্ডববনের মানুষের হৃদয়ের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। আপনাকে আটকায় কে?

কথার মধ্যে শৃঙ্গিকে বাধা দিয়ে বলল, স্তুতি শুনতে ভালবাসি না।

কিন্তু যা সত্য তা বললে যদি স্তুতি করা হয় তাহলে আমার কিছু করার নেই। সময়ের অগ্নিগর্ভে আপনার জন্ম।

তুমি বড় আবেগপ্রবণ।

আবেগ হল স্বাস্থ্যের লক্ষণ। আবেগ ছাড়া কোনো মহৎ কাজ হয়? আপনার কূটনীতি, ভারত-রাজনীতিতে একটা বড় চমক। দেশময় তার প্রতিক্রিয়া। ইন্দ্রপ্রস্থের রাজনীতিতে তার ছায়া পড়েছে। স্বয়ং কৃষ্ণ উদ্বিগ্ন। বনবাসী পাণ্ডবদের সঙ্গে নিয়মিত সংযোগ রক্ষা করে চলেছেন। শোনা যাচ্ছে, দুর্যোধন আপনার কাজে অত্যন্ত সন্তুষ্ট। শীঘ্রই আপনাকে হস্তিনাপুরে আহ্বান করবে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি, পাণ্ডবরাও চুপ করে বসে নেই। মিত্র ও অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তারা পার্বত্য রাজ্যগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করছে। দেবশিবিরের শরণাপন্ন হওয়ার জন্য আপনারও দায়িত্ব ও কর্তব্য বেড়ে গেল। নীতি নির্ধারণে আরো সতর্ক হতে হবে। ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবর্তনের সময়সীমাকে বিলম্বিত করার

এক নীতি নিয়েছে পাণ্ডবরা। তাদের অঙ্ক হল সময় যত অতিক্রান্ত হবে তাদের সঙ্গে কৌরবদের বিবাদ-বিসম্বাদ এবং নাগদের সঙ্গে মনোমালিন্যের উত্তাপ হ্রাস পাবে। সম্পর্কটা স্বাভাবিক হয়ে আসবে। তাই হঠাৎই নিরুদ্দেশ হয়ে তাদের ধারণা পরখ করে দেখছে। কৌরবরা তত্ত্ব-তল্লাশ করেও তাদের সন্ধান পায়নি। তারা জীবিত, কী মৃত, কিংবা দেশান্তরী কি না, তাও জানা যায়নি। তাদের অজ্ঞাতবাস নিয়ে বেশ একটা ধাঁধা সৃষ্টি হয়েছে।

শৃঙ্গির কথাগুলো তক্ষককে উৎফুল্ল করল। সম্মুখে যমুনা তর্‌তর্‌ করে বয়ে যাচ্ছিল। সেইদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে তক্ষক বলল, যমুনার সামনে দাঁড়ালে আমার অনুভূতি ঐ ধাবমান জলধারার মত কলকলিয়ে উঠে। এক সুদূর অতীত আমার চোখের পর্দায় ভেসে ওঠে। ঋষি পরাশর, ম্লেচ্ছকন্যা সত্যবতী, মহারাজ শান্তনু, মহাবীর ভীষ্ম, দাসরাজ, মহাকবি দ্বৈপায়ন — এক একটা ঘটনার স্রষ্টা। নিজের অজান্তে হৃদয়ভরা জিজ্ঞাসা নিয়ে ওদের মুখোমুখি দাঁড়ালে আমার মধ্যে এক জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়।

লালসা পরিতৃপ্ত করতেই মহারাজ শান্তনু সত্যবতীকে কামনা করেছিল। কিন্তু দাসরাজ তাঁর প্রার্থনা পূরণের ওপর শর্ত আরোপ করে বুঝিয়ে দিল রাজার কৃপার চেয়ে মেয়ের ইজ্জতের দাম অনেক বেশি। তার জন্য রাজাকে যথার্থ সম্মান মূল্য দিতে হবে। দাসরাজ কৌশলে কৌরব রাজবংশের অভ্যন্তরে সমান্তরাল একটি অনার্য রাজবংশ সৃষ্টি করার জন্য দেবব্রতকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্ব থেকে বঞ্চিত করে সত্যবতীর গর্ভজ পুত্রকে রাজা করার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিল। দৈব অনুকূল ছিল বলে পুত্রবর দ্বৈপায়নের সাহায্যে পুত্রবধূদের গর্ভে এক নতুন বংশধারা পত্তন করল। কৌরববংশের অভ্যন্তরে সিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্ব নিয়ে এক সংকটের সূত্রপাত হল। একপক্ষে রইল ভীষ্ম, অন্যপক্ষে দ্বৈপায়ন, সত্যবতী এবং বিদুর। এই পারিবারিক বিবাদের পাশাখেলার গুটি হল যথাক্রমে ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডু। পাণ্ডু থেকে এক স্বতন্ত্র বংশধারার উৎপত্তি হল যাদের ধমনীতে পাহাড়ের বিদেশি রাজাদের রক্ত। সিংহাসনের উত্তরাধিকারিত্ব নিয়ে এক নয়া মেরুকরণ ঘটল। পাণ্ডবদের পক্ষে কৃষ্ণ যোগ দেওয়ার ফলে এক নতুন গোলমালের উদ্ভব হল। কার্যত তার প্ররোচনায় এবং পরামর্শে পাণ্ডবেরা নাগজাতি অধ্যুষিত খাণ্ডববনে তাদের রাজ্য স্থাপন করতে চাইল। কৌরব-পাণ্ডবের বিবাদের সুযোগ নিয়ে কৃষ্ণ কার্যত তার পুরনো নাগবিদ্বেষের ইন্ধন দিতে খাণ্ডববনে এক অগ্নিগর্ভ গৃহযুদ্ধ সূচনা করল। নাগদের প্রতি কৃষ্ণের পুরনো শত্রুতা থাকার জন্য সে আর অর্জুন মিলে বিদ্রোহাগ্নি নির্বাপিত করার নাম করে নাগ, পক্ষী, শবর, ব্যাধদের নির্মূল করতে লাগল। আমার বিশ্বাস, কৃষ্ণের জন্য পাণ্ডবদের সঙ্গে নাগেদের সম্পর্ক তিক্ত হয়েছে।

শৃঙ্গির বিস্ময়দীপ্ত দুই চোখের তারায় প্রচ্ছন্ন জিজ্ঞাসা। তক্ষকের কথার মধ্যে প্রশ্ন করল, পাণ্ডবেরা নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা বিসর্জন দিয়ে কৃষ্ণের কথায় নাচল কেন? তারা তো নবাগত। তাদের সঙ্গে কারো কোনো শত্রুতা ছিল না। আমাদের স্বার্থের কথা চিন্তা করতে তাদের বাধা ছিল কোথায়?

বাধা কৃষ্ণ। তক্ষকই বিরোধের কেন্দ্রবিন্দু। কৃষ্ণের সব ভয় তাকে। বলতে পার, খাণ্ডববনের দুর্ভোগের কারণ আমি। আজ অনেক মূল্য দিয়ে দুর্ভাগ্যের মূল্য পরিশোধ করতে হবে। আমার দুঃখ এটাই যে, আমার জন্য তোমাদের কষ্টভোগ করতে হচ্ছে। খাণ্ডববনের গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য তক্ষশিলা তোমাদের পাশে থাকবে। আজ আমাদের শপথ নেওয়ার দিন। এই যমুনাকে সাক্ষী রেখে একদিন দাসরাজ সত্যবতীকে বলেছিল, রাজার বৌ হয়ে ভুলে যেয়ো না নিজের মায়ের অপমানের কথা, নিজের কথা, এই গরিব পল্লীর মানুষের দুর্ভাগ্যের কথা। আমি তোমার ভাগ্য নির্মাণ করেছিলাম। এখন কীভাবে তোমার অঙ্গীকার পালন করবে সে তোমার ব্যাপার।

শৃঙ্গির চোখের ওপর চোখ রেখে অভিভূত গলায় বলল, বন্ধু; যমুনার দিকে তাকিয়ে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে উচ্চারণ কর এই নদীবেষ্টিত আমাদের দেশের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির যারা অন্তরায় তারা আমাদের শত্রু। জাতির শত্রু। তাদের ক্ষমা করব না। নিধন করে শাস্তি দেব। এক জন্মে না হলে হাজারবার জন্মগ্রহণ করে শত্রু নির্মূল করব। দেশ ও জাতির মুক্তির জন্য তুমি ও আমি এই যমুনার জল স্পর্শ করে শপথ করছি। আমাদের অঙ্গীকার অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। আমাদের সাধ্য ও শক্তি সীমিত। দুশমনদের মনের অভ্যন্তরে মৃত্যুভয়ের আতঙ্ক সৃষ্টি করে তাদের দুর্বল এবং বিচ্ছিন্ন করে আমাদের অধিকার ছিনিয়ে নেব। এ হল আমাদের স্বাধীনতার লড়াই। শত্রুকে সন্ত্রস্ত করার জন্য অতর্কিত আক্রমণ করে রক্তক্ষয়ী সন্ত্রাস সৃষ্টি করে রাজশক্তিকে বিপন্ন ও অস্থির করা হল স্বাধীনতার যুদ্ধ। আমরা সেই যুদ্ধ করব।

তক্ষকের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে অঙ্গীকার করার সময় শৃঙ্গি টের পেল শরীরের মধ্যে এক অপ্রতিরোধ্য আলোড়ন। তার শরীর থর থর করে কাঁপছিল তীব্র আবেগে। হৃদয় জুড়ে শপথের কথাগুলো দামামার মত বেজে যাচ্ছিল।

শৃঙ্গির আনুগত্যে অভিভূত হল তক্ষক। ঠোঁটের প্রান্তে এক তৃপ্ত প্রশান্ত হাসি ফুটল। বড় ভাল লাগল শৃঙ্গিকে।

ভারতের যে যে প্রান্তে নাগজাতিরা বাস করে তাদের জীবনাচরণে, সামাজিক উৎসবে এবং পূজা পদ্ধতিতে একটা মিল পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন নাগ সম্প্রদায়ের মধ্যে নারায়ণ নামে অনন্তশয্যায় শায়িত যে দেবতার পূজা করে তাঁর মাথায় সহস্রফণাধারী বাসুকি নাগ ছত্র ধরে থাকেন। এর মানে হল, শ্বেতাঙ্গদের সেবা করার জন্য নাগদের জন্ম। শুধু তাই নয় পূজাপদ্ধতির ভেতর দিয়ে তাদের মর্মের মধ্যে গেঁথে দেওয়া হয় দাস মনোভাব এবং শ্বেতাঙ্গদের প্রতি অনুগত থাকার বাধ্যবাধকতা। নাগদের হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে শিবের পরনে, কণ্ঠে এবং জটায় সর্প শোভা পায়। এর মানে শ্বেতাঙ্গদের সর্বতোভাবে সেবা করাই তাদের একমাত্র ধর্ম। শুধু তাই নয়, নিকৃষ্ট প্রাণী সাপের সঙ্গে নাগকুলকে এক ও অভিন্ন করে দেখার ফলে কুলশীলমানে নাগরা ছোট হয়ে .গেছে।

অথচ, নাগেরা শ্বেতাঙ্গদের আগমনের বহুপূর্ব থেকে এক সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাপূণ জাতিহিসেবে সমাদৃত হয়ে আসছিল। তাদের নিকৃষ্ট করে দেখার উদ্দেশ্যেই নাগ সম্প্রদায়ের নাগ উপাসনাকে শ্বেতাঙ্গরা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করত। তাই নাগগোষ্ঠী আত্মস্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে এবং অন্যদের থেকে তাদের আলাদা করে চেনার জন্য, বিশেষ শনাক্তকরণী চিহ্ন-স্বরূপ নাগচিহ্ন ব্যবহার করত। এই চিহ্ন ছিল তাদের মর্যাদার প্রতীক। প্রত্যেকের ধারণ করা ছিল বাধ্যতামূলক।

তক্ষকই সর্বপ্রথম চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল তাদের ভ্রমটা কোথায় এবং কেমন। তাই অনন্তশয্যায় শায়িত নারায়ণ ও বাসুকি এবং অহিভূষণ শিবের মূর্তির দিকে তাকালে যাতে শ্বেতাঙ্গ বিরোধী মনোভাব জেগে ওঠে সেজন্যই পূর্বপুরুষরা এভাবে পূজারীতি চালু করেছিল। তাই পূজোয় কিংবা ধ্যানে মন বসলে শ্বেতাঙ্গদের শত্রুতার কথা মনে পড়ে যায় তাদের। বিজাতীয় ঘৃণা ও বিদ্বেষে তখন তাদের ভেতরটা ছটফট করে উঠে। এক ক্ষমাহীন ক্রোধ, ঘৃণা ও ক্ষোভ তাদের এককাট্টা করল।

যত দিন যেতে লাগল ভারতের সব প্রান্তের নাগ সম্প্রদায়ের চৈতন্যোদয় হতে লাগল। তারা অনুভব করল বুকের সবগুলি স্ফুলিঙ্গের উপর তপ্ত বাতাসের হলকানি। আর তাতেই আগুনটা দপ্ করে জ্বলে ওঠার উপক্রম হল। এই প্রথম সব জায়গার নাগরা বুঝতে সমর্থ হল, বাতাস শুধু ঠাণ্ডা নয়, গরমও নয়, বাতাসে আরো কিছু আছে। তার চলাচলে কারো হাত নেই। নিয়ন্ত্রণ নেই। কাল দিয়েও তার পরিমাপ হয় না। নিজের মর্জিতেই থাকে। সেটা ভালো কী মন্দ, কে জানে? স্বয়ং ঈশ্বরও না।

তবু ঝড় উঠুক — এটা চায় মানুষ ও প্রকৃতি। খাণ্ডববনের সব মানুষ বনবিবির কাছে নিরন্তর প্রার্থনা করল, ওগো দেবী, আর কতকাল ঘুমিয়ে থাকবে? এবার জাগ। নিজেদের বাঁচা-মরা খেলায় তুমি প্রমত্ত হও। যা থাকার শুধু তাই থাক। তোমার নিষ্ঠুর ঝড়ের খেলায় একটুও যেন বাদ না যায়।

তক্ষকই গাছঠাকুরের কাছে তাদের প্রার্থনা-মন্ত্র শেখাল। বলল, গাছ আমাদের জীবন্ত ঠাকুর। শুধু তার কাছেই মনের আবরণ খুলে প্রার্থনা করা যায়। তক্ষকের সঙ্গে গলা মিলিয়ে নাগরাও প্রার্থনার মন্ত্র উচ্চারণ করার মত বলল, ওগো গাছ, তুমিই আমাদের রক্ষক। আমাদের পরম আশ্রয়। আজ বনভূমিতে যে ঝড় উঠেছে, তাতে ডরাই না আমরা। তোমার ঝড়ের দোলায় দুলুক এই বনভূমি। হাসি-কান্নার তরঙ্গ আছড়ে পড়ুক, ভেঙে যাক সব। আমাদের বুকের হাড় গুঁড়িয়ে যাক। এক অসহ্য যন্ত্রণা নিয়েও যেন আমরা আমাদের অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকতে পারি। আমাদের সব দাহ জুড়িয়ে সন্তাপহারী শিব হয়ে দাঁড়াও। তারপর চোখের জল মুছিয়ে কেশব হয়ে যাও। আমাদের আপনজনের মধ্যে জেগে উঠতে দাও।

তক্ষক নিজেও অভিভূত হল। ধর্মের নামে মানুষ যে এমন সম্মোহিত হয় জানা ছিল না। যত দিন যাচ্ছে ততই মনে হতে লাগল, মানুষ তো নেশায় চলে। নেশায় তাকে মাতাতে হয়। নেশার ঘোর যাতে কেটে না যায় সেজন্য বক্তব্যের ওপর, ভাবের ওপর আস্তে আস্তে কথা বসাতে লাগল।

তক্ষক বুঝতে পারল, মানুষের ঘুম ভাঙছে তার চেনা পরিবেশের মধ্যে। একটু একটু করে তারা জাগছে। একজন সাধারণ নাগও বুঝতে পারল খাণ্ডববনকে ইন্দ্রপ্রস্থের অন্তর্ভুক্ত করা ছিল হস্তিনাপুরের মর্জি। এব বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল তক্ষক। সেটা ভাল লাগল না কৃষ্ণের। কৌশলে উপজাতীয়দের ক্ষমতার লড়াই-এর কোন্দলের মধ্যে ঠেলে দিয়ে তক্ষককে অপদস্থ করল। রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে তাকে দেশছাড়া করল। দেরিতে হলেও রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিবল দিয়ে তক্ষক অনুধাবন করল ইন্দ্রপ্রস্থর কাছ থেকে খাণ্ডববাসীদের পাওয়ার কিছু নেই। ধোঁকা দিয়ে যে রাষ্ট্রের উদ্ভব, যে রাষ্ট্র বিবাদ বিভেদের অন্তঃস্রোতে জাতিবৈরিতা ও আত্মবৈরিতাকে প্রশ্রয় দেয় তাদের কাছে সংখ্যালঘুর স্বার্থ সুরক্ষিত নয়। একদিন বঞ্চনাজনিত ক্ষোভ ও বিদ্রোহ নিয়ে গোটা নাগকুলের সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠবে। সেই দিনের দোড়গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে তারা।

সাত

পাণ্ডবদের চতুর্দশ বৎসর বনবাসকালে অনেক ঘটনাই ঘটে গেল। এইসব ঘটনা না ঘটলে হয়তো ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হত। বনবাসে গিয়ে পাণ্ডবেরা কিছু হারায়নি। বরং লাভবান হয়েছিল। নতুন নতুন অস্ত্রলাভের সঙ্গে আত্মীয় এবং বান্ধবও লাভ করেছিল তারা। তাতেই ভারতের রাজনীতিতে তাদের গুরুত্ব ও মর্যাদা অন্য এক মাত্রা পেল। রাজনৈতিক অসহায়তা দূর হল। কেউ তাদের অবহেলা কিংবা করুণা করবে তাও নয় তারা। বৃহৎ রাজশক্তির মেরুকরণে তারা হল কেন্দ্রবিন্দু। তাই বনবাস থেকে ফিরে এসে ইন্দ্রপ্রস্থর উপর তাদের রাজনৈতিক অধিকার পুনর্বার দাবি করল। কিন্তু অধিকার একবার হাতছাড়া হলে তা ফিরে পাওয়া কঠিন জেনেই পাঁচ ভাইয়ের জন্য পাঁচখানি গ্রাম দাবি করল। কিন্তু হস্তিনাপুর পাণ্ডুপুত্রদের ইন্দ্রপ্রস্থ অর্পণ করে যে ভুল করেছিল পাঁচখানি গ্রাম অর্পণ করে সে ভুল করল না এবার। তথাপি, পাণ্ডবেরা হীনবল হল না। বন্ধু-রাষ্ট্রগুলি তাদের পাশে দাঁড়াল। অমনি ভারতের রাজনীতির রূপরেখা বদলে গেল। কৌরব ও পাণ্ডবদের পারিবারিক বিবাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল মহাযুদ্ধের উত্তাপ। সেই তাপবলয় থেকে ভারতের রাজন্যবর্গের বেরিয়ে আসা সম্ভব হল না। দুই পরিবারের গৃহযুদ্ধ ভারতব্যাপী এক মহাযুদ্ধের মূর্তি ধরল। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে ভারতের সমগ্র রাজন্যবর্গকে দেখা গেল। তক্ষক এই যুদ্ধ থেকে নাগকুলকে দূরে রাখল। তার ছায়া পর্যন্ত গায়ে লাগতে দিল না। কারণ ভাইয়ে ভাইয়ের এ যুদ্ধে ভারতবর্ষ শ্মশান হয়ে যাবে। তখন নাগকুলই এদেশ শাসন করবে।

তক্ষকের ধারণাই সত্য হল। আঠারো দিনের এক অসম কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে পঞ্চপাণ্ডব এবং তাদের সহধর্মিণীরা ছাড়া কৌরব এবং পাণ্ডবকুলে কেউ অবশিষ্ট রইল না। বিদুর, কৃষ্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, সঞ্জয় এরকম কয়েকজন হাতে গোনা মানুষ ছাড়া

সবাই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হল। যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য পাণ্ডবরা করল না এমন হীন কাজ নেই। যুদ্ধের শেষ দিনে কোনো নিয়মকানুন ছিল না। এক রক্তক্ষয়ী আত্মহননে সবাই মেতে উঠল। স্বজাতির শ্মশানভূমির উপর যুধিষ্ঠিরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল।

কিন্তু সে রাজ্যে পুরুষমানুষ নেই। শোকসন্তপ্ত পরিবারের নারী-শিশুর হৃদয়-বিদীর্ণ কান্না, বুকভাঙা হাহাকার, বিষণ্ণ করুণ দীর্ঘশ্বাস, পাহাড়, বন জঙ্গল প্রান্ত ভেদ করে আঁ-আঁ করে ছুটে গেল চৌদিকে। প্রতিদিনের মত ঝিরঝিরে হাওয়ায় ঝাউবন দুলছে, শরবন কাঁপছে। নদীর জলরাশিও উদ্বেল কান্নায় তীরে আছড়ে পড়ে মাথা ঠুকছে। কেবল বাতাস হায় হায় করতে করতে শূন্য প্রান্তর ধরে পাগলিনীর মত দৌড়তে লাগল।

এই অভিশপ্ত রাজ্যের অধীশ্বর যুধিষ্ঠির। রাজ্যে কোথাও শান্তি নেই। রাজা নিজেও অশান্তির মধ্যে আছেন। রাজ্যে কেউ স্বস্তিতে নেই। যুধিষ্ঠির নিজেও হতাশায় ম্রিয়মান। থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাস পড়ে আর ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। পরিতাপ করে কৃষ্ণকে বলে, তুমি তো জান, আত্মীয়, ভ্রাতা, পুত্র সকলকে নিহত করে তাদের রুধিরলিপ্ত সিংহাসনে বসার আদৌ কোনো ইচ্ছে আমার নেই। আমায় তুমি ক্ষমা কর।

কৃষ্ণের অধরে বিষণ্ণ হাসিতে এক ধরনের কাঠিন্য ফুটে উঠল। বলল, মহারাজ পরিবারের শ্রীবৃদ্ধির জন্য বংশধারা রক্ষার জন্য জননী দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করে। কত ত্যাগ স্বীকার করে ভ্রূণকে জঠরে লালন করেন। তারপর অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করে শিশুকে জন্ম দেন। তার আবির্ভাবে দ্যুলোক সুখী হয়। জন্মকালে শিশুর কলেবর থাকে শোণিতসিক্ত তেমনি ধরণীর রক্তে সিক্ত হয়ে নতুন রাজ্য জন্ম নেয়। তাইতো অভিষেকের সময় রাজার ললাটে রক্ততিলক এঁকে দেওয়া রীতি।

কৃষ্ণের বাক্যে যুধিষ্ঠিরের মনের ভার কিছুমাত্র হাল্কা হল না। বিষাদের মধ্যেই কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের ললাটে রক্ততিলক এঁকে দিয়ে সমগ্র ভারতের অধীশ্বর বলে ঘোষণা করলেন।

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের পর এক সর্বব্যাপী শূন্যতা সৃষ্টি হল। দেশকে দেশ পুরুষশূন্য হয়ে গেল। নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা ছাড়া কোনো জোয়ান পুরুষ বেঁচে ছিল না। রাজ্যে রাজ্যে প্রজাকুলকে সৈনিক হতে বাধ্য করা হয়েছিল। ফলে, দেশ শ্রমিক ও মজুরশূন্য হয়ে গেল। চাষ-আবাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হওয়ার উপক্রম হল। পণ্যোৎপাদনের লোক নেই, বংশধারা রক্ষার মানুষ নেই। পুরুষশূন্যতায় ধুঁকছিল গোটা দেশ। সর্বত্র হতাশা, অবসন্নতা, জড়তা, শৈথিল্য, গোটা দেশ ও সমাজকে স্তব্ধ করে দিল। জীবনযাত্রা অচল হয়ে পড়ল। শোকাহত পরিবার, পরিজনদের মানসিক অসহায়তা কাটিয়ে উঠতে বেশ বিলম্ব হল। ঘরে ঘরে অন্নের হাহাকার, বস্ত্রের হাহাকার। সামাজিক বিপন্নতা, অর্থনৈতিক দুর্দশা, বিপুল কর্মহীনতার দুর্বিবহ অবস্থার মধ্যে গোটা সমাজজীবনকে টেনে আনল। এরকম এক দুঃসময়ের সুযোগ নিয়ে মানবিক কারণে রাজনীতি করা উচিত নয় মনে করল তক্ষক। সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ, দুর্দশা বাড়িয়ে, দেশের রাজাকে জব্দ কিংবা

বিপন্ন করে নতিস্বীকারে তাকে বাধ্য করাই হল বিরোধীদের রাজনৈতিক বল। তবু তক্ষক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে যুধিষ্ঠিরকে বিপাকে ফেলল না। নাগরা যে সাপের মত খল স্বভাবের নীচ প্রাণী নয় এটা বোঝাতেই তক্ষক সংযত থাকল। কিন্তু হাত-পা গুটিয়ে থাকল না, একটা বড় লড়াইয়ের জন্য নাগকুলকে সংগঠিত করতে লাগল। বিপুল আত্মত্যাগের জন্য তাদের প্রস্তুত করছিল। কিন্তু বাইরে থেকে তার কর্মতৎপরতার আঁচ কেউ টের পেল না। এক বজ্রকঠিন সংযমের মধ্যে ছত্রিশ বছর কেটে গেল।

এতগুলো বছরের ভেতর হস্তিনাপুরের সামাজিক জীবনযাত্রা, অর্থনৈতিক অবস্থা, মানুষের দুরবস্থা এবং দুর্দশার কোনো উন্নতি হল না। রাজনীতিরও সেই একই হাল। কোথাও কোনো পরিবর্তন নেই। রাজকার্যে যুধিষ্ঠিরের মন নেই। অন্য পাণ্ডবদেরও মন ভাল নেই। বার্ধক্যে তারা অবসন্ন। তাই বাণপ্রস্থ নয়, একেবারে মহাপ্রস্থানের পথে পঞ্চপাণ্ডব যাত্রা করল। অর্জুনের প্রপৌত্র পরীক্ষিৎকে রাজপদে অভিষেক করে সমস্ত রাজ্যভার অর্পণ করে পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীর সমভিব্যাহারে হস্তিনাপুর ত্যাগ করে চলে গেল। মহাপৃথিবীর দিকে যে পথ চলে গেছে সেই পথে গেল।

পরীক্ষিতের সম্রাট হওয়ার সময় খাণ্ডববনের নাগরা খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা নাগকুলের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তারা সংগঠনকে জোরদার করেছিল। তাদের সংগঠিত আক্রমণের সম্মুখে যে পাণ্ডবেরা খড়কুটোর মত উড়ে যাবে রাজা হয়ে পরীক্ষিৎ তা জানতে পারল। খাণ্ডববন সম্পর্কে বিভিন্ন খোঁজখবর করে জানল যে এই বনাঞ্চল জুড়ে হাজার বছর ধরে আদিম উপজাতি এবং নাগজাতিদের গড়ে ওঠা সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় কৃষ্টি ছড়িয়ে আছে এর মাটির প্রতি ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে। এর বনাঞ্চলের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে পাণ্ডবসখা কৃষ্ণ এখানে ইন্দ্রপ্রস্থ স্থাপনের স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু সে স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়ে অনেক অনিষ্ট করেছেন এখানকার মানুষদের। নগরপত্তনের দিন থেকে পাণ্ডবদের প্রতি সীমাহীন বিদ্বেষ তাদের প্রতিহিংসাপরায়ণ করেছিল। বড় কোনো প্রত্যাঘাত না করলেও রাজ্যের অভ্যন্তরে উপদ্রব এবং অশান্তি লেগেছিল। কারণ, ইন্দ্রপ্রস্থ থেকেই তাদের দুর্দিনের সূচনা। খাণ্ডববনের ওপর স্বৈরাচারী শাসনের আধিপত্যের হাত যত বড় হয়েছিল বনাঞ্চল জুড়ে ততই তাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার চলল। নির্মম নির্যাতনের সেই দুঃখের দিনগুলি নাগজাতি এবং উপজাতিরা ভুলতে পারেনি। তাদের মন থেকে মুছে যায়নি কৌরবদের খাল কেটে কুমির ঢোকানোর স্মৃতি। খাণ্ডবপ্রস্থের যে বিস্তৃত অংশ কৃষ্ণ-অর্জুনের হাতে শ্মশান হয়েছিল তার ওপর গড়ে উঠেছিল ইন্দ্রপ্রস্থ। যা ছিল খাণ্ডববাসীদের চোখে পাণ্ডবদের বর্বরতা ও অত্যাচারের সৌধ। যতদিন ওই প্রাসাদ তাদের চোখের সামনে জ্বলজ্বল করবে ততদিন পাণ্ডবদের অবর্ণনীয় অত্যাচার, অপমান এবং লাঞ্ছনার কথা ভুলবে না তারা। খাণ্ডববন অধিবাসীদের সব রাগ কৃষ্ণ ও অর্জুনের ওপর। এঁদের কেউ এখন বেঁচে নেই। তবু যে কোনো মুহূর্তে পুঞ্জীভূত আক্রোশের শিকার হতে পারে তারা। তাই নাগদের সম্পর্কে পরীক্ষিৎ ভীষণ সতর্ক থাকল। সংঘাত পরিহার করে যুদ্ধ এড়িয়ে চলার কৌশল নিল।

সম্রাট হওয়ার পরে পরীক্ষিৎ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সরেজমিন করতে মাঝে মাঝেই একা বেড়িয়ে পড়ত। রাজ্যের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং জনমনের গোপন অসন্তোষের গতিপ্রকৃতি নির্ণয়ের জন্য গুপ্তচরের সংখ্যা দ্বিগুণ করা হল। কার্যত, গুপ্তচর সংস্থার প্রধান বন্ধুবর মৃত্যুঞ্জয় দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যা পর্যালোচনা করে পরীক্ষিতের কাছে পাঠাত। সম্প্রতি সমস্যার রূপ বদলেছে, সংকট আরো জটিল হয়েছে। তবু সংবাদ দাতাদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে যা জানত, নিজের মত করে তা পরীক্ষিৎকে পরিবেশন করত। মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলত : ঘটনা যাই হোক, শক্ত হাতে মোকাবিলা করতে হবে। তোমার পূর্বপুরুষদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নিয়ে বলছি, সমস্যাটা ওঁদের মত হাল্কা করে দেখার দিন নেই। জমানা যে বদলেছে সেটা তো হাতেকলমে কাজ করে দেখাতে হবে। চুপ করে থাকা মানে প্রশ্রয় দেওয়া। ছত্রিশ বছর ধরে সবকিছু বাড়-বাড়ন্ত হয়েছে। আর বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়। ছত্রিশ বছরই হোক লক্ষ্মণরেখা।

পরীক্ষিৎ ধৈর্য ধরে শুনল। দুরন্ত অস্থিরতা নিয়ে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। বলল, তোমার কথা শুনলে আমার অসহিষ্ণুতা বাড়ে। তারপরেই রাগটাকে সংবরণ করে নিয়ে বলল, তুমি নতুন কিছু বলনি। ওদের অবস্থায় থাকলে আমিও তাই করতাম। দুঃখের কথা ইন্দ্রপ্রস্থের নয়া বাসিন্দাদের সঙ্গে খাণ্ডববনের আদি বাসিন্দারা পাশাপাশি বাস করেও এক জাতি, এক প্রাণ, এক দেশের মানুষ না হতে পারার দোষ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের। তবু যুধিষ্ঠিরের রাজনৈতিক ছত্রচ্ছায়ায় যে ইতিহাস সৃষ্টি হতে পারত, অথচ হল না, সে দোষ কার, এ তর্কে না যাওয়া ভাল। ওসব করে কাদা ছিটানো যাবে কিন্তু সমস্যার সুরাহা হবে না। ইন্দ্রপ্রস্থের জন্মলগ্নে নিশ্চয়ই রাহুর দৃষ্টি পড়েছিল। তাই স্থানীয় মানুষের ক্রোধ, ঘৃণা, বিদ্বেষের উত্তপ্ত জমিতে পাণ্ডবদের যে সৌধ গড়ে উঠল তা আগাগোড়াই ছিল অভিশপ্ত। তাই একদিনের জন্যও শান্তি পায়নি তারা। আবার স্থিতু হয়েও বসতে পারল না। ধর্মপ্রাণ হওয়া সত্ত্বেও তাদের কপালে দুর্ভোগ জুটল। মানুষের ভাল চেয়েও তাদের কাছের মানুষ হল না। তাদের অর্ধশতাব্দী রাজত্বকাল পারেনি স্থানীয় মানুষের ক্ষত নিরাময় করতে। এরপরে বিচ্ছিন্নতাকামী, ঈর্ষাকাতর, বিশ্বাসহন্তাদের নিয়ে যদি কোনো গোষ্ঠীর উদ্ভব হয় তাহলে সে দোষ কার? একবারও আমরা সে প্রশ্ন করি না! নিরপেক্ষ মন নিয়ে এসব মানুষের হৃদয়ের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে যে কথা তুমি জান তা আমার কাছে গোপন করলে অথচ আমার বন্ধু তুমি। তবু নিজেকে একজন রাজকর্মচারী মনে কর কেন?

অপরাধীর মত মাথা হেঁট করে রইল মৃত্যুঞ্জয়। পরীক্ষিতের মনে হল, অপরাধ রাখার জায়গা নেই তার। আস্তে আস্তে নিজের মনের কথা বলল, অপরাধ নিও না। মানুষ তো ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয়। পাঞ্চালরাজ যজ্ঞসেন বন্ধুবর আচার্য দ্রোণকে বলেছিলেন, বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে। পাঞ্চালরাজের সে কথাটা ভুলি কেমন করে? চেষ্টা করেও সংকোচের সীমারেখা ভুলতে পারি না।

পরীক্ষিৎ প্রীত হয়ে বলল, এ হল, আমাদের দুই বন্ধুর একান্ত নিজস্ব আলোচনা। একেবারে সাধারণ নাগরিকের সমতলে নেমে এসে তাদের মনের কথা বল। তোমার কী একবারও মনে হয় না এই দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষবৃক্ষটি রোপণ করেছে নাগবিদ্বেষী কৃষ্ণ। ইন্দ্রতোষণের পথ ধরে কার্যত নাগ অধ্যুষিত খাণ্ডবপ্রস্থর সঙ্গে পাণ্ডবদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল। রাজকীয় গৌরব ও মর্যাদা পাওয়ার স্বার্থে কৃষ্ণ তাদের ইন্ধন যুগিয়েছিল। তোমার কী মনে হয়?

মৃত্যুঞ্জয় কয়েকটা মুহূর্ত চিত্রবৎ দাঁড়িয়ে রইল। পরীক্ষিৎকে সে বুঝতে চেষ্টা করল। তারপর কয়েকবার ঢোক গিলে বলল, আমার গোয়েন্দাগিরিতে এরকম কোনো কষ্ট-কল্পনা নেই। কৃষ্ণের বন্ধুত্বকে সন্দেহ করার মত কোনো প্রমাণ আমার জানা নেই।

পরীক্ষিতের কণ্ঠস্বরে যুগপৎ উষ্মা ও অসন্তোষ প্রকাশ পেল। বলল, বিনা স্বার্থে কেউ কারো রাজনৈতিক আশ্রয়দাতা হয়? আমি তো মনে করতে পারি দীন-দরিদ্র, অসহায় পাণ্ডবদের দুঃসময়ের বন্ধু হয়ে কৃষ্ণ নিজের একটি স্বচ্ছ ভাবমূর্তি গড়ে তোলার জন্য জীবনভোর কৃষ্ণের কথা শুনেছে, তাঁকে মেনে চলেছে। কৃষ্ণপ্রাণ হয়ে কৃষ্ণের কাছে সর্বস্ব সমর্পণ করেছে। অথচ, এত বড় যে একটা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হল তার জন্য কৃষ্ণকে প্রকাশ্যে বিলাপ করতে কিংবা অনুশোচনায় কাতর হতে কেউ দেখেনি। ভুলেও একটু অশ্রুবর্ষণ করেনি। ভাবতে বিস্ময় লাগে এত বড় মহাপ্রাণ এত নিষ্ঠুর হল কেমন করে, এ প্রশ্নের উত্তর পাই না।

মৃত্যুঞ্জয়ের খুব অবাক লাগে। পরীক্ষিৎকে ঠিক বুঝতে পারে না। চিরচেনা পরীক্ষিৎকে তার অচেনা লাগল। চলন তার বাঁকা পথে। তবে কি বন্ধুর মনে তার প্রতি কোনো অবিশ্বাস জাগল, মনেতে সন্দেহ প্রবল হল? কি জানি? খাণ্ডবপ্রস্থের নাগকুল এবং অন্য গোষ্ঠীর মানুষের প্রতি হঠাৎ তার মানবিক দরদ, মমতা, সহানুভূতি, সমবেদনা উথলে উঠল কেন? কি কারণে পাণ্ডবসখা কৃষ্ণকে দোষী সাব্যস্ত করে মানুষের বিবেকের আদালতে আসামি সাজিয়ে তাঁকে সওয়াল করতে চাইল কেন? তাদের কথা ভেবে কৃষ্ণকে ছোট করা হল? কী লাভ তাতে? পরীক্ষিতের কথাগুলো স্পষ্ট নয়, আবার মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেওয়ারও নয়। নিশ্চয়ই কোথাও একটা সত্য লুকোনো আছে। তবু নিজেকে সংযত করল মৃত্যুঞ্জয়।

পরীক্ষিতের কথার সূত্র ধরেই তার ভাবপ্রবণ মনের অন্ধকার ঘরে ঘরে দীপ জ্বলে উঠল। বন্ধুর অনুমানে কোনো ভুল ছিল না। কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে পাণ্ডবেরা হারাল খাণ্ডবপ্রস্থের মানুষের আস্থা, বন্ধুত্ব এবং আনুগত্য। জোর করে তাদের পাণ্ডবদের শাসনাধীনে রাখার জন্য যত রেষারেষি। সব সর্বনাশের বীজ এর মধ্যে নিহিত। কৃষ্ণের মত মহাপ্রাজ্ঞ রাজনীতিক সেটা জানতেন বলেই পরীক্ষিতের বিশ্বাস। কতকগুলি ঘটনাসূত্রে পরীক্ষিতের এ বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে। কৃষ্ণের কার্যের বড় সমর্থক এবং সব সময়ের বন্ধু অগ্রজ বলরামের সঙ্গে খাণ্ডবপ্রস্থে প্রাণী নিধনযজ্ঞের ঘটনা নিয়ে মতান্তর ও মনান্তর হলে বলরাম কৃষ্ণের দিক থেকে নিঃশব্দ সরে গেল। লোকে টের পেল

না দুভাইয়ের সম্পর্কের দূরত্বকে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় সেই অভাবটা প্রথম নজর কাড়ল। পাছে কৃষ্ণের ভাবমূর্তি নষ্ট হয় তাই সমগ্র যাদবকুলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে সাগরকুলের বাসিন্দা নাগদের সঙ্গে মিশে গেল। বাকি জীবনটা নাগকুলের সঙ্গেই কাটালেন। সরল, সাদাসিধে, স্পষ্ট বক্তা বলরাম কৃষ্ণের খাণ্ডবপ্রস্থের অমানবিক হত্যাকাণ্ড সমর্থন করতে পারল না। তাই প্রিয় ভাইয়ের কাছ থেকে চিরতরে সরে গেল। এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডই ইন্দ্রপ্রস্থের সঙ্গে খাণ্ডবপ্রস্থের সুসম্পর্কের পথে অন্তরায় হল। এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণার্জুনের বিদ্রোহীদের খতম অভিযান নামে নিরীহ মানুষদের হত্যা করা, তক্ষককে রাজ্যচ্যুত করা বিখ্যাত ময়দানবকে বন্দী করার ঘটনা সন্দেহাতীতভাবে পরীক্ষিতের আশঙ্কাকে সত্য করে তুলল। দ্বিজাতিতত্ত্বের বিষবৃক্ষের চারাগাছটি কৃষ্ণ নিজের হাতে লালনপালন করে এক জীবনেই তাকে মহীরুহে পরিণত করল। কিন্তু পরীক্ষিতের এই বোধোদয় যদি তার হত, তাহলে অকপটে তা ব্যক্ত করা তার মত একজন অধস্তন কর্মচারীর মুখে কখনো শোভা পেত না। কোন সাহসে সে বলবে? তাই বন্ধুর আকস্মিক ভাবাবেগের প্রত্যুত্তরে জবাব দেওয়ার মত কথা খুঁজে পেল না। ফ্যালফ্যাল করে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। খুব সাবধানে সাভিমানে মৃত্যুঞ্জয় বলল, বন্ধু, তোমার বুকের খুব কাছে দাঁড়িয়ে এ কোন অজ্ঞাতলোকের কাহিনী শুনলাম। একে ইন্ধন দেওয়া কোনো তথ্য আমার জানা নেই। তবে হতাশা এবং অসহায়তা থেকে তীব্র অভিমানে এরকম কিছু চিন্তায় মন ভারাক্রান্ত হতেই পারে। বহুকাল আগের ভুলে যাওয়া ঘটনার মদির গন্ধের মধ্যে সমস্ত অনুভূতি মনের আবরণ খুলে চিনতে শেখায়। সেটা কোনো মানুষেরই আগে থাকতে জানা থাকে না। মানুষের জীবনে এমনটা ঘটছে রোজই।

পরীক্ষিতের মাংসল মুখখানা হাসিতে দীপ্ত হল। বলল, কী জানি? তোমার কথাই হয়তো ঠিক। মানুষ মাত্রেই কিছু কিছু ব্যক্তিগত ব্যাপার থাকেই। বেঁচে থাকার অনেক কিছু সযত্নে গোপন রাখে সেখানে। তবু কে যেন ভিতর থেকে তাকে তাড়া লাগিয়ে বের করে এনে অপদস্থ করে দেয় সবার সামনে। কথাগুলো বলার সময় শান্ত মন খারাপ করা আর্তি তার মুখেচোখে লেগে রইল।

মৃত্যুঞ্জয় প্রবোধ দিয়ে বলল, জীবনের আসল মানেটা কিন্তু হওয়া ছিল মুক্তি। তাই অনেক কিছুই ভেবেচিন্তে করা হয় না। আবার অনেক কিছুই আছে যা অন্যের অনুভূতিতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিজেকে নিঃশেষে নিংড়ে দিতে হয়। তুমিও তেমনি একটি জটিল সমস্যার সমাধানের কথা গভীর করে ভাবছ এটা কিন্তু আমার কাছে পরিষ্কার। কেবল মনের ভাবটাই ভীষণভাবে গোলমাল করে ফেলেছে।

পরীক্ষিৎ হাসল। আশ্চর্য এক কৌতুকে মাখামাখি হয়ে ঠোঁটের কোণে লেগে রইল।

ঘরে মন বসে না পরীক্ষিতের। ঘরে থাকলেই অদ্ভুত অদ্ভুত ভাবনা হয়। ভাবনাগুলো পোকার মত থিকথিক করে। একটা অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। মনটা হাঁফিয়ে ওঠে। মুক্তির

জন্য আকুল হয়ে ওঠে ভেতরটা। তখন একটু শিকারে গেলে মন চাঙা হয়। মাদ্রবতীই তাকে শিকারে যাওয়ার জন্য এবার চাপাচাপি করল। পরীক্ষিৎ তো মনে মনে প্রস্তুতই ছিল। মাদ্রবতীকে বলতেই রাজি হয়ে গেল। কিন্তু বালকপুত্র জনমেনজয়কে শিকারে সঙ্গী করার জন্য জেদ ধরল পরীক্ষিৎ। এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর খণ্ড বাকযুদ্ধ হয়ে গেল। স্বামীর কোনো কথাই মাদ্রবতী শুনল না। বলল : অতটুকু দুধের শিশুকে কেউ শিকারে নিয়ে যায়? ও তোমায় কী করতে পারে? ছুটোছুটি করে যে একটা প্রজাপতি পর্যন্ত ধরতে পারে না, সে করবে শিকার? পাগল হলে তুমি? দুধের বাচ্চাকে শিকার শেখানোর কথা কেউ ভাবে?

ভাবে বৈকি?

টেপা হাসি নিয়ে মাদ্রবতী পরীক্ষিতের গালটা টিপে দিয়ে আদর করল। বলল, শিকারের পেছনে ছুটবে, না ছেলের ওপর নজর রাখবে? খেপে গিয়ে শিকার যদি ঘুরে দাঁড়ায় হঠাৎ তখন কে কাকে রক্ষা করবে — নিজেকে, না ছেলেকে? বিপদের কথা কিছু বলা যায় না। তার চেয়ে আগে থেকে সাবধান হওয়া ভাল। বুঝলে।

সহসা জবাব দেবার মত কথা খুঁজে পেল না পরীক্ষিৎ। তবু জেদ বজায় রাখতে বলল, আমি তো একা নই। সঙ্গে থাকছে রক্ষী, প্রহরী, সৈন্য-সামন্ত, দাস-দাসী। সুতরাং ভয় পাওয়ার কিছু নেই তোমার। কার্যত ওরাই ওর দেখভাল করবে।

মাদ্রবতী বলল, ওদের কাছেই যদি থাকে তাহলে শিকারে যাওয়ার মজা কী তার? মিছি-মিছি ওকে কষ্ট দেওয়া।

কষ্ট কিসের? শিকারে গেলে মানুষ সাহসী হয়, চলাফেরায় ক্ষিপ্র হয়। নিরীহ পশুহত্যা করে বিনোদন করা শিকারের উদ্দেশ্য নয়। আত্মরক্ষার কৌশল শিকার থেকে শেখে। বিপদের মুখোমুখি হলে কী করে তা থেকে বেরিয়ে আসতে হয় তা শিকারের কাছ থেকেই পাওয়া যায়। বনে-জঙ্গলে কতরকম বিপদ ওৎ পেতে আছে কত ধরনের ভয়, বাধা লুকোনো আছে, শিকারের সময় তার ওপর সতর্ক নজর রেখে এগোতে হয়। প্রতিটি ইন্দ্রিয় তখন সজাগ। সব দৃষ্টি তার লক্ষ্যের ওপর। এমন একাগ্রতা হলেই তবে শিকারে এবং যুদ্ধে সাফল্য লাভ করা যায়। শিকার হল যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার হাতেখড়ি। তাই বাল্য থেকে রাজপুত্রদের শিকারে যাওয়া অভ্যাস করা হয়।

চোখ দুটি বিস্ফারিত করে মাদ্রবতী গালে হাত দিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, রক্ষে কর। বাছার আমার শিকারে গিয়ে কাজ নেই। শিকার করা তো আর ফুরিয়ে যাচ্ছে না। সারা জীবন পড়ে আছে। একটু বড় হোক, তারপর তাকে সাধ মিটিয়ে রাজার মত তৈরি কর। তখন আমি কিছু বলতে আসব না।

পরীক্ষিত নাছোড়বান্দা হয়ে বলল : মাদ্রবতী ছোট থেকেই শিখতে হয় সব। জীবনে যুদ্ধটাই সব। প্রতিক্ষণ আমরা বাঁচার জন্য সংগ্রাম করছি। বনবাসীদের ছেলেমেয়েরা একেবারে শিশুবেলা থেকে বন্যজন্তুর সঙ্গে লড়াইর কৌশল শেখে। বনে না গেলে সাহস বাড়ে না। শুনেছি, পিতামহ অর্জুন পিতা অভিমন্যুকে শিশুকাল থেকে নানা

যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গী করেছেন। বাল্যকালেই মহারথীদের সঙ্গে কীভাবে লড়তে হয় তার নকল মহড়াও দিয়েছেন। জনমেনজয় তো সেই বংশের ছেলে।

উত্তরটা মাদ্রবতীর মুখেই লেগেছিল। বলল, পিতামহ তাঁর নাতিকে সর্বক্ষণ আগলে বেড়িয়েছেন। আর ওর তো ভাল করে অস্ত্র ধরার বয়সই হয়নি। তাছাড়া সবার তো সব কিছু হয় না। সমকক্ষও যে হবে এমন কোনো কথা নেই।

কথাটা পরীক্ষিতের মনঃপূত হল না। বলল, পুত্রকে তৈরি করার দায়িত্ব বাবা-মা'র। নিজেদের ভাবনায় তারা তাকে গড়ে তোলে। সেক্ষেত্রে চেষ্টা এবং উদ্যোগটা বড়। বাকিটা সন্তানের নিজের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু তুমি যদি আঁচলের তলায় রেখে দাও তাকে তাহলে কোনোদিন বালকত্ব ঘুচবে না জনমেনজয়কে ওর দাদুর বিকল্প করতে চাই। দোহাই, বাধা দিও না তুমি। শিকারে গিয়ে যে যুদ্ধের হাতেখড়ি হয় তা তুমি জান? শিকারের উন্মাদনার মধ্যে যুদ্ধের স্বাদ লুকনো। শিকারকে নিশানা করে, লক্ষ্য অব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে গাছ-গাছালির অবরোধ ভেঙে শিকারি কী করে আক্রমণ করবে, কোন পথে গেলে পলায়নপর শিকারের আত্মরক্ষার সব চেষ্টা ব্যর্থ করে কত সহজ উপায়ে তাকে বধ করতে পারবে; তার কৌশল শিকারিকে একা স্থির করতে হয়। এজন্য যুগপৎ সাহস, উপস্থিত বুদ্ধি এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা চাই। শিকার করা হল একটা নকল যুদ্ধ। শিকারের বিনোদন থেকেই যুদ্ধবিদ্যাটা আয়ত্ত করে। তাই শিকার করা প্রাণীহত্যার বর্বর অনুষ্ঠান নয়, বীরত্বে উদ্বুদ্ধ করার জন্য শিকারে উৎসাহিত করা হয়।

তবু মাদ্রবতী তার মত বদলাল না। বলল, আমি তো শিকারে যেতে নিষেধ করছি না। বয়স হলেই নিজের হাতে ওকে সাজিয়ে দেব। মায়ের মন যখন চাইছে না, তখন জোর কর না। একটা অনর্থ হলে তুমিও আপসোস করবে। নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে না। এর পরেও যদি জোর কর তাহলে আমার মৃতদেহের ওপর দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যেতে হবে ওকে।

অগত্যা মাদ্রবতীর জেদের কাছে হার মানতে হল পরীক্ষিৎকে। পরাভবের এই বেদনা বুকে গেঁথে রইল তার। পরীক্ষিতের আশাহত হওয়ার মলিন মুখখানি মাদ্রবতীকেও বিষণ্ণ করল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, রাগ করলে?

না।

তাহলে এত গম্ভীর হয়ে থাকার কী হল? একটা ছোট্ট ঘটনাকে হার-জিতের লড়াইয়ের মধ্যে টেনে নিজেও মন খারাপ করছ, আমাকেও কষ্ট দিচ্ছ।

পরীক্ষিৎ নিরুত্তর। মাদ্রবতী ঘুরে ঘুরে তাকে নিরীক্ষণ করল। তারপর কয়েকটা মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল : মনে হচ্ছে, কোথায় একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে। তাই বোধ হয় তোমার ভেতরটা এত অস্থির, অশান্ত। কী হয়েছে গো? খারাপ সংবাদ নেই তো?

পরীক্ষিৎ নিস্পৃহভাবে বলল, আমার মন ভালো নেই। একটু একা থাকতে দাও।

অশুভ আশঙ্কায় মাদ্রবতীর ভেতরটা শিহরিত হল। বলল, কী হয়েছে বলবে তো? ভালমন্দের দ্বন্দ্বে আমার বুক কাঁপছে।

পরীক্ষিতের দু'চোখে অবিশ্বাস। কিন্তু সারা মুখে একটা ভয়ের ভাব মাখামাখি। ফিসফিস করে বলল, মাদ্রবতী, বেশ কিছুদিন ধরে একটা অঘটন ঘটার আশঙ্কায় আমার মন ব্যাকুল। তাই পুত্রকে নিয়ে কটা দিন বাইরে কাটাব ভেবেছিলাম, কিন্তু তুমি তা হতে দিলে না।

মাদ্রবতী একবুক উৎকণ্ঠা নিয়ে বলল, তোমার কথা শুনে ভয় করছে।

ভয় পাওয়ারই কথা। শিকার যাত্রা যে দিন স্থির হল সেদিন রাতে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। একটা ষাঁড় আমার রাস্তা আগলে দাঁড়িয়ে আছে। তার তিনটি পা ভাঙা। তার পাশে একটি গরু দাঁড়িয়ে। দু'চোখের চাহনি তার করুণ এবং ছলছলে। মনে হল, তাদের সংসারে বিপর্যয় ঘটে গেছে। প্রতিকার পাওয়ার আশায় আমার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। ভাল করে নিরীক্ষণ করতে গিয়ে দেখলাম গরুটির পায়ের কাছে সদ্যোজাত বাছুরটি প্রাণহীন হয়ে পড়ে আছে। সেজন্যে বোধ হয়, গাভীর চোখের কোণ বেয়ে জলের ধারা গড়াচ্ছে। দেখে আমারও করুণা হল। রথ থামালাম। কিন্তু ওদের জন্য কী বা করতে পারি? কর্তব্যবোধে পীড়িত হতে লাগলাম। এমন সময় দেখি কোথা থেকে একজন লোক এসে দাঁড়াল তাদের সামনে। লোকটির ভাব-সাব, আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ সব রাজার মত। বলা নেই কওয়া নেই লোকটি প্রতিবন্ধী ষাঁড়টি এবং তার একমাত্র শোকার্ত সঙ্গিনীকে লাঠি দিয়ে পীড়ন করতে লাগল। মূক প্রাণীদ্বয় তার নিষ্ঠুর প্রহারেও নড়ল না। বোধ হয় চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল তারা। অসহায়ের মত মার খেতে খেতে সে স্থানে প্রস্রাব করল। তবু করুণা হল না লোকটার। এই দৃশ্য দর্শনের সময় স্বভাবত আমি ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ি। রথ থেকে নেমে লোকটির প্রহারোদ্যত লাঠিটি ধরে বলি : তুমি কেমন মানুষ? তোমার প্রাণে কি দয়ামায়া নেই? আমার রাজ্যে, আমার সামনে একটি মূক অসহায় প্রাণীর গায়ে হাত তোলার তোমার সাহস ও স্পর্ধা দেখে বিস্মিত হচ্ছি। তোমায় দেখতে তো রাজার মতন, অথচ যে কাজটি করছ তা রাজার মতন নয়। চণ্ডালের পোশাকেই তা মানায়। নিজেকে তুমি কি ভাব? আমি হলাম গাণ্ডীবধারী অর্জুনের প্রপৌত্র মহারাজ পরীক্ষিৎ। কৃষ্ণ ও অর্জুন ধরাধামে বেঁচে নেই বলে কী ধর্মাধর্ম নেই? যা ইচ্ছে তাই করবে? অসহায় মূক প্রাণীর ওপর যদৃচ্ছা আচরণ করবে? তোমার কাজের প্রতিবাদ করার লোক নেই ভাবছ। যাদের করুণা করলে তুমি অক্ষয় স্বর্গলাভ করতে তাদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করে নিজেকে পাপের ভাগী করলে কেন? দেশের রাজা হয়ে তোমার মত অধার্মিক পাপিষ্ঠকে আমি শাস্তি দেব। যার মধ্যে শুভাশুভবোধ নেই সেই পাপিষ্ঠ দেশের শত্রু। প্রাণদণ্ড তোমার যোগ্য শাস্তি। অমনি লোকটি আশ্চর্য রকমভাবে বদলে গেল। প্রাণভয়ে আমার পদতলে আছড়ে পড়ে প্রাণভিক্ষা চাইল।

মাদ্রবতী সবিস্ময়ে বলল : বটে। তুমি কী করলে?

পরীক্ষিৎ কয়েকমুহূর্ত থামল। মাদ্রবতীর চোখের দিকে তাকাল। রাজোচিত গাম্ভীর্যে গলার স্বর গমগম করতে লাগল। বলল, শরণাগত আর ক্ষমাপ্রার্থীকে ক্ষমা করা পরম ধর্ম। তাই বললাম, তোমাকে প্রাণে বাঁচাব কিন্তু দুষ্কর্মের শাস্তি ভোগ করতে হবে। এই মুহূর্তে তুমি আমার রাজ্য থেকে দূর হও। তোমার মত পাষণ্ডের কোনো স্থান নেই আমার রাজ্যে। এখনি আমার রাজ্য ছেড়ে চলে যাও।

এরপরে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। লোকটি আমার কথা শুনে অট্টহাস্য করতে করতে অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু সুদূরলোক থেকে কে যেন তার কণ্ঠস্বরে বলল, আমি কলি। আমাকে চিনতে পারনি পরীক্ষিৎ। আমি তোমার রাজ্যেই আছি। এখানে ধর্ম বলে কিছু নেই। ধর্ম আজ পঙ্গু, অথর্ব, চলৎশক্তিহীন, নড়বড়ে ঐ বৃষের মত। একপায়ে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছে। আর গাভীটি হল পৃথিবীর প্রতিরূপ। অনাচারে, অবিচারে, অত্যাচারে ধরিত্রী অসহায়। শোকে, দুঃখে, ব্যথায়, বেদনায়, ভয়ে পাষাণবৎ হয়ে গেছে। সত্য সুন্দরের মৃত্যু হয়েছে। ধর্মের মত পৃথিবীও অসহায়, বিপন্ন। সন্তানের প্রাণ বাঁচানোর সাধ্যটুকু পৃথিবী মায়ের নেই। ধর্মের কাছেও তার পাওয়ার কিছু নেই। এত বড় সত্যটা রাজা হয়ে তুমি বুঝতে পারনি। আমার পরীক্ষায় হেরে গেছ তুমি। তোমার রাজত্বের দিনগুলোকে খুব সুখের বলা যাবে না। রাজ্যের অভ্যন্তরে বিবাদ-বিসম্বাদ, লোভ-হিংসা, কুটিলতা এবং পাপ ছেয়ে গেছে। তোমার সাধ্য নেই কলিকে শাস্তি দেবার। এবার তোমার আসল লড়াই কলির সঙ্গে। কলিকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করতে চাইলে কী করা যায়? তোমার রাজ্য ছেড়ে কোথায় সে যাবে? ঢোকার পথ পেলে কলি সেখানে জেঁকে বসে। এখন এই অধর্মের রাজ্যে তুমিও আমার সঙ্গে থাকবে। এখানে বসবাস করার মধ্যে কোনো দোষ দেখি না। একদিন সব জেনে-বুঝে কলিকে মেনে নিতে হবে তোমার রাজ্যে। তোমার সাধ্য নেই কলির অপচ্ছায়া থেকে দূরে থাকার।

মাদ্রবতীর উদ্বিগ্ন দুই চোখে ভয় ও আতঙ্ক। বলল, তাহলে আমাদের উপায় কী হবে?

জানি না। স্বপ্ন কখনও সত্যি হয়? ও আমার ভয় দুর্ভাবনা, আতঙ্ক এবং উৎকণ্ঠা থেকে সৃষ্টি। ওর মধ্যে কোনো বাস্তবতা নেই। কোন সত্য নেই। মিছিমিছি ভয় পাব কেন।

ভয়ার্ত গলায় মাদ্রবতী বলল, তোমার মনের ওই শঙ্কা কিন্তু অহেতু নয়। তার মূল কোথাও আছে। তুমি জান, কিন্তু আমাকে বলছ না। লোভ-লালসা, হিংসা বিদ্বেষ, বিভেদ এবং অন্তর্কলহে কৃষ্ণের স্বপ্নের দ্বারকা ধ্বংস হয়ে গেছে। কৃষ্ণ সব জেনেও চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই সর্বনাশা ধ্বংস দেখেছেন, তবু প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসেননি, প্রতিকারে কোনো চেষ্টাও করেননি। কাউকে শুধরে দেওয়ার জন্য একটি কথাও বলেননি। যা অনিবার্য, কালের অমোঘ পরিণতি তাকে নিঃশব্দে বুক পেতে বরণ করে নিয়ে শান্ত থাকার চেষ্টা করেছেন। নিজেকেও রেহাই দেননি। যে ভয়ংকর হিংসা, বিদ্বেষের বীজ নিজের হাতে বপন করেছিলেন, সেই হিংসা বিদ্বেষের গোপন ছুরিটি

যে আততায়ী গোপনে শানিয়ে তুলেছিল তার হাতে নিজেকে সঁপে দিতে একটুও ভয় পাননি। ইচ্ছে করে ব্যাধের হাতের মৃত্যুবাণটি এড়াতে পারতেন, কিন্তু করেননি। তিনি তখন কাল কবলিত হয়েছেন। কালের হাতে নিজেকে সমর্পণ করেছেন।

পরীক্ষিৎ দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, কিন্তু আমি তো ওঁদের মত কালের হাতে নিজেকে সমর্পণ করব না। অশুভ শক্তির সঙ্গে প্রাণপণে লড়ব। প্রজাকুলের মনের অভ্যন্তরে প্রতিরোধের দুর্গ রচনা করব। সকলে মিলে চাইলে এবং সতর্ক থাকলে অশুভ শক্তি এড়ানো যাবে। কেবল প্রতিরোধের জন্য যা প্রয়োজন তার সর্বব্যাপী আয়োজন রাখা একান্ত জরুরি। তবু নিজের পারকতা নিয়ে সংশয় হয়। আমি চাইলেও তা ভেস্তে যেতে পারে।

তোমার স্বপ্নের কথা তো আমায় কিছু বলোনি।

বললে, কী করতে তুমি। মিছেমিছি একটা অশান্তি ভোগ করতে। আমার যাত্রাটা কেঁদে কেটে পণ্ড করতে। তাই কাউকে কিছু না জানিয়ে একাই বেরিয়ে পড়েছি। স্বপ্নের সত্য মিথ্যে পরখ করার ইচ্ছেটাই প্রবল।

অশুভ কোনো ঘটনায় কী আক্রান্ত হয়েছ।

পরীক্ষিৎ ম্লান হেসে বলল : আক্রান্ত তো অনেককাল আগেই হয়েছি। কলির অশুভ শক্তির ছায়া পাণ্ডবদের সারাজীবনের সঙ্গী। একবারের জন্য তাদের পিছু ছাড়েনি। বোধ হয় ছাড়বে না কোনোদিন।

তোমার কথার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারলাম না।

বোঝার কোনো প্রয়োজন নেই। বসে বসে আমি বিচার করে দেখেছি কবে, কোন সময়, কোন রন্ধ্রপথে কলি পাণ্ডবদের জীবনে প্রবেশ করল। কত ঘটনাই চোখের পর্দায় ভেসে উঠল। সব ঘটনার মধ্যে আমি কলির মুখ দর্শন করেছি।

মাদ্রবতী ভুরু কোঁচকাল। বলল, যেমন—

মহারাজ পাণ্ডু যেদিন দিগ্বিজয় সমাপ্ত করে হস্তিনাপুর প্রত্যাবর্তন করে জানতে পারলেন রাজ্য এবং সিংহাসনের ওপর তাঁর কোনো অধিকার নেই। শতশৃঙ্গ পর্বতে কুন্তী সন্তান কামনায় অবৈধ সংগমে লিপ্ত হল সেদিন থেকে কলির ছায়া পড়ল পাণ্ডুর জীবনে। আর কামমোহিত পাণ্ডুর আকস্মিক মৃত্যুর রন্ধ্রপথ ধরে কলি প্রবেশ করল পাণ্ডবদের জীবনে। বারণাবতে জতুগৃহে যে পাঁচজন নিরীহ ভুখা শবরদের নিরপরাধিনী জননীর সঙ্গে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করল সেদিন থেকে কলি আর পাণ্ডবদের সঙ্গ ছাড়ল না। কলির অশুভ প্রভাবে তাদের শুভাশুভবোধ বিনষ্ট হল। তাই নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠার নামে খাণ্ডববনে অগ্নিসংযোগ করে নির্দোষ প্রাণীকুলকে অসহায়ের মত অগ্নিতে নিক্ষেপ করে হত্যা করল। কৃষ্ণার্জুন মিলে যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড করে পাণ্ডবদের নতুন রাজ্য ও রাজধানী স্থাপন করলেন সেদিন থেকে কলিও পাকাপাকিভাবে তার একটা জায়গা করে নিল। বিবাদ-বিভেদ, হিংসা-বিদ্বেষ, তাস-পাশা, জুয়া এবং একজন স্ত্রীলোককে পাঁচজনে মিলে সম্ভোগের মত নক্কারজনক অধর্মাচরণ ইন্দ্রপ্রস্থ প্রতিষ্ঠার দিন থেকে কার্যত সূচনা হয়েছিল। তখন থেকে ইন্দ্রপ্রস্থ কলিকে পুরোপুরিভাবে মেনে নিল। তাই ইন্দ্রপ্রস্থে

শান্তি ছিল না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে গোটা দেশকে শ্মশান করেও কৃষ্ণার্জুন পারেনি শান্তির ঘট প্রতিষ্ঠা করতে। কলির কারণে নিপীড়িত, নির্যাতিত, অধিকার-বঞ্চিত মানুষ যদি সম্মানজনক বাঁচার শর্তে স্বাধিকার অর্জনের জন্য এখন প্রস্তুত হয় তাহলে দোষ দেওয়া যায় না তাদের। আপাতদৃষ্টিতে তাদের গোপন কার্যকলাপ আমার চোখে কলির অশুভ ছায়া হলেও তাদের কাছে তা ছিল না।

স্বামীর কথা শুনে মাদ্রবতীর কণ্ঠস্বরে যুগপৎ উদ্বেগ ও আতঙ্ক প্রকাশ পেল। বলল : এ রাজ্যে কলি তাহলে অনেক আগে ঢুকে পড়েছে। পাণ্ডুপুত্ররা তাকে আবাহন করে এনেছে? এ তো বড় অদ্ভুত কথা। কস্মিনকালেও শুনেনি।

এটা বলার কথা নয়। ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করলে সেই বাস্তব সত্যটা বেরিয়ে পড়ে। আর সেটাই হল ইতিহাস।

তাহলে, তুমি আর কী করবে? তাকে মেনে নিয়ে রাজত্ব করতে হবে। কলিকে তাড়ানোর সাধ্য কী তোমার? আমার বিশ্বাস, কলি সবকালেই অল্প-বিস্তর আছেন। সবকালের মধ্যেই কিছুটা সত্য, কিছুটা ত্রাতা, কিছুটা দ্বাপর আর কিছুটা কলি আছে।

স্বপ্নের ধর্মরূপী বৃষের তিনটি পা খোঁড়া হওয়ার অর্থটা এখন বুঝতে পারছি। চার যুগের মধ্যে তিন যুগ—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর-এর অবসান হয়েছে। বাকি এককাল। সে হল কলিকাল। এ কালে ধর্মের কোনো বালাই নেই। অধর্মের জয় জয়কার। অধর্মের হাতে ধর্ম বন্দী। তিন পা ভাঙা ধর্মরূপী বৃষের মত তারও অস্তিত্ব বিপন্ন। ধরিত্রীও গাভীর মত নিরুপায় হয়ে অধর্মকে মেনে নিচ্ছে। আমিও কালের হাতে এক অসহায় ক্রীড়নক। স্বপ্নে তাকেই দর্শন করেছি। শিকারে বেরিয়ে প্রকৃত অবস্থাটা তাই আমার জানা দরকার।

খাণ্ডববনের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সচক্ষে পর্যবেক্ষণ করাই হল শিকার যাত্রার উদ্দেশ্য। তাই বহু জায়গায় বিশ্রাম করার জন্য এবং রাতযাপনের জন্য শিবির নির্মিত হত। কার্যত শিবিরে অবস্থানকালে পরীক্ষিৎ সাধারণ শিকারির ছদ্মবেশে বনাঞ্চল ঘুরে ঘুরে অধিবাসীদের জীবনযাপন সম্পর্কে খবরাখবর করত। খাণ্ডববনে বহু জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করে। এরা হল দানব, বানর, নাগ, নিষাদ, দাস, শবর গোষ্ঠীর লোক। এদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সদ্ভাবের অভাব। গণ্ডগোল লেগেই থাকে। যে যার ছোট সীমানায় বাস করে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। তারা বন্ধুও নয়, প্রতিবেশীও নয়। পরস্পরকে শত্রুর চোখে দেখে। কিন্তু নিজের গোষ্ঠী এবং গোষ্ঠীপতির প্রতি তাদের আনুগত্য অসীম। এদের সামনে বৃহৎ কোনো আদর্শ নেই, যা তাদের প্রেরণা ও পাথেয় হতে পারে। গুপ্তচরদের দেওয়া সংবাদের সঙ্গে তার দেখার কোনো অমিল নেই। কিন্তু তক্ষকের আগমনের পরে সব বদলাতে শুরু করেছে। এটাই ছিল পরীক্ষিতের জানার বিষয়। এক জাতি, এক আদর্শ, এক দেশ ও ধর্মের মহান আদর্শের আলো পড়ে তাদের ভেতরটা

বড় হয়ে গেছে। ঐক্য ও সহযোগিতার এক সেতু তৈরি হয়েছে। তাদের আত্মপ্রকাশের এক সুন্দর রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণ সৃষ্টি হয়েছে। তক্ষকের অজ্ঞাত আকর্ষণ তাদের অন্তরে ঘুম ভাঙিয়েছে। তাদের জড়তা ভেঙেছে, ভয় দূর হয়েছে। পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, বিদ্রোহ, অসন্তোষ তাদের প্রবল পাণ্ডববিদ্বেষী করে তুলেছে। এখন তক্ষকের নেতৃত্বে নিরাপদ আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় আছে।

খাণ্ডববনের কোনায় কোনায় জেহাদের প্রস্তুতি। যেখানে যত নাগজাতি আছে ভারতবর্ষে, সবাই অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে খাণ্ডববনের স্বাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে স্বাগত জানাল। তক্ষকই খাণ্ডববনের নিপীড়িত মানুষের প্রতিবাদের মানচিত্র নতুন রঙে রাঙিয়ে দিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে ছত্রিশ বছর ধরে যে সংকট একটু একটু করে দানা বাঁধছিল তা আজ মহাবল দানবের রূপ ধরে হস্তিনাপুরকে গ্রাস করতে উদ্যত। একে প্রতিহত করার শক্তি তার নেই। সে এখন একেবারে একা। কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের পর পাঞ্চাল রাজ্যের পূর্বের গরিমা নেই। যদুবংশও ধ্বংস হয়ে গেছে। দেবরাজ্যও পাশে নেই। নিঃসঙ্গ, নির্বান্ধব হস্তিনাপুরে সে এখন একা। কথাগুলো মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়চকিত ভাব পরীক্ষিতের চোখেমুখে ফুটল। উদ্‌গত নিঃশ্বাস বুকের কাছে রুদ্ধ হয়ে রইল। আক্রান্ত না হয়েও নিজেকে আক্রান্ত মনে হল। এরকম ভারাক্রান্ত, বিষণ্ণ মন নিয়ে শিকার করতে ভাল লাগে না কারো। তবু মনে প্রশ্ন জাগল, সত্যই কি তক্ষক দুর্জয়, দুর্নিবার, অপ্রতিরোধ্য! ষড়যন্ত্রের পাকে পাকে কী সত্যই বেঁধেছে তাকে?

এই কঠিন প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে তার বারংবার মনে হতে লাগল, যুদ্ধ শুধু অস্ত্রে হয় না, যুদ্ধ হয় হরেকরকম উপায়ে। যে যুদ্ধের যে অস্ত্র। জয়ী হওয়ার জন্য নতুন নতুন রীতি-নীতি এবং কৌশল উদ্ভাবন করতে হয়। এ এক অদ্ভুত খেলা। পাশা খেলার মত হার-জিত, উত্তেজনা সব আছে। তবে জয়-পরাজয়কে নিরাবেগ চিত্তে গ্রহণ করতে হয়। চিরস্থায়ী জয় কিংবা হার বলে কিছু নেই। মনটা প্রশস্ত হয়। পরীক্ষিতের দাড়ি কামানো মুখে নিশ্চিন্ত একটা প্রশান্তির ভাব ফুটে উঠল। চোখের চাহনিতে যুদ্ধের রহস্য না হোক, জীবনযুদ্ধের রহস্য বুঝতে পারার কৌতুক ছিল।

তক্ষকের তপ্ত রাজনীতির নেপথ্যে গোপনে অর্থ লেনদেনের দর কষাকষি করে পরীক্ষিৎ অচিরেই তার পালের হাওয়া কেড়ে নিতে পারে। কারণ গরিব অভাবী মানুষের কাছে নিজের দেশ ও জাতির চেয়ে বড় স্বর্ণমুদ্রার লোভ। অর্থের গন্ধে আদর্শ-টাদর্শ যমুনায় ভেসে যাবে। খাণ্ডব ছাড়ার আগেই সে সর্বনাশ দেখে যেতে পারবে। অথচ, সেজন্য কোনো সৈন্য দরকার হবে না, যুদ্ধ হবে না, রক্ত ঝরবে না, গণ্ডগোল তাও হবে না। মনের অভ্যন্তরে শুধু ভয়, সন্দেহ, এবং অবিশ্বাসের বিষ ঢুকিয়ে দিলে বিবাদ বিভেদের অন্তঃস্রোতে তারা নিজেরা যদুবংশের মত হানাহানি করে মরবে। কারো প্রতি কারো আনুগত্য, বিশ্বাস কিংবা নির্ভরশীলতা থাকবে না। এক জঙ্গল-জীবন শুরু হবে। ছত্রিশ বছর ধরে তিল তিল করে তক্ষক যা তৈরি করেছে তাসের ঘরের মত ক'দিনেই তা ভেঙে পড়বে। কথাগুলো মনে হতে এক অদ্ভুত আনন্দে ও তৃপ্তিতে ভরে গেল পরীক্ষিতের বুকের ভেতরটা।

শিকার করাটা গৌণ হয়ে গেল। পরীক্ষিতের লোকেরা স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে মিশে পরিকল্পিত ভাবে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্পগুজব ছড়াতে লাগল। বিশেষ করে তক্ষক সম্পর্কে নানা বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ চাউর করল। আবেগ দুর্বলতা উস্কে দিয়ে ভাবাবেগ বিপর্যস্ত করে তাদের মনোবল ও আত্মবল ধ্বংসের চক্রান্ত করল। কিন্তু খুব সুবিধে করতে পারল না। পোড় খাওয়া মানুষরা তাদের অভিসন্ধি বুঝতে পেরে রুখে দাঁড়াল। বলল, তোমরা খারাপ লোক। এখনি আমাদের গাঁ ছেড়ে যাও। নইলে ভাল হবে না। সে কথা শুনে পরীক্ষিতের লোকেরা এমনই অসহায় বোধ করল যে শিবির ছেড়ে পালাল।

কিন্তু পরীক্ষিৎ হাল ছাড়ল না। কাজটাকে যত সহজ ভেবেছিল ততটা হল না, এটাই তার কাছে বিস্ময়। ইন্দ্রপ্রস্থই যে খাণ্ডবপ্রস্থ এটা বোঝানোর চেষ্টা করল। কিন্তু খাণ্ডববনের কেউ এ তত্ত্ব বিশ্বাস করল না। মানল না তার যুক্তি। এক ভূখণ্ডের মানুষ হলেও তারা আলাদা। সংখ্যাগরিষ্ঠ খাণ্ডববাসীদের সঙ্গে নবগঠিত ইন্দ্রপ্রস্থের নতুন মিশ্র সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যর মধ্যে একটা বিভাজন রেখা টেনে দিয়েছে। সে কারণে ইন্দ্রপ্রস্থের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে তারা একজাতিতত্ত্ব মানতে রাজি হল না। খাণ্ডববাসীদের দাবি পৃথক রাষ্ট্র, পৃথক শাসন এবং সে রাষ্ট্রের নাম অবশ্যই হবে খাণ্ডবপ্রস্থ।

মগজ ধোলাইর কাজটা তক্ষক যে খুব ভালভাবে সম্পন্ন করেছে সেটা বুঝতে পরীক্ষিতের দেরি হল না। পাণ্ডবদের তারা শত্রুর চোখে দেখে এবং শত্রু ভাবে। তক্ষকের পাণ্ডববিদ্বেষী মনস্তত্ত্ব এতই নির্ভুল এবং সূক্ষ্ম যে তাদের সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ রাখতে সে সমর্থ হয়েছে। তাদের ঐক্যের দেওয়ালে ফাটল ধরাতে ব্যর্থ হল পরীক্ষিৎ।

তাই বলে হতাশ হয়ে থেমে গেল না। খাণ্ডববনের নাগ, নিষাদ, বানর, পক্ষী এবং ব্যাধকুলের যেসব পুরোহিত, মুনি, সাধু, সন্ন্যাসীর সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের সুসম্পর্ক ছিল এবং যারা ইন্দ্রপ্রস্থের চির-অনুগত ও বান্ধব তাদের সঙ্গে কট্টর বিদ্রোহীদের একটা ঠাণ্ডা লড়াই লেগে ছিল। সেই বিবাদ বিরোধকে প্রকাশ্যে টেনে এনে তক্ষক শত্রুপক্ষর হাত শক্ত করার সুযোগ দেয়নি। বরং তাদের সঙ্গে মিলেমিশে পরীক্ষিতকে সিংহাসনচ্যুত কবার জন্য দিনের বেশির ভাগ সময় নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিল। কিন্তু তারা তক্ষকের ওপর সন্তুষ্ট ছিল না। পরীক্ষিত এদের সঙ্গে গোপনে মিলিত হল।

পরীক্ষিতের চিন্তাভাবনা যে পথেই বিচরণ করুক বাস্তবে তার প্রতিফলন দেখতে পেল না। সকলে একবাক্যে বলল, তক্ষক, কালিয়, ধনঞ্জয়, মণিনাগ, এলাপক্ষী, জরাব্যাধ, নহুষ কেউ নিজের জন্য নয় দেশ ও জাতির ন্যায্য দাবির পক্ষে লড়াই করছে। জাতিভেদের সীমারেখা মুছে গেছে খাণ্ডববনে। প্রখর আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ খাণ্ডববাসীকে গর্বিত করে। তক্ষকের হৃদয়জয়ের এত বড় সাফল্যের সঙ্গে কেউ বেইমানি করতে পারবে না। বিশ্বাসভঙ্গের কাজ করে দেশ ও জাতির চোখে ছোট হয়ে যেতে পারবে না। কিসের স্বার্থে, কেন বা তা করবে। যে কাজে গৌরব নেই, সেই কাজে কেউই রাজি হল না।

পরীক্ষিতের বিস্ময়ের সীমা নেই। কিন্তু আরো বড় বিস্ময় তার জন্য অপেক্ষা করছিল।

এবার কোনো অভিনয় নয়, শিকারের পিছু ধাওয়া করতে করতেই সে শমীক মুনির আশ্রমে হাজির হল। কিন্তু বাণবিদ্ধ হরিণকে কোথাও দেখতে পেল না। রাগে, ক্ষোভে, ব্যর্থতায়, এবং অপমানে তার ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছিল। অনেকটা পথ দৌড়ে সে হাঁফাচ্ছিল। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছিল। শুকনো কাশি হচ্ছিল কেবলই। তেষ্টা নিয়ে পরীক্ষিৎ আশ্রমটা চক্কর দিল। কিন্তু কোথাও কাউকে দেখতে পেল না। স্তব্ধ নির্জনতায় থমথম করছিল। কুটিরগুলি মানুষশূন্য। কেবল কয়েকটা গাভি, ছাগল, ভেড়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের মনে চর্বিত চর্বণ করছিল। ডালে ডালে পাখিরা কিচির-মিচির করছিল। দূরে কোথাও শিয়াল ডাকল। গাছের কাণ্ডে দুটো কাঠবিড়ালি মন দেওয়া-নেওয়ার খেলা করছিল। সকলকে নিয়ে এই আশ্রম। কেউ বলে না দিলেও দিব্যি অনুভব করা যায় সকলের সঙ্গে মিলেমিশে, ছোটখাট অমিল ভুলে এক মন এক প্রাণ হয়ে এক মিষ্টি সম্পর্কে বাধা আছে আশ্রম। তীব্র অসন্তোষের মধ্যেও পরীক্ষিৎ গভীর করে অনুভব করল।

কিন্তু তৃষ্ণা তাকে অসহিষ্ণু করে তুলল। ক্রমে তার বিরক্তি বাড়ল। ভেতরটা নির্দয়, নিষ্ঠুর এবং প্রেমহীন হল। মনুষ্যশূন্য আশ্রমকে শুনিয়ে উচ্চৈস্বরে বলল, আমি গাণ্ডীবধারী অর্জুনের পুত্র অভিমন্যুর সন্তান রাজা পরীক্ষিৎ। হস্তিনাপুরের রাজাধিরাজ। আশ্রম কুটিরে কে আছ সাড়া দাও। আমি তৃষ্ণার্ত। আমায় একটু পানীয় জল দাও।

কোনো সাড়া মিলল না। পরীক্ষিতের তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর বাতাসে সওয়ার হয়ে ভেসে গেল। দূর পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনিত হল। তবু তপোবনের কুটির থেকে কেউ বাইরে এল না। যত সময় যায় বুকের ভেতরটা তার পাথরের মত ভার হল।

শমীক মুনির আশ্রমে পরীক্ষিতের পৌঁছনোর কিছু আগে পুত্র শৃঙ্গির সঙ্গে বেশ কথা কাটাকাটি হল বাপ-ছেলের। শমীক চেয়েছিল, সংঘর্ষের পথ পরিহার করে খাণ্ডবপ্রস্থের দাবি নিয়ে একটা আপস সমাধান। বহুকালের বিবাদের জের টেনে নিয়ে যাওয়া ঠিক নয় আর। অবস্থা বদলেছে। কাজেই পরীক্ষিৎ যখন চাইছে মিটিয়ে নিতে দোষ কোথায়? সম্মানজনক মীমাংসার পথ খোলা রেখে যদি পুরনো বিবাদের নিষ্পত্তি হয় সেটা মেনে নেওয়া স্বাস্থ্যের লক্ষণ।

শৃঙ্গি রাজি হল না। বলল, এ সমাধান তো অনেক আগেই হতে পারত। বিশ বাঁও জলে দাঁড়িয়ে আপসের কথা ভাবা নিরর্থক। ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গেছে, আমাদের আর হারানোর কিছু নেই। এখন কিছু করতে চাওয়ার অর্থ হল জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গ করা। সে আমি পারব না।

জনগণ চায় না যুদ্ধ হোক। শমীক বলল, জনগণ বোঝে না তোমরা কী চাইছ। জনগণ জানে না তারা কী হারাচ্ছে। তবু এই নির্বোধ লোকগুলোকে সামনে রেখে ক্ষমতার কলকাঠি নাড়ছ। তাদের যা বোঝানো যায়, তাই বোঝে। তারা যদি নিজের ভাল-মন্দ, দাবি-দাওয়া, অধিকার বুঝত তাহলে তাদের নিয়ে বাঘবন্দীর এই খেলা চলত না।

এতকাল পরে জনগণ সম্পর্কে তোমার এ কোন বোধোদয় হল বাবা? আমার সঙ্গে

যা বলেছ তা অন্য কেউ শুনলে তোমাকে পরীক্ষিতের চামচা বলত। বিশ্বাসঘাতকতার খতম তালিকায় তোমার নাম লেখা হত। ওকথা বলে আমাকে পিতৃহীন কর না। শৈশবে মা হারিয়েছি, এখন তুমি গেলে আমি অনাথ হয়ে যাব। বাবা, মতপার্থক্য নিয়ে আমরা ঝগড়া করব। কিন্তু যে কথা শুনলে লোকের সন্দেহভাজন হবে, মিথ্যে অপবাদের ভাগী হবে, তেমন কথা নাইবা বললে।

শমীক একটু থমকে গেল। ভাবাবেগ সামলে নিয়ে বলল, তোমাদের ইচ্ছেটা জনগণের ওপর চাপিয়ে দিয়ে তাদের ভুলপথে চালিত করা অপরাধ।

হাঁ, যে পথে গেলে জনগণের মঙ্গল হবে সেটাই তার গন্তব্যপথ। এতকাল যে পথটাকে তারা সত্য বলে বিশ্বাস করে আসছে সেখান থেকে তাদের সরানোর নামই বিশ্বাসভঙ্গ করা।

নতুন করে বিশ্বাস সৃষ্টি করার কাজও করতে হয়। পরীক্ষিতের আমলে ভারত-রাজনীতির অবস্থা বদলেছে, মীমাংসার রাস্তা খুলে গেছে। তাই, সংঘর্ষের পথ থেকে সরে আসা বাঞ্ছনীয়। খাণ্ডবপ্রস্থের মানুষের কল্যাণে পরীক্ষিৎ তো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, তাহলে অবিশ্বাস কেন? আর একটা কুরুক্ষেত্র এই বৃদ্ধ বয়সে দেখতে চাই না। ভারতবর্ষের অধিকাংশ রাষ্ট্র এবং অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য কৌরব পক্ষে থাকা সত্ত্বেও পাণ্ডবদের একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের কাছে তারা হেরে গেল।

কারণ, ধর্মযুদ্ধ হয়নি। পাণ্ডবেরা যুদ্ধের রীতিনীতি কিছুই মানেনি।

যুদ্ধের শেষ কথা জয়। জয়ের জন্য যে কোনো নীতি গ্রহণ করা কোনো অন্যায় নয়। এরই নাম রণকৌশল। ছল, চাতুরী ও যুদ্ধকৌশল তার অঙ্গ। তাকে নিন্দে করার কিছু নেই। কিন্তু তোমরা যে যুদ্ধ করছ তা খোলারাস্তায় মুখোমুখি অস্ত্র নিয়ে লড়াই নয়। সাধাবণ নাগরিককে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাজশক্তির ওপর চাপ সৃষ্টি করছ। সুস্থভাবে বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নেওয়া অধর্ম নয়। এতে কার ক্ষতি হচ্ছে? নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য নজরদারির খরচ বাড়ছে। জাতীয় সম্পত্তি ধ্বংস হচ্ছে। অর্থনীতির ওপর আঘাত হেনে কার উপকার করছ? দেশের উন্নয়নের কাজ থমকে যাচ্ছে। পিতামাতা সন্তান হারাচ্ছে, স্ত্রী স্বামী হারাচ্ছে, সন্তান পিতৃহীন হচ্ছে। ভীরুর মত, কাপুরুষের মত অতর্কিতে আক্রমণ করা তো মানবিকতা-বিরোধী এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড। একে কেউ ন্যায়যুদ্ধ বা ধর্মযুদ্ধ বলবে? তথাপি, এটাও একটা যুদ্ধ। আত্মঘাতী এই যুদ্ধকে জনযুদ্ধ বলছ। জনযুদ্ধজনিত ক্ষয়ক্ষতির অর্থ আদায় করতে রাজা জনতার উপর নিত্য নতুন কর বসাচ্ছে। এই সর্বনাশা পথ পরিহার কর। পরীক্ষিতের মৈত্রী প্রস্তাব স্বীকার কর, সম্মান কর, তাতে নাগজাতির মঙ্গল হবে।

শৃঙ্গির দু'চোখে বিস্ময়। পিতার মধ্যে এ কোন শমীক মুনি দেখল! হঠাৎ তাঁর এই পরিবর্তনের মানে কি? পরীক্ষিতের ইচ্ছে যে হাওয়ায় উড়ছে এ কী তার প্রতিক্রিয়া! পরীক্ষিতের প্রস্তাব পিতার অন্তরে যে বার্তা পৌঁছে দিয়েছে তাকে অস্বীকার করার মত জোর নেই মনে, তাই হয়তো বিশ্বাস এবং কর্তব্যের মধ্যে একটা সমন্বয় করতে চাইছেন।

কিন্তু এই পথে যে খাণ্ডবপ্রস্থের কল্যাণ হবে তারই-বা নিশ্চয়তা কোথায়? একটা দীর্ঘকালের বিবাদের নিষ্পত্তির সদিচ্ছা নিয়ে আলোচনার যে আর্জি পরীক্ষিৎ করছে, পিতার যুক্তিবাদী মনেতে তার দক্ষিণা বাতাস লেগেছে। মুক্তির হাওয়া বইছে সেখানে।

থমধরা বিস্ময় নিয়ে চুপ করে রইল শৃঙ্গি। ঐ সময়টুকুর মধ্যে অনেক কিছু ভাবল। কিন্তু জেহাদি মন কোনো যুক্তিই মানল না। তারস্বরে প্রতিবাদ করে বলল, বর্তমান প্রজন্মের আগে খাণ্ডববনের ভাল কেউ চায়নি। কিংবদন্তির কাল থেকে নাগদের উত্থানকে সুকৌশলে দাবিয়ে রাখার জন্য কত কি করা হল। স্বর্গরাজ্যের দেবতারা নিজেদের স্বার্থে নাগদের ব্যবহার করেছে। দেবতারা ভোগ-বিলাসে ডুবে থাকার জন্য পৃথিবীর মঙ্গল ও কল্যাণের সব ভার নাগকুলকে অর্পণ করল। দেবতাদের সে ইচ্ছেয় ধন্য হয়ে গিয়ে বাসুকিনাগ সহস্র ফনাগ্রে পৃথিবীকে ধারণ করে রাখল। কিংবদন্তির গল্পে নাগজাতির গৌরব ও মর্যাদা দেওয়ার নাম করে তাদের সেবাদাসে পরিণত করল! গোষ্ঠীগত প্রতীক সর্পচিহ্ন ব্যবহার করার জন্য মনুষ্য পরিচয় মুছে ফেলে তাদের সরীসৃপদের সঙ্গে এক করে দেখা হল। বিশ্বের চোখে আমাদের মনুষ্য পরিচয় এবং জাতি পরিচয়কে ছোট করে দিল। এই অপমানের চিরস্থায়ী একটা সমাধান চাই।

শৃঙ্গি একটু দম নিয়ে পুনরায় বলল, কিংবদন্তির শেষ এখানে নয়। শ্বেতাঙ্গ দেবতা এবং কৃষ্ণবর্ণ অসুর মিলে সমুদ্র মন্থনের সময় রজ্জুর বদলে অনন্তনাগকে রজ্জু করে অমৃত লাভ করল। অথচ, এত ক্লেশভোগের পরেও অনন্তনাগকে অমৃতের আস্বাদ থেকে এবং সমুদ্রগর্ভ থেকে উত্তোলিত বহু মূল্যবান সামগ্রীর অধিকার থেকে অসুরদের বঞ্চিত করল। শোষণের এত বড় নির্লজ্জ দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে কম আছে। এখানেও পরোপকারী অনন্তনাগকে নিকৃষ্ট সরীসৃপের সঙ্গে এক করে বিবেচনা করা হল। এই সব অপমানে এবং অন্তর্দ্বন্দ্বে ছিন্ন ভিন্ন তুলো পেঁজা হয়ে যাচ্ছে আমাদের বর্তমান প্রজন্ম।

গলার স্বর দ্রবীভূত হয়ে পাতিহাঁসের মত ফ্যাসফেসে হয়ে গেল। দুঃখে, অভিমানে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল। বলল, শ্বেতকায় দেবতারা চিরকাল বিশ্বাসভঙ্গ করে এসেছে। পাণ্ডুপুত্রদের জন্ম দেবতার অংশে। পরীক্ষিতের ধমনীতেও সে রক্তধারা বইছে। সুতরাং, তাদের বিশ্বাস করি কী করে? বিশ্বাস করে ঠকার কোনো ইচ্ছে আমাদের নেই। সম্মান, মর্যাদা কারো করুণা কিংবা দয়ায় পাওয়া যায় না, তাকে অর্জন করতে হয়। ওদের মৈত্রীর প্রস্তাবে তার কোনো উল্লেখ নেই।

দারুণ মুগ্ধ চমকে চমকাল শমীক মুনি। তারই ছেলে শৃঙ্গি। ভারি সুন্দর কথা বলে। বুকের মধ্যে গেঁথে যায়। কথা তো নয় ছিলেকাটা হীরে। কী দ্যুতি তার! ভেতরটা পর্যন্ত ঝলমল করে ওঠে। হৃদয় আকুলি-বিকুলি করে এক অজ্ঞাত ভাল লাগায়। এমন পুত্রের জন্য গর্ব হল।

পিতার নীরবতা শৃঙ্গিকে ক্রুদ্ধ করল। চিৎকার করে বলল, একটা কিছু তো বলবে। অবশ্য বলার মত কোনো কথা নেই। নাগদের ভালর জন্য কিংবা তাদের স্বার্থের জন্য পাণ্ডবরা কখনও করেছে কিছু? দাসত্ব, অধীনতা, অসম্মান, কৃপা, করুণা ছাড়া কী রেখে

গেছে আমাদের জন্য? তোমাদের আপস মীমাংসা কোনো মঙ্গলঘট বয়ে আনেনি। তাই আর আপস নয়। হয় মরব, না হলে বাঁচব। এর মাঝামাঝি কিছু চাই না। এটাই শেষ কথা। পিতার মুখের ওপর সদর্পে কথাগুলো ছুড়ে দিয়ে হন্‌হন্ করে চলে গেল শৃঙ্গি।

ওর গন্তব্যের দিকে তাকিয়ে রইল শমীক। নিজের মনে নিরুচ্চারে বলল : মানুষের মত মানুষ হয়ে উঠতে হলে এমনই তেজ চাই। এ হল আত্মপ্রকাশের জ্যোতি। বেশিরভাগ মানুষের মধ্যে সেটা নেই বলে জীবন তাদের কাছে বন্দীদশা। খুব কম মানুষই বোঝে মৃত্যুভয় জয় করলে তবেই জয়ী হওয়া যায়। একটা অদ্ভুত প্রশান্তিতে আর তৃপ্তিতে তার ভেতরটা টইটম্বুর হয়ে গেল। মনটাও তাঁর ইষ্ট আরাধনায় ব্যাকুল হল। এটাই হল ধ্যানে বসার শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত।

গভীর আবেশে দুচোখের পাতা আস্তে আস্তে বুজে গেল। খুব অল্প সময়ের মধ্যে গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেলেন। প্রকৃতির মতই শান্ত, স্তব্ধ এবং মৌন হয়ে গেলেন। বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হল তাঁর।

অনেকক্ষণ অন্বেষণ করার পরে তৃষ্ণার্ত পরীক্ষিৎ শমীক মুনিকে একটি বৃক্ষমূলের বেদিতলে আবিষ্কার করল। শমীকমুনির নীরবতায় পরীক্ষিতের মেজাজের পারদ চড়ল। ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলল : শুনতে পাচ্ছেন। আর কত চেঁচাব? তবু আমার পিপাসা মেটানোর জন্য কেউ কিছু করছে না। মুনির কানের কাছে মুখ নামিয়ে এনে বলল, তুমি কি বধির হয়ে গেছ? তুমি জীবিত, না মৃত? আমি যে সে লোক নই। হস্তিনাপুরের রাজা পরীক্ষিৎ। একটু পানীয় জল চাই।

গলাটা পরীক্ষিতের শুকিয়ে গিয়েছিল। ঘন ঘন শুকনো কাশিতে তার কষ্ট হচ্ছিল। সাড়াশব্দ না পেয়ে মুনির ওপর রাগ হল। হস্তিনাপুরের রাজা বলেই কি তার সঙ্গে অসহযোগিতা করছে? রাগে-অপমানে মাথার মধ্যে খুন চেপে গেল। মুনির বাহুতে নাগচিহ্ন দেখে পরীক্ষিত সহসা হিংস্র হয়ে উঠল। চিৎকার করে বলল, তুমি ইচ্ছে করে বোকা সেজে আছ। পাণ্ডবদের সঙ্গে বৈরিতা ভুলে তৃষ্ণার্তকে তেষ্টার জল না দিয়ে যে অপরাধ করলে তার কোনো মাপ নেই। পরীক্ষিৎ এদিক-ওদিক কী যেন খুঁজল। তারপরেই দেখতে পেল আশ্রমের অদূরে একটি ময়ূর সাপ ধরার খেলা করছিল। শিকারকে তীক্ষ্ণ চঞ্চু দিয়ে ঠুকরে ঠুকরে তাকে মৃতপ্রায় করে ফেলল। নিস্তেজ সাপটিকে দুপায়ের তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে খেতে উদ্যত হল। পরীক্ষিতের কী মনে হল, ময়ূরের মুখ থেকে নিহত সাপটি ছিনিয়ে নিয়ে ধনুকের একপ্রান্তে জড়িয়ে মুনির গলায় জড়িয়ে দিল। উপবীতের মত মুনির গলায় রক্তমাখা সাপটি ঝুলতে লাগল। তবু ধ্যানভঙ্গ হল না মুনির। নিহত সর্পের স্পর্শে গা ঘিনঘিন করা কিংবা সিরসিরানির কোনো অনুভূতি হল না। মুনির কোনো বিকৃতি নেই। পরীক্ষিৎ খুব আশ্চর্য হল। বেশ একটু ভয় পেল। পাছে অভিশাপ দেয় তাই মুনির ধ্যানভঙ্গের পূর্বেই পরীক্ষিৎ আশ্রম ত্যাগ করল।

আশ্রমে প্রত্যাবর্তনের পথে শৃঙ্গি বহুদূর থেকে পরীক্ষিতকে আশ্রম থেকে দ্রুত ধাবমান অশ্বে যেতে দেখল। অমনি একটা তীব্র তীক্ষ্ণ সন্দেহে বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল তার।

শিকার থেকে পরীক্ষিৎ ফিরল এক অন্যমানুষ হয়ে। চুপিচুপি নিজের ঘরে ঢুকল। কারো সঙ্গে কথা বলল না, কে কেমন আছে তাও জিগ্যেস করল না। অলিন্দে মাদ্রবতী তার প্রতীক্ষায় ছিল, তাও দেখল না। বরং দ্রুত লুকোনোর জন্য ঐ জায়গাটুকু দৌড়ে পার হল। জনমেনজয় তার প্রাণ, তবু তার সম্পর্কে কোনো কৌতূহল প্রকাশ করল না। পরীক্ষিতের এহেন অদ্ভুত আচরণে মাদ্রবতী উদ্বিগ্ন হল। বড় কিছু ঘটেছে অনুমান করে ভীষণ উদ্বিগ্ন হল। তথাপি একটা তীব্র অভিমানে তার চোখে জল।

অল্প কিছুক্ষণ পরে মাদ্রবতী পরীক্ষিতের কক্ষে ঢুকল। গালে হাত রেখে ভাবুকের মত চেয়ারে বসে। চোখ দুটি তার মেঝের দিকে নিবদ্ধ। পরীক্ষিতের গায়ে তার ছায়া পড়ল। তবু সে তাকাল না। মাদ্রবতী অভিমান ত্যাগ করে স্বামীর গায়ে হাত রাখল। তার কোমল হাতের স্পর্শে যে জাদুই থাক পরীক্ষিতকে তা আকুল করল না। খুব কাছে এসে বলল, রাগ করেছ।

নির্লিপ্তভাবে পরীক্ষিৎ বলল : না।

তাহলে আমাকে দেখেও দেখছ না কেন? কী হয়েছে তোমার? মনে হচ্ছে কোথাও একটা বিরাট বিপর্যয় ঘটে গেছে। তাই তোমার ভেতরটা অশান্ত। যে পুত্রকে দেখে একদণ্ড থাকতে পার না, এসে তার নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করনি। তার খোঁজও করলে না। তাই কেমন ভয় করছে। খারাপ সংবাদ নেই তো।

পরীক্ষিৎ নিস্পৃহভাবে উত্তর দিল, আমার মন ভাল নেই। একটু একা থাকতে দাও।

মাদ্রবতী কণ্ঠস্বরে উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠা। বলল, শিকার থেকে ফিরলে এক অন্যমানুষ হয়ে। এর আগেও শিকারে গিয়েছ, কিন্তু এত বিপন্ন ও অস্থির হতে দেখিনি। চরম সংকটেও তুমি বিচলিত হও না, আজ সেই তুমি একেবারে ভেঙে পড়েছ। কী ভীষণ বদলে গেছ। আমার ভাল বোধ হচ্ছে না। শিকার করার সময় কোনো অঘটন ঘটেছে কি! তোমার স্বপ্ন কি—

পরীক্ষিতের ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠল কয়েকবার। মাদ্রবতীর উৎকণ্ঠা দূর করার জন্য বলল, অঘটন যা ঘটার তা তো ঘটে গেছে আমার জন্মের বহু আগেই। এখন শুধু তার ফলভোগ বাকি।

কিসের ফলভোগ?

ও তুমি বুঝবে না! চলে যাবার অভিপ্রায়ে পরীক্ষিত আরামকেদারা থেকে উঠে দাঁড়াল। মাদ্রবতী তড়িৎবৎ তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, ওভাবে তোমার পালিয়ে যেতে দেব না। মেয়েমানুষ বলে আমাকে অবজ্ঞা করার কিছু নেই। বুঝিয়ে বললে, না বোঝারও কিছু নেই।

তাহলে শোন। এবারে শিকার করতে যাওয়াটা আমার ছিল ছলনা। নিরীহ হরিণের পেছনে দৌড়ে মজা কুড়োনোর কোনো ইচ্ছে ছিল না। তবু সেই হরিণের পিছনে দৌড়তে হল আমাকে। শিকার করার জন্য তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করলাম। তবু ধরাশায়ী হল না।

গায়ে বিঁধে ঝুলে রইল। ঐ অবস্থায় ছুটতে লাগল হরিণটা। আমি ওর পিছু নিলাম। কিন্তু ধাবমান হরিণটি যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল আর দেখতে পেলাম না। হরিণের পিছনে দৌড়ে দৌড়ে শুধু ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত হলাম। সামনেই এক ঋষির আশ্রম ছিল। জলের আশায় সেখানে গেলাম। কেউ ছিল না আশ্রমে। বহু খোঁজাখুঁজি করে অবশেষে বটবৃক্ষের তলায় একজন ঋষিকে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন দেখলাম। বাহ্যজ্ঞানশূন্য ঋষি আমার উপস্থিতি টের পেল না। তবু ওঁকে বললাম, আমি পিপাসার্ত। একটু জল চাই। সাড়া না পেয়ে চিৎকার করে বললাম — মহারাজ পরীক্ষিৎ জানতে চাইছে বাণবিদ্ধ হরিণকে এপথে পালাতে দেখেছ। তবু কোনো সাড়া নেই। দুরন্ত অপমানে রাজ অহঙ্কার দপ করে জ্বলে উঠল। গলার স্বর সপ্তমে চড়িয়ে বললাম : সামান্য একজন মুনির এত স্পর্ধা হয় কোথা থেকে? রাজার কথার কর্ণপাত না করার অর্থ রাজাকে অমান্য করা। রাজাকে অবজ্ঞা করার পরিণতি যে কত ভয়ংকর তা তুমি কল্পনাও করতে পার না ঋষি। দাঁড়াও, আমাকে অপমান করার মজা দেখাচ্ছি তোমায়।

কী আশ্চর্য, ঋষি তেমনি নির্বিকার। ওঁর কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। কিন্তু আমি তো এত অবহেলা কারো কাছে পাইনি। জীবনে যা চেয়েছি তা পেয়ে এসেছি। তাই না পাওয়ার জ্বালাটা যে কী ভয়ংকর জানতাম না। ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকা একটি মৃতসর্প ধনুকে জড়িয়ে ঋষির গলায় পরিয়ে দিলাম। তবু ধ্যানভঙ্গ হল না তাঁর। আশ্চর্য লাগল, যাঁকে নিয়ে এত কাণ্ড তাঁর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি তখন অন্যজগতে। সহসা আমার অন্তরে ভয় সঞ্চার হল। অমনি আশঙ্কায় তখনই সে স্থান ত্যাগ করলাম।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত মাদ্রবতীর বাক্যস্ফূর্তি হল না। বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারণ করল, ছিঃ! এ তুমি কী করলে। তোমাকে ধিক্কার দেবার ভাষা আমার নেই। শরীরে তোমার কলি বাসা বেঁধেছে। তাই এসব কাজ করতে পারলে, নইলে, এমন অশোভন অশিষ্ট আচরণ করতে না। মুনি-ঋষিদের প্রতি তোমার বিনয় ব্যবহার এবং শ্রদ্ধা কোথায়? তোমার বাক্য ও আচরণে রাজার অহঙ্কার। একজন অহিংস, নিরস্ত্র সাধু — তিনি যে সম্প্রদায়েরই হোন তিনি তো সাধু। তাঁকে ধনুক উঁচিয়ে শাসন করতে, শাস্তি দিতে কিংবা অমার্জিত, অভদ্র আচরণ করতে পারলে? ছিঃ। আমার স্বামী যে এত নরাধম ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে। ধিক্কার দিয়ে কিংবা তিরস্কার করে তোমার পাপস্খালন হবে না। অচিরেই তোমার কর্মফলের উচিত শিক্ষা পাবে। আর তার সব দুর্ভোগ তোমার সঙ্গে আমাদের সকলকে ভোগ করতে হবে। তোমায় কলিতে পেয়েছে, তাই এত বড় ভুল করলে।

অনুতাপিত গলায় বলল, আমার গর্হিত কর্মের আমি একজন নিষ্ঠুর সমালোচক। অনুশোচনা আমাকে পাগল করে দিচ্ছে। নিজেকে নিজে ক্ষমা করতে পাচ্ছি না। তোমরা তো শুধু বাইরের কান্না দেখতে পাও। কিন্তু বুকের ভেতর আমার যে রক্তক্ষরণ হচ্ছে তা দেখতে পাচ্ছ না, অনুভবও করতে পারছ না। সব আমার কপাল। এখন কিছু করার নেই আর। যা হওয়ার তা হয়েছে। কলিকে দোষারোপ করে লাভ নেই। সব আমার কর্মফল।

হাঁ, তোমার কৃতকর্মের ফল দেশশুদ্ধ লোককে ভোগ করতে হবে। রাজার পাপে প্রজা মরে একারণেই।

মাদ্রবতী আমার ভাবনাটা অন্য। বনের মানুষ স্বরাজ্য ফিরে পাওয়ার স্বপ্ন দেখছে। ইন্দ্রপ্রস্থের ওপর অধিকার ফিবে পাওয়ার একটা আশ্চর্য লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে তারা। তক্ষক আজ একজন নয়, তক্ষক অগণন। তাদের মুখের ভাষার কত ধার। কী বিপুল বেগে মানুষের চিত্ত ভাসিয়ে দেয়। ঘুমন্ত মানুষও জেগে ওঠে। ওদের মধ্যে বসে তক্ষকের ভাষণ আমি স্বকর্ণে শুনোছি। কী তার আবেদন! আমার কানে এখনও তা অনুরণিত হচ্ছে। "দযা করে নিজের অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করুন। অন্যদেরও বোঝান। আমরা বন্ধু, কেউ কারও শত্রু নই। নিজেদের অস্তিত্বের জন্য আমরা লড়ছি। পরাজয়ের কথা বললে শুনব না সে কথা। সবাই চায় জয়। যে কোনো মূল্যে সেই জয় চাই। বড় শক্তির সঙ্গে যুদ্ধে এঁটে ওঠা যাবে না। তবে যতদিন ইন্দ্রপ্রস্থের মাটিতে পাণ্ডবদের জয়ের নিশান উড়বে ততদিন পর্যন্ত ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ইন্দ্রপ্রস্থের বিরুদ্ধে আমরা লড়ব। ঐক্য, মনোবল, সংকল্পই আমাদের শক্তি। আমাদের যা সমস্যা তা আমাদেরই সমাধান করতে হবে। বাঁদরের পিঠে ভাগ হতে দেব না "— এসব কথা শুনলে কাবো মন ভাল থাকে? আমার পূর্বপুরুষদের ভুলের খেসারৎ দিতে হবে আমাদের সকলকে।

দুশ্চিন্তায় কাতর হল মাদ্রবতী। হঠাৎই তার শরীর খারাপ করল। পরীক্ষিতের বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে বলল, এখন থেকে আমাদের সুখশান্তি বলে কিছু থাকল না। পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থানের যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু কর্পূরের মত উবে গেল। সংকটের মধ্যে তোমাকে রেখে ওরা রাজ্য ত্যাগ করলেন। হয়তো রাজনৈতিক প্রজ্ঞা দিয়ে বুঝেছিলেন কলিকাল আসন্ন। ভাবমূর্তি নষ্ট হওয়ার আগেই ইন্দ্রপ্রস্থ ছেড়ে মান বাঁচালেন। কিন্তু তোমার পাথেয় বলে কী থাকল?

পরীক্ষিৎ বেশ একটু ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হল। বলল, তোমাকেই কলি পেয়েছে। সব কিছুর ভেতর তাই কলির উপস্থিতি দেখ। হয়তো পাণ্ডবদের গোটা রাজত্বকালই কলি-কবলিত। তোমার কথা হয়তো ঠিক। তাই বলে তো কলির ভয়ে হাত পা গুটিয়ে থাকব না। কলি বলে সত্যি কিছু আছে? তাকে ভয় পাওয়ারই বা কারণ কী? আমার তো মনে হয় কলি হল মনগড়া একটা আতঙ্ক।

মাদ্রবতী বিষণ্ণ হাসল। বলল, শিকার থেকে ভয় নিয়ে বাড়ি ফিরলে তুমি। নিজের অজান্তে অনেকগুলো ভয়ের শিকার হয়েছ।

এমন সময় জনমেনজয় বাবা বাবা বলে ডাকতে ডাকতে ঘরে ঢুকল। পরীক্ষিৎ দু'হাত বাড়িয়ে তাকে কোলে তুলে নিল। আদর করল, চুমু দিল। বলল, তোমার কী অভিযোগ আছে বাবা!

জনমেনজয় উৎসাহিত হয়ে বলল, কাল রাতে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নটার কোনো মাথামুণ্ডু নেই। তুমি শুনবে বাবা?

মাদ্রবতী থমথমে গলায় বলল, তোমার বাবাও স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে। কিন্তু তোমার স্বপ্নটা কী?

বেশ একটা মজার স্বপ্ন। একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। সেখানে একটা ভাঙাচোরা বাড়ি। চতুর্দিকে ইট-কাঠ ছড়িয়ে আছে। হঠাৎ দেখি ভগ্নস্তূপ থেকে বেরিয়ে এল একটা কীট। অমনি কে যেন কালো মেঘ সরিয়ে দিল। চাঁদের আলো পড়ল তার গায়। পোকাটা ঘুম থেকে জেগে উঠল। ডানা মেলে যেই উড়তে যাবে অমনি চাঁদ বলল, তুমি বুঝি উড়তে পার। ভালই হল। আমার একটা ছোট্ট কাজ করে দাও ভাই।

চাঁদের আন্তরিকতায় পোকাটি মুগ্ধ হয়ে গেল। বলল, কী কাজ করতে হবে?

চাঁদ বলল, তুমি যখন ডানা মেলে উড়বে সেই সময় আমার কাজটি করে দাও ভাই। ওই যে নদী বয়ে যাচ্ছে, ওর পাশে একটা সাজানো দেশ দেখতে পাবে। ওই দেশে সাদা-কালো মানুষের অভাব নেই। একদিন ওই অরণ্যে কালো মানুষ থাকত। হঠাৎ শ্বেতকায় লোভী মানুষ সেখানে পা রাখল। তারা অরণ্য পুড়িয়ে সাফ করল। বেরোনোর পথ না পেয়ে জীবজন্তুর সঙ্গে মানুষগুলোও অসহায়ভাবে মরল। ওদের বড় দুঃখ। ওখানে অনেক মানুষ যন্ত্রণায় বড় কষ্ট পাচ্ছে। তুমি ওদের কাছে উড়ে গিয়ে বল, তোমাদের দুঃখকষ্টে কাতর হয়ে চাঁদ এক বার্তা পাঠিয়েছে। মন দিয়ে শোন। চাঁদও মরে যায়, কিন্তু মরেও অন্ধকারের মধ্যে দারুণভাবে বেঁচে থাকে বলে শুক্লপক্ষে ফিরে আসে। চিরস্থায়ী আঁধার বা মরণ বলে কিছু নেই। সবই একটা সময়ের জন্য। তবে সকলে আন্তরিকভাবে চাইলে চাঁদের মত মরে গিয়ে আবার বেঁচে উঠতে পারে। আকাশের সব তারা যেমন থাকে দিনের গভীরে তেমনি তাদের তেজ, বিক্রমও থাকে প্রত্যেকের জাতিসত্তার গভীরে। কিছুই হারায় না।

পোকা সেই বার্তা নিয়ে আকাশে ডানা মেলে দিল। অমনি বন থেকে এক খরগোশ বেরিয়ে এল। বলল, ভাই পোকা, তোমাদের সব কথা শুনেছি। ছোট্ট ডানাদুটো দিয়ে অত পথ আমার মত তাড়াতাড়ি যেতে পারবে না। আমি বরং চাঁদের বার্তাটা পৌঁছে দিই। পোকা সাত-পাঁচ না ভেবে রাজি হয়ে গেল। তবু আদ্যোপান্ত খরগোশকে বুঝিয়ে দিয়ে সাবধান করে দিল। খরগোশ ঘাড় নেড়েই ছুটল। পল্লীর লোকজনকে জড়ো করে খরগোশ বলল, আমি চাঁদের কাছ থেকে আসছি। চাঁদ বলেছে সে যেমন মরে যায় তেমনি তোমরাও মরে যাও। মৃত্যুর পরে চাঁদের যেমন অন্ধকার ছাড়া কিছু থাকে না, তোমরাও মরে যাও, একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাও। হতাশার অন্ধকার ছাড়া তোমাদেরও কিছু নেই।

উল্টো কথা বলে খরগোশ চাঁদের কাছে গেল। চাঁদ তার কথা শুনে তো মারতে যায় তাকে। বলল, কী সর্বনাশ করেছ। যা বলেনি তাই বলে লোকের কাছে মিথ্যে সংবাদ পৌঁছে দিলে। খরগোশের বেয়াদপিতে চাঁদ রেগে গিয়ে একটা জ্বলন্ত পোড়া কাঠ ছুঁড়ে মারল তাকে। ওই কাঠ খরগোশের গায়ে না লেগে আমার গায়ে লাগল। অমনি দাউ দাউ করে আমার জামা-কাপড় জ্বলে উঠল। ঘুমের মধ্যে ভয় পেয়ে মা-

মা করে ডাকলাম। চোখ মেলে দেখি বিছানায় শুয়ে আছি। আগুন নেই কোথাও। আকাশ রাঙিয়ে ভোরের সূর্য উঠছে। তার নরম আলোয় আমার ঘর ভরে গেছে। খরগোশের কী হল জানি না। স্বপ্নটা ভারি অদ্ভুত, তাই না বাবা।

মাদ্রবতী মনোযোগ দিয়ে স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনল। অশুভ শঙ্কায় বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। বলল, স্বপ্নটা মোটেই ভাল নয়। মজারও নয়। মনে হচ্ছে, কোথায় একটা অশুভ কিছু হচ্ছে। এসব তারই সংকেত। এর প্রতিকারের জন্য ঘটা করে একটা যজ্ঞ করা দরকার।

আট

বিষাক্ত সন্দেহ নিয়ে শৃঙ্গি আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করল। ধ্যানস্থ পিতার গলদেশে ক্ষতবিক্ষত নিহত একটি সাপ ঝুলতে দেখেই বুঝল এই দুষ্কর্মের নায়ক মহারাজ পরীক্ষিৎ। কারণ, এ আশ্রম থেকে একটু আগেই তাকে যেতে দেখেছে সে। অথচ, কী আশ্চর্য, পিতা কেমন নির্বিকারভাবে ধ্যানে নিশ্চল হয়ে আছেন। তিনি হয়তো জানেনও না, কী ঘটে গেছে তাঁর জীবনে। রাগে, ক্ষোভে শৃঙ্গির ভেতরটা দপ করে জ্বলে উঠল। একটা ভয়ংকর কিছু করার সংকল্প নিল। কিন্তু সর্বাগ্রে দরকার মলিনতা থেকে পিতাকে পরিচ্ছন্ন করা। খুব সন্তর্পণে পিতার কণ্ঠদেশ থেকে সাপটি অপসারণের সময় উদ্‌গত কান্নায় তার চক্ষুদ্বয় প্লাবিত হল। পিতার মত এক সাধুব্যক্তির উপর নাগবিদ্বেষ চরিতার্থ করার জন্য রাজা হয়ে পরীক্ষিৎ যখন এমন জঘন্য কাজ করতে পারল তখনই ভাবনা হয়। হেনস্তা করার কোনো নিয়ম নেই। তবু পরীক্ষিৎ ধ্যানস্থ ঋষিকে যেভাবে নিগ্রহ করল তা সভ্যজগতের সব নিয়মকানুনকে লজ্জা দেয়। শৃঙ্গির দু'চোখের কোণে গভীর অপমানের ব্যথা নিবিড় হয়ে উঠল।

পরমতসহিষ্ণু, আপসকামী পিতার কোনো শত্রু থাকতে পারে মনে হয়নি শৃঙ্গির। বরং জেহাদি মানুষদের সঙ্গে পাণ্ডবদের নিরন্তর অবনিবনার রাজনীতিতে শমীকের একটা ভূমিকা ছিল আপস মীমাংসার। পরীক্ষিতের সেটা হয়তো অপছন্দ বলেই এমন করে হেনস্তা করল। রক্তের দাগ ঘষে তুলতে গিয়ে শমীকের ধ্যানভঙ্গ হল। দুচোখের তারায় তখনও তন্ময়তার ঘোর। ভাবাবেশে তাঁর মুখ থমথম করছিল। গলার স্বরে এক অনির্বচনীয় গাঢ়তা। পুত্র কী হয়েছে আমার? এমন করে গাত্র মার্জনা করছ কেন? বুকভাঙা কষ্ট ও ঘনঘন দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে আকুল করা কান্নায় তুমি ফোঁপাচ্ছ কেন?

বাবা, ধ্যান করার সময় তোমার মধ্যে কী আত্ম-টাত্মা কিছু থাকে না। দ্যাখ তো কত বড় একটা কাণ্ড হয়ে গেল, অথচ কোনো হুঁশ নেই তোমার। যে পাণ্ডবদের পক্ষ নিয়ে চিরকাল আমাদের বিপক্ষে কথা বলেছ, সেই পাণ্ডুবংশধর পরীক্ষিতের হাতে তোমার লাঞ্ছনার এ দৃশ্য দেখার আগে আমার মাথায় বজ্রপাত হল না কেন? ময়ূরের ঠোকরানো মৃত সাপটি তোমার গলায় হার করে পরিয়ে দিয়ে মহারাজ পরীক্ষিতকে বীরদর্পে ঘোড়া ছুটিয়ে আশ্রম থেকে যেতে দেখলাম। এর পরেও বলবে ওরা খাণ্ডববনের ভাল চায়। নাগবিদ্বেষের বিষ উগরে দিয়েছে তোমার সর্বশরীরে। তোমার অপমান খাণ্ডববনের

মানবকুলের অপমান। নাগজাতির প্রতি পাণ্ডবদের বৈরিতার যে অবসান হয়নি সেটাই মহারাজ পরীক্ষিৎ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেল।

পুত্র, কোথাও একটা মস্ত ভুল হয়েছে নিশ্চয়ই। স্বজ্ঞানে এমন জঘন্য কাজ কোনো নরাধমও করতে পারে না। অর্জুনের পৌত্র কখনও এত নির্দয়, অজ্ঞ, অমানুষ হতে পারে না। আশ্রম থেকে তাকে বেরিয়ে যেতে দেখেছ বলেই তো সন্দেহটা করছ। অন্য কেউও করতে পারে। যেমন ধর কোনো ক্ষুধার্ত শ্যেন পক্ষী আমাকে প্রস্তর মূর্তি ভেবে মৃত সাপটি দিয়ে তার দিনের ভোজ সারছিল। মহারাজকে দেখে ভয় পেয়ে উড়ে যাওয়ার সময় ওটিকে নিতে পারেনি এমনও হতে পারে।

পিতা, তোমার এই কষ্টকল্পনা যেমন অর্থহীন, পাণ্ডবদের প্রতি তোমার এত বড় বিশ্বাসও মূল্যহীন। কিন্তু তোমার অনুমান মিথ্যে হলে একপক্ষ কালের মধ্যে তাঁকে হত্যা করে অপমানের বদলা নেব। পৃথিবীর কোনো শক্তি পারবে না আমাদের নিরস্ত করতে! স্বর্গ-মর্ত-পাতালে যেখানেই লুকিয়ে থাকুন তাঁকে হত্যা করব। জনসমক্ষেই খালি হাতে হত্যা করব। এ আমার প্রতিজ্ঞা।

বিদ্যুৎ চমকের মত চমকালো শমীক। পুত্র, এ হল এক ভয়ংকর আত্মঘাতী শপথ। বিদ্বেষের বিষে জর্জরিত হয়ে নিজেকে নিঃশেষ করে কোন্ অমরার সন্ধান দেবে তুমি? কী পাবে সেখানে?

অদ্ভুত ভঙ্গি করে হাসল শৃঙ্গি। বলল, মানুষ চিরজীবী নয়। মানুষকে মরে অমর হতে হয়। শমীকের অমরত্বেই তার শ্রেষ্ঠত্ব। পিতা দেবতার অমৃত, মানুষের জীবনে হলাহল। আমি চাই না সেই অমরার অমৃত।

শৃঙ্গির অঙ্গীকার বাতাসের মত ছড়িয়ে গেল চতুর্দিকে। নিষাদপল্লী, পক্ষীবিহার, বানরকুঞ্জ, নাগপল্লীর গণ্ডি অতিক্রম করে খবরটা হস্তিনাপুরে সুউচ্চ প্রাচীরের বাধা পেরিয়ে রাজঅন্তঃপুরে পরীক্ষিতের কানে পৌঁছল। একপক্ষকাল সময়সীমার মধ্যে তাঁকে হত্যা করার যে ফরমান জারি হয়েছে না জেনেবুঝেই করা হয়েছে। ঐ সময়ের মধ্যে একটা বড় কিছু হওয়ার আশঙ্কা মাদ্রবতীকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখল। সর্বক্ষণ স্বামীর সঙ্গে থাকে। চোখে চোখে রাখে। ধর্মকথা শোনায়। কিন্তু কোনো ব্যক্তিগত কথা বলতে গেলে কান্না পায়, গলা ধরে যায়। চোখের কোণ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ে। যতদিন যায় আতঙ্ক, আশঙ্কা এবং উদ্বেগের পারদ চড়তে থাকে।

বিদ্রোহীদের শাসানিকে অবহেলা করল না মাদ্রবতী। শত্রুকে দুর্বল মনে করে তাকে উপেক্ষাও করল না। পাছে একপক্ষকালের মধ্যে রাজার জীবনহানি হওয়ার মত কোনো ঘটনা ঘটে সেজন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হল। রাজার নিরাপত্তা সুরক্ষিত করার জন্য ক্ষিপ্র আক্রমণে তৎপর এবং অতর্কিত আক্রমণে দক্ষ এমন বাছা বাছা বীরসৈনিকদের নিয়ে রাজার দেহরক্ষীবাহিনী গঠিত হল। রাজার শয়নকক্ষও অরক্ষিত

থাকল না। নিরাপত্তার কারণে পরীক্ষিতের চলাফেরার স্বাধীনতার ওপর নিয়ন্ত্রণ কঠোর হল। কার্যত, নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে বন্দীর মত জীবনযাপন করতে লাগল।

ভীরু কাপুরুষের মত প্রাণরক্ষার এই ব্যবস্থাপনায় পরীক্ষিৎ রীতিমত অসন্তুষ্ট এবং বিরক্ত। মাদ্রবতীর সঙ্গে এ নিয়েই তার বিরোধ বাধল। বলল, তুমি কী ভাব বলতো? এই ঘেরাটোপের মধ্যে থাকতে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি।

মাদ্রবতী বিপন্ন গলায় বলল : মাত্র তো কটা দিনের জন্য। সামান্য দিন আর বাকি। এই কটা দিন একটু মানিয়ে নাও লক্ষ্মীসোনা।

অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে পরীক্ষিৎ বলল, মানাতে গিয়ে রোজ কত কী হারাতে হচ্ছে জান? দেশের মানুষ বলতে আরম্ভ করেছে বীর অভিমন্যু এক ভীরু কাপুরুষ পুত্রের জন্ম দিয়েছে। বীর অভিমন্যু মৃত্যু পরোয়া না করে সপ্তরথীর সঙ্গে একা বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে মৃত্যুকে জয় করেছে। মৃত্যুর মূল্যে বীর অমরত্বলাভ করে। তার অমূল্য আত্মদানের গৌরব, মহিমা কোনোদিন ফুরোয় না। সিংহের গুহায় এ কোন শৃগালের প্রবেশ। এইসব হীন বাক্যে আমার অন্তর বিদীর্ণ হচ্ছে।

স্বামী, শত্রুর প্ররোচনার ফাঁদে পা দিতে নেই। ওরা পরিকল্পিত উপায়ে ক্রুদ্ধ করে তোমার নিরাপত্তার বিঘ্ন ঘটাতে চায়। যারা এসব করছে তারা কেউ তোমার বন্ধু নয়। বারবার বলছি, কোনো মিথ্যে প্ররোচনায় উত্তেজিত হয়ে নিজের অমঙ্গল ডেকে এন না। তোমার কিছু হলে জনমেনজয় তার পিতাকে হারাবে, আমি হারাব স্বামীকে। আর তো কটা দিন। নিন্দে যা হওয়ার তা তো হয়ে গেছে। তুমি চাইলেও ওই অপবাদ একদিনে ঘুচবে না।

অপবাদ মিথ্যে করার জন্য নিরাপত্তার ব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসা খুব জরুরি। একটা মিথ্যে প্রাণহরণের হুমকির ভয়কে আঁকড়ে ধরে বিদ্রোহীদের কাছে আত্মসমর্পণ করা এবং তাদের কার্যকলাপকে প্রশ্রয় দেওয়ার ঘোরতর বিপক্ষে আমি। একটা অন্যায়কে মেনে নিয়ে আরো হাজার অন্যায়ের পথ খুলে দেওয়ার মত নিবুর্দ্ধিতার কাজ কোর না। মনের অভ্যন্তরে একবার ভয় বাসা বাঁধলে ভয়ের ভূত ঘাড়ে চেপে বসবে। ঘাড় মটকে রক্ত শুষে খাবে।

মাদ্রবতীর দুচোখের তারায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। বলল, তোমাকে বলেছে।

এককালে পাণ্ডবসখা কৃষ্ণ, কংসের মত মহাবীরকে এতই আতঙ্কে রেখেছিল যে নিজেকে প্রতিরোধ করার শক্তি পর্যন্ত তার ছিল না। কৃষ্ণের মুখোমুখি হতেই সব শক্তি হারিয়ে ফেলল। কৃষ্ণের জন্মক্ষণে কংস শুনেছিল 'তোমাকে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।' কংসের সব গোলমাল হয়ে গেল। গোকুলের কৃষ্ণ হল তার সেই ভয়ের ভূত। তাকে দেখেই কংস তাই আঁতকে উঠেছিল। আত্মরক্ষার জন্য সামান্য প্রতিরোধটুকুও করতে পারল না সে। মহাবীর কর্ণের অন্তরে পরশুরামের অভিশাপবাণী মনের গহনে যে সংশয়ের বীজ বুনেছিল তা যে কখন মহীরুহ হয়ে মনের ভেতর ডাল-পালা মেলে দিয়েছিল কর্ণ তা টের পায়নি। যুদ্ধের প্রাক্কালে কৃষ্ণের মুখে গোপন জন্মবৃত্তান্ত শোনার

পরেই কর্ণ মনে মনে ভীষণ দুর্বল হয়ে গেল। পুত্রের দাবি নিয়ে জননী কুন্তী ভাইদের প্রাণভিক্ষা চাইল তখন আত্মরক্ষার সব শক্তি ও ইচ্ছে কর্পূরের মত উবে গেল। হলও তাই। সুতরাং শৃঙ্গিকে ভয় পেতেই হয়।

ভয় পাওয়া সহজ, কিন্তু ভয় জয় করা তার চেয়ে কঠিন। তাই পাল্টা আতঙ্ক সৃষ্টি হলে ভয় থাকে না। শৃঙ্গির অন্তরে আতঙ্ক সঞ্চার করতে চাই।

প্রত্যুত্তরে মাদ্রবতী বলল, কংসও বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু নিজেই বীভৎস মৃত্যুর শিকার হল। তাই বলছি, ভুল করলে তার মূল্য দিতে হয়।

পরীক্ষিত বলল, এভাবে ভূতের বোঝা টানার মানে হয়?

আমার ভয় তো সেখানে। শৃঙ্গি একা নয়, তক্ষক তাকে মদত দিচ্ছে। হুমকি দিচ্ছে অনবরত। সময়সীমার মধ্যেই আত্মঘাতী বাহিনীর হাতে — বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলল মাদ্রবতী।

এরপরেও চুপ করে থাকতে বলবে? রেখে ঢেকে কিছুই বলছে না। পরীক্ষিৎ যেখানে থাকুক হত্যা তাকে করবেই। যদি রসাতলে লুকিয়ে থাকে সেখান থেকে তুলে এনে দিনের আলোয় হত্যা করবে। তার অঙ্গীকার যদি সত্যি হয় তাহলে নিরাপত্তার এই ঘেরাটোপ তো একটা ফক্কা বন্ধন ছাড়া কিছু নয়। অসৎ-এর ছলের অভাব হয় না। কঠোর নিরাপত্তা সত্ত্বেও প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে কৃষ্ণ ও মধ্যম পাণ্ডব ভীম জরাসন্ধের অন্তঃপুরে ঢুকে হত্যা করেছিল তাকে। কৃষ্ণ, মধ্যম পাণ্ডব এবং শৃঙ্গি-তক্ষকের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এদের অঙ্গীকারের কাছে জরাসন্ধের মত আমিও সমান অসহায় এবং বিপন্ন। বীর অভিমন্যুর পুত্র অভিমন্যুর মতই মরণকে নির্ভয়ে আলিঙ্গন করবে, এটাই তো হওয়া উচিত।

মাদ্রবতী পরীক্ষিতের মুখে হাত চাপা দিল। বলল, চুপ কর। হঠকারিতা কোর না। বেঁচে থাকার জন্য জীবমাত্র লড়াই করছে। প্রতিরোধ করা জীবনের ধর্ম। যেভাবেই হোক, নিজেকে বাঁচানোর মধ্যে অশোভন কিছু নেই। শান্ত হয়ে থাক। উত্তেজনায় মানুষ বুদ্ধিভ্রংশ হয়। সেটাই হল শত্রুর প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা গ্রহণের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত। শত্রুরা বুঝে ফেলেছে, তোমার চিত্ত দোলাচল। ওরা সেই সুযোগ নেওয়ার জন্য অনেক কিছু করবে। ওদের প্ররোচনায় পা দিয়ে আমায় অনাথ করে দিও না। জনমেনজয়ের বাবা বলে ডাকার তৃপ্তিটুকু কেড়ে নিও না। মাদ্রবতীর কণ্ঠস্বর স্খলিত এবং ভেজা। উদ্গত কান্নায় ভেঙে পড়ল পরীক্ষিতের বুকের ওপর।

একটা একটা করে দিন চলে গেল। শৃঙ্গি দুশ্চিন্তায় পড়ল। নিরাপত্তার বলয় ভেদ করে পরীক্ষিতের কাছে পৌঁছনো দুরূহ হল। পরীক্ষিৎকে রাজপ্রাসাদের বাইরে যেতে দেওয়া হয় না। অন্তঃপুরেও দেহরক্ষীরা তাঁর সঙ্গে ছায়ার মত লেপ্টে থাকে।

দশদিন হল সূর্যের মুখ দেখেনি পরীক্ষিৎ। প্রহরীবেষ্টিত একটি কক্ষেই সারাক্ষণ থাকে। এমন কি কক্ষের জানলা পর্যন্ত খোলা থাকে না। থাকলেও সেখানে প্রহরী মোতায়েন

থাকে। পরীক্ষিতের ব্যক্তিগত জীবনটাই হারিয়ে গেছে। বৃহৎ পৃথিবীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। বাইরের কোনো ব্যক্তিকেই তার সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয় না। কেবল অমাত্যপ্রধান, নগরপাল, রাজপুরোহিত এবং কয়েকজন বিশ্বস্ত পরিচারিকা ছাড়া আর কারো প্রবেশের অনুমতি নেই। তাও সর্বাঙ্গ তল্লাস করে ঘরের পর ঘর পার হয়ে তবেই পরীক্ষিতের সঙ্গে সাক্ষাতের ছাড়পত্র মেলে।

হুমকি দেওয়ার সময় শৃঙ্গির মাথায় এতটা কড়া নিরাপত্তার চিন্তা ছিল না। ফলে, সে অত্যন্ত বিমর্ষ এবং হতাশ হয়ে পড়ল। ভারাক্রান্ত গলায় শৃঙ্গি বলল, বন্ধুবর তক্ষক! বোধ হয়, নিজের কাছে নিজেই হেরে যাচ্ছি। আমাদের হুমকির বিরুদ্ধে রাজার আত্মরক্ষার প্রতিরোধ বোধ হয় ব্যর্থ করে দেবে আমাদের সংকল্প। তাহলে সকলের কাছে ছোট হয়ে যাব। হেরে যাওয়ার এই অপমান আমার সব উদ্যমকে কুরে কুরে খাচ্ছে। এখনও পর্যন্ত আমরা কিছু করতে পারেনি। শুধু সুযোগ খুঁজছি। কিন্তু কতখানি সম্ভব হবে জানি না।

তক্ষক শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, এখনও সময় আছে। ভেঙে পড়ার মত কিছু হয়নি। মিথ্যে আত্মপীড়ন করে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছ। হঠকারিতা করার অনেক সময় পাবে। সময়সীমার শেষক্ষণ পর্যন্ত তোমার হতাশ হওয়ার কিছু নেই। শেষমেশ একটা কিছু তো করবই। কালক্ষয়ের সঙ্গে অনেক কিছু বদলে যায়। সময়ের সমুদ্র পেরিয়ে কে যে কখন কোন তীরে পৌঁছবে তা কোনো মানুষেরই জানা থাকে না। বরং যতদিন যাচ্ছে আশায়-নিরাশায়, হতাশায় উদ্বিগ্ন-উৎকণ্ঠায় এবং কৌতূহলে, উত্তেজনায় তার পারদ চড়তে থাকে। টানটান উত্তেজনারও একটা মেয়াদ আছে। সে মেয়াদ ফুরলো বলে। তোমার উদ্বেগের কোনো কারণ নেই।

শৃঙ্গির মনে তক্ষকের কথাগুলো গেঁথে গেল। স্তব্ধ বিস্ময়ে প্রত্যয়ভরা চোখে তার দিকে চেয়ে রইল। তক্ষক এক আশ্চর্য মানুষ। একটি উড়ন্ত উল্কা। অনির্বাণ অগ্নিশিখার মত জ্বলছে তার ভেতরটা। এত তার ঔজ্জ্বল্য যে কেউ তা থেকে আত্মদীপ জ্বালিয়ে নিতে পারে। ভেতরে যার অমন আগুন বাইরেটা তার তুহিনের মত শীতল। ব্যক্তিত্বের একটা আলাদা গন্ধ থাকে। হাসুহানার ফুলের মত তার সৌরভ। অল্পক্ষণের মধ্যে এত কথা মনে পড়ল শৃঙ্গির। আত্মগতভাবে বলল, আমার জীবনে তুমি সবচেয়ে এক আশ্চর্য ব্যক্তি। তোমার প্রজ্ঞাদৃষ্টির ওপর নির্ভর করতে পারি।

চতুর্দশ দিনও নির্বিঘ্নে ভোর হল। কোনো কিছু ঘটল না। সন্দেহবশে একজনও ধরা পড়ল না। বিপদ কেটে গেছে ভেবে সবাই নিশ্চিন্ত হল। সুতরাং বিপদসীমার শেষ দিনে যে আর কোনো বিপদ হবে না এ বিষয়ে পরীক্ষিৎ থেকে নগরপাল পর্যন্ত একমত হল সকলে।

পরীক্ষিৎকে বেশ নিরুদ্বিগ্ন ও প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। মাদ্রবতীকে বলল, আমার কথা

সত্যি হল তো। আমি তো জানতাম এটা ফাঁকা আওয়াজ। ওদের হুমকিতে আমার এত ভয় পাওয়া ঠিক হয়নি।

মাদ্রবতী বলল : সাবধান হওয়া ভাল। এখন কত স্বস্তি বোধ করছ বল তো। যদি কোনো অঘটন কিছু হত তাহলে তোমার কথা শোনার জন্য দোষী হতাম আমি। তখন নিজেকে কী ক্ষমা করতে পারতাম? এখন যারা স্বস্তিতে নিশ্বাস ফেলছে, চোদ্দ দিন ধরে তারা হাসতে এবং কথা বলতে ভুলে গেছিল। বুঝলে মশাই। তোমার বুদ্ধির আর তারিফ কোর না।

পরীক্ষিৎ হেসে বলল, তা না হয় করলাম না। কিন্তু এভাবে লুকিয়ে থাকার জন্য যে অপযশ হল তার খেসারত তো আমাকেই দিতে হবে। যাক্ এখন তো বিপন্মুক্ত। আজকের নিরাপত্তা একটু শিথিল করে দিলে যারা দর্শনপ্রার্থী তাদের একটু দর্শন দিতে পারি।

মাদ্রবতী তৎক্ষণাৎ নাকচ করে দিয়ে বলল, তা হয় না।

যে সব ব্রাহ্মণ, মুনি, ঋষি আমার দীর্ঘজীবন, সুস্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা কামনা করে প্রসাদী ফুল এবং ফল নিযে এসেছে অন্তত তাঁদের ফিরিয়ে দিও না। এদের কাছে বিপদের কোনো সম্ভাবনা নেই। অবশ্যই তাঁদের দেহ এবং উপহার দ্রব্য তল্লাশি করে যদি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দাও তাহলে একটু তৃপ্তি পাই।

মাদ্রবতী রাজি হয়ে গেল। বলল, তাই হবে। নিরাপত্তারক্ষীর প্রধানকে ডেকে তুমিই নির্দেশটা দাও। সত্যিই কী ভালোই না লাগছে। নীল আকাশ আলোয় হাসছে। ঝরা বকুলে ছেয়ে গেছে পথ। গাছের ডালে ডালে বুলবুলির শিস্, কোকিলের ডাক, দোয়েলের নাচ। ধরণীও খুশি হয়ে উঠেছে। সর্বত্র একটা পরম সুখের ভাব। এক অভূতপূর্ব আনন্দে আমার ভেতরটা টইটম্বুর হয়ে যাচ্ছে। এভাবে দিনটা গড়িয়ে রাত নামুক তাড়াতাড়ি। তারপর সব উৎকণ্ঠার অবসান।

পরীক্ষিতের ইচ্ছেটা বাতাসের মত চারিয়ে গেল চৌদিকে। তক্ষকের কানেও পৌছল। এরকম একটা সময়ের প্রতীক্ষায় ছিল। এমনটা হয় বলেই শৃঙ্গিকে বলেছিল হতাশ হতে নেই। পনেরো দিনের মাথায় এসে রাজার মনে বিশ্বাস জন্মাল হুমকিটা নিছকই একটা ফাঁকা আওয়াজ। তাই শিথিল হয়েছে শেষদিনের নিয়মকানুন। তক্ষক নিজের মনে হাসল। পরীক্ষিতের নিয়তিই নিরাপত্তার শৈথিল্যের রন্ধ্রপথ ধরে তার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করতে এগিয়ে আসছে। তক্ষক শুধু উপলক্ষ।

পনেরোটা দিন এক দারুণ দুশ্চিন্তার মধ্যে কাটল তক্ষকের। শৃঙ্গিকে যে আশ্বাসই দিক পরিণতির কথা চিন্তা করে মনে মনে শঙ্কিত হত সে। দিন যত যাচ্ছিল ততই উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠায় হচ্ছিল সে দিশাহারা। কিন্তু ভিতরের দুরন্ত অস্থিরতার কোনো প্রকাশই ছিল না বাইরে। তাকে নিরুদ্বিগ্ন এবং নিশ্চিন্ত থাকতে দেখে শৃঙ্গিরই রাগ হত। অপমানে অনুশোচনায় কাতর হয়ে বলত, দম্ভ করে একপক্ষকাল সময়সীমার মধ্যে হত্যা করার কথা বলা সহজ, কিন্তু বাস্তবে কাজটা কত কঠিন এবং দুরূহ সেটা না বোঝার জন্য আপসোস হয়। আসলে, তুমি পাশে দাঁড়ানোর জন্যই আমার এত স্পর্ধা।

তক্ষকের অধরে হাসি, চোখে কৌতুক। বলল : আর কিছু বলবে?

হ্যাঁ, একটা করে দিন গেছে আর তুমি শুনিয়েছ শত্রুকে শত্রুতার মধ্যে রাখলে তার জীবনীশক্তি ক্ষয় হয়। তুমি বলেছ নীরবতাও তীক্ষ্ণ অস্ত্রের মত শত্রুর প্রাণহানির বার্তা বহন করে আনে। তাই কোনোবকম উত্তেজিত কিংবা অসহিষ্ণু হওয়া চলবে না। এ এক অদ্ভুত সংগ্রাম। ধৈর্য ধরে থাকলে আমরাই জিতব। চোদ্দটা দিন চলে গেল। অথচ, কিছুই করা হল না। এরপরেও আমরা জিতব? চোদ্দ দিনে যা পারিনি তা বাকি কয়েক প্রহরের মধ্যে কেমন করে করবে?

তক্ষকের অধরে ধূর্ত হাসি। চোখের চাহনিতে হিংসা জ্বলজ্বল করছিল। মুখের পেশীতেও কাঠিন্য। বলল, আমার ওপর বিশ্বাস রাখ। দম্ভ করে তুমি যা অঙ্গীকার করেছ তা হবেই। শুধু ধৈর্য ধর।

আজই সময়সীমার শেষ দিন।

কিন্তু দিন তো শেষ হয়নি। সূর্যোদয় হয়েছে এইমাত্র। সূর্যাস্ত হতে এখনও অনেক দেরি।

আমি যে শান্ত থাকতে পারছি না। ব্যর্থ হলে সব হারাব। সবার চোখে বড় ছোট হয়ে যাব। সবদিক না খতিয়ে অল্প সময়সীমার মধ্যে পিতার অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার অহঙ্কার করে ভুল করেছি। কী যে হবে?

তুমি উতলা হচ্ছ কেন? কেন বোঝ না, ঠিক সময়ে ঠিক সিদ্ধান্ত না নিলে কাজ পণ্ড হয়।

তবে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় হয়নি এখনও?

হয়েছে।

সিদ্ধান্তটা জানতে পারি?

তক্ষকের চোখমুখের প্রসন্নভাব সহসা অন্তর্হিত হল। বরফের মত ঠাণ্ডা গলায় বল, না।

চমকানো বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল শৃঙ্গি। ফ্যালফ্যাল করে তার মুখের দিকে চেয়ে বলল, আমাকে অবিশ্বাস করছ? বন্ধুত্বে বিশ্বাস হারিয়েছ। আমাকে সন্দেহ করা যায়?

তক্ষকের কণ্ঠস্বর সহসা কোমল হল। বলল, বিশ্বাস, অবিশ্বাস, সন্দেহ এসব প্রশ্ন করে সম্পর্কটা তুমিই জটিল করে তুলছ। সংকটের সময় কোনো অভিমান সাজে না। নেতৃত্বের ওপর বিশ্বাস রাখাই নিয়ম। কারণ, কোনো সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত কিংবা অপরিবর্তিত নয়। অবস্থা বুঝে কৌশল পাল্টাতে হয় এবং হবেও। ঈশ্বর বিমুখ না হলে তোমার জয় অবশ্যম্ভাবী।

প্রথম দিন থেকে শুনে আসছি।

শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শুনবে।

শৃঙ্গি কথা না বাড়িয়ে নিঃশব্দে প্রস্থান করল।

চোদ্দদিন গৃহবন্দী থাকার পর মায়াবন্ধনহীন সাধুদের নির্লোভ ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যলাভ করে মনটা প্রফুল্লিত হল পরীক্ষিতের। এঁদের সহাস্য নির্মল চরিত্রের সান্নিধ্যে মনটা স্নিগ্ধ হল। মনটা শান্ত হয় শান্তি পায়। তাঁদের কথা, গলার স্বর কানের ভেতর, বুকের ভেতব তারার মত স্পন্দিত হতে থাকল দীর্ঘক্ষণ। তাঁদের শুভেচ্ছা পরীক্ষিতের চোদ্দদিনের উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠার ক্লান্তি ও কষ্ট ভুলিয়ে দিল। নতুন করে প্রাণ পেল। মৃত্যুর আতঙ্কে শুকিয়ে যাওয়া জীবনের ডাল-পালায় নতুন করে কিশলয় উদ্গম হয়।

অন্তঃকরণের মধ্যে রোমহর্ষ রহস্যময় আনন্দের যে অনুভূতি হল তার এক নাছোড় রহস্যময় আকর্ষণে দিনটা যে কোথা থেকে কিভাবে গড়িয়ে গেল তা টেব পেল না পরীক্ষিৎ। সূর্যের আলো নিষ্প্রভ ম্লান হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটল। সেই মুহূর্তে মনের গহন থেকে কে যেন চুপিচুপি ফিসফিস করে বলল, তোমার জীবনে এখনও অভিশাপের খাঁড়া ঝুলছে। এখনও দিনান্ত হতে সামান্য সময় বাকি। ভয় কেটে গেছে মনে হতে পারে, কিন্তু আশঙ্কা নির্মূল হয়নি।

পরীক্ষিৎ একটু দিশাহারা বোধ করল। নিজেকে প্রবোধ দিযে বলল : এখনও সন্দেহ। দুর্বল হৃদয় যুক্তিব কী বোঝে? সন্দেহে, সংশয়ে তুমি শুধু আকুল করে রাখ। তোমার সন্দেহের কোনো মানে হয় না। সাবধানী হওয়া ভাল. কিন্তু বাড়াবাড়ি করাও বিপজ্জনক। আর তো মাত্র কিছুক্ষণ অপেক্ষা। সূর্য ডুবলেই সমযসীমা শেষ। তাবপর ঘন অন্ধকারে ডুবে যাবে খাণ্ডববন।

তবু সাবধানী মন সসংকোচে বলল · আব কোনো বাধা নেই। তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু তক্ষক। আত্মঘাতী বাহিনীব চাবি তো তার হাতে। রাতটা তো দিনের হিসেবের বাইরে নয়।

পরীক্ষিতের অন্তরটা সন্দেহে দুলে উঠল। চুপ করে কয়েকটা মুহূর্ত ভাবল, তারপর নিজের মনকে উদ্দেশ করে বলল : ভয় তোমাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। বাইরে থেকে তোমায় যতটা উদাসীন মনে হয় তুমি তা নও। সারাদিন ধরে মহাত্মাদের মধুর সান্নিধ্যে তুমিও মহাত্মা হয়ে গেছ। আর মাত্র দু'জন দর্শনার্থী ব্রাহ্মণ বাকি। তুমি বাবু এই সুখানুভূতিকে কাঁটা বিঁধিয়ে রক্তাক্ত করে দিও না।

পরীক্ষিৎ নিজের মনে হাসল। এখনও কূট সন্দেহে, ভয়ে এবং উদ্বেগে তার মন আচ্ছন্ন। আশঙ্কায় এখনও ছিন্নভিন্ন হচ্ছে। ভেতরে তার রক্তক্ষরণ হচ্ছে সমানে। হয়তো এ তারই গভীর অভ্যন্তরের আতঙ্ক আশঙ্কার কথা মস্তিষ্কের মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছিল কাল্পনিক সংলাপ হয়ে।

বাইরে বসন্তের ঝিমঝিম করা রোদে ভরা দুপুর। ঝকঝকে রোদে ব্রাহ্মণ এবং পুরোহিত দর্শনার্থীরা রাজা পরীক্ষিৎকে দর্শন করার জন্য সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শিখাধারী মুণ্ডিত মস্তকে বিপ্রবেশে তক্ষক সারির শেষে দাঁড়াল। পাছে নিরাপত্তার বিঘ্ন

হয় সেজন্য শুভানুধ্যায়ী সাধুসন্তদের একজন একজন করে রাজাকে দর্শন করছিল। সাধু হলেও তাদের দেহ তল্লাসী করে এবং সাক্ষাতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে তবেই রাজদর্শনে অনুমতি দেওয়া হচ্ছিল। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহতল্লাশিতে ভাঁটা পড়ল। সবশেষে রাজদর্শনের সুবিধা হল বেশিক্ষণ ধরে রাজার কাছে থাকতে পাওয়া।

তক্ষক লক্ষ্য করল তার আগের বিপ্রকে কোনোরকম তল্লাশ না করেই যেতে দেওয়া হল। এবার তার পালা।

দিনান্তের আলোর ঔজ্জ্বল্য হ্রাস পেয়েছে। চারদিকে ম্লান আলো এক রহস্যময় কুহেলিকার মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। দরজার এক কোণে এক ক্ষুদ্র মাকড়সা অদ্ভুত দ্রুততায় এক জাল বুনছিল। গোধূলির রঙ লেগেছে আকাশের গায়। গোঠে ফেরার রাখালি বাঁশির সুর বহুদূর থেকে ভেসে আসছে। সুর তো নয় যেন এক বিষধর ফণা তুলে ফোঁস ফোঁস করছিল। মনে হল, পশ্চিম আকাশের একফালি অস্তগামী সূর্যের রাঙা আলো পড়ে রাজার পা দু'খানি কেউ লাল রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে যেন। প্রহরীর ডাকে চমকাল তক্ষক। অন্যমনস্কতার জগৎ থেকে বাস্তবে প্রত্যাবর্তন করল। বাজদর্শনে যাওয়ার অনুমতি হল তক্ষকের। প্রহরীদের কিছু বলার আগে তক্ষক তার কাঁধের ঝোলাটা প্রহরীদের দেখিয়ে বলল : প্রসাদী ফুল আর ফল। রাজাকে দেব। প্রহরী হাত নেড়ে রাজদর্শনে যেতে বলল তাকে।

পরীক্ষিতের সামনে একজন অত্যন্ত নিরীহ ব্যক্তির মত এসে দাঁড়াল বিপ্রবেশী তক্ষক। অমনি আকাশজোড়া বিদ্যুৎ চমকের মত চমকিত হতে লাগল তক্ষকের ভেতরটা। বুকটা তার ধক্ করে উঠল। দুরন্ত উত্তেজনায় গলাটা শুকিয়ে আসছিল। জিভটা ভিতর দিকে টানছিল। নিজেকে নিরুচ্চারে প্রশ্ন করল, তার এই অবস্থাকে কি বলবে? ভয়, না আনন্দের অনুভূতি? কিন্তু এরকম হলে তো চলবে না। তাকে অনেক সংযত এবং শান্ত থাকতে হবে। কিন্তু পারছে কই? ঝড়ের মুখে একটা ছোট্ট বিপন্ন পাতার মত তিরতির করে কাঁপছিল ভিতরটা।

তক্ষক পরীক্ষিতের খুব কাছে দাঁড়াল। বলল, মহারাজ, আপনাকে দর্শন করে বড় তৃপ্ত হলাম। কী দুর্ভাবনায় না কেটেছে পনেরোটা দিন। রোজ ঈশ্বরকে অর্চনা করার সময় একটা ফুল আর ফল উৎসর্গ করতাম। মনে মনে বলতাম, হে ঈশ্বর আমাদের মহান রাজাকে রক্ষা কর। আমার খুব ইচ্ছে এ ফলগুলি আহার করে আপনি দিনের উপবাস ভঙ্গ করুন।

শ্বেতপাথরের থালায় একটি একটি করে আস্ত ফলগুলি সাজিয়ে দিল। ফলপূর্ণ থালাটি পরীক্ষিতের হাতে তুলে দেবার সময় তার চোখের কোণ থেকে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ল। বিপ্রের দীনভাব, নম্র আচরণ, অসাধারণ ভক্তি ও শ্রদ্ধায় মুগ্ধ হয়ে ফলগুলো পরীক্ষিত গ্রহণ করল। সুপক্ক প্রতিটি ফল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পর্যবেক্ষণ করল। অধর কোণে এক দুর্জ্ঞেয় হাসি ফুটে উঠল তার। বলল, জান বিপ্র, এক মূর্খের প্রতিজ্ঞায় মিথ্যে ভয় পেয়ে জীবনের পনেরোটা দিন অপচয় করছি। হয়তো জীবনের মোট আয়ু থেকে পনেরোটা বছর কমে গেল।

বিপ্রবেশী তক্ষক বলল, মহারাজ, ওসব নিয়ে মন খারাপ করবেন না। সুপুষ্ট এই ফলের মিষ্টি ঘ্রাণ আপনাকে নতুন করে প্রাণ দেবে।

অবিশ্বাসের চোখে তাকাল পরীক্ষিৎ। কারণ দানগ্রহণ করা তার মানা। বিষের সন্দেহে ফল পর্যন্ত দাঁতে কাটা নিষেধ। বিপ্রবেশী তক্ষক তা জানত। পরীক্ষিতের সন্দেহের ওপর চোখ রেখে তক্ষক বলল, মহারাজ শুধু ঘ্রাণেই সারাক্ষণের ক্লান্তি কেটে যায়। শরীর মন চাঙা হয়। এই ফলের সুগন্ধে মন অল্পেই প্রফুল্লিত হয়।

বিপ্রের কথায় বিশ্বাস করে পরীক্ষিৎ ফলের ঘ্রাণ নিল। একবার নয় বারবার। বুক ভরে যতটা পারে শ্বাস নিল। এক অদ্ভুত মিষ্টি গন্ধের নেশায় ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার চেতনা। কেমন একটা গভীর ঘুমের মধ্যে পরীক্ষিৎ একটু একটু করে তলিয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে তার চেতনা লুপ্ত হল। দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁট বজ্রের মত এঁটে থেকে সিংহাসনের ওপর ঢলে পড়ল।

কালক্ষয় না করে তক্ষক লুকোনো ছুরি বার করল। পরীক্ষিতের হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে ছুরিটি আমূল গেঁথে দিতে গিয়ে থমকে গেল। স্থির মাথায় ভাবল। ছুরি বসানো মানে অহেতু অনেক সমস্যা সৃষ্টি করা। কণ্ঠ থেকে একটা সচকিত আর্তচিৎকার এবং যন্ত্রণার কাতরানি শুনে প্রহরীরা তেড়ে আসবে। পালানোর পথ বন্ধ হবে। তার চেয়ে কণ্ঠরোধ করে হত্যা করলে কেউ জানতে পারবে না। একটু হাত-পা ছুড়বে, তারপর সব থেমে যাবে। প্রহরীদের টের পাওয়ার আগে রাজপ্রাসাদের বাইরে চলে যাবে। অমনি দু'খানি হাত সাঁড়াশির মত অচেতন পরীক্ষিতের কণ্ঠনালি আঁকড়ে ধরল। সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে তার কণ্ঠরোধ করল।

কার্য সমাধা করে তক্ষক বেরিয়ে এল। সে ছিল সম্পূর্ণ শান্ত এবং নির্বিকার। প্রহরীদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হাঁটছিল। মুখে তার তৃপ্তির হাসি। সাফল্যের হাসি।

নয়

রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে খাণ্ডববন নিস্তব্ধ হয়ে যায়। পথঘাটও নির্জন হয়ে যায়। হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের ভয়ে প্রয়োজন ছাড়া পথে লোক চলাচল করে না। বড় রাস্তার ধারে কিছু কিছু পল্লী চোখে পড়ে। কিন্তু তারা এত দরিদ্র যে কোথায় কী হচ্ছে তার খোঁজ রাখে না। রাত পোহালে কী করে উদর পূর্তির খোরাক জোগাবে তার কথাই চিন্তা করে। উর্ধ্বশ্বাসে কে যেন চলে গেল। রাতের অন্ধকারে ভাল করে দেখতে পেল না তাকে। তবে রাত নামলে রোজই এমন কত লোক দৌড়ে যায়।

তক্ষক যে এপথে গেছে কেউ জানে না। তক্ষককে তাই ভাল করে জানে না তারা। ঘোড়ায় করে এই পথে যেতে যেতে শৃঙ্গি কুটিরের সামনে দাঁড়াল। চুন্নু চুন্নু করে ডাকল। বেশ কয়েকবার ডাকার পরে একজন জোয়ান ছেলে বেরিয়ে এল। শৃঙ্গি জিগ্যেস করল, হাঁরে এপথে কাউকে যেতে দেখেছ?

থমধরা বিস্ময়ে চুন্নু শৃঙ্গির দিকে তাকিয়ে রইল। বলল, অনেক লোকই তো হন্‌হন্ করে যায়। রাত হলে জন্তু-জানোয়ারের ভয়ে লোকে তো আর হাঁটে না, দৌড়য়। একটু

আগে একজন দৌড়ে গেল বটে। কিন্তু কে গেল অন্ধকারে ঠাওর করতে পারিনি। তবে জোরে জোরে পা ফেলে গোটা পথটাকে বীরদর্পে দাপিয়ে গেল একজন। একটা মানুষের মত মানুষ যে হেঁটে গেল পায়ের শব্দ তা জানিয়ে দিল।

শৃঙ্গি সাগ্রহে বলল, হাঁ, লোকটা অমন করে হাঁটে। পরনের পোশাকের রঙটা কী দেখেছ?

চুন্নু অসহায়ের মত মাথা নাড়ল। নিজের মনেই শৃঙ্গি বলল, এই পথেই গেছে তাহলে। কালক্ষয় না করে অন্ধকারের মধ্যে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল শৃঙ্গি। চিৎকার করে ডাকল, তক্ষক। তার হাঁকে বনভূমি কেঁপে উঠল। এক ঝাঁক পাখি ভয় পেয়ে ঝটপট করতে করতে অন্ধকারের মধ্যে উড়ে গেল অন্য কোনো আস্তানায়। তার জন্য খুব চিন্তা হল। মান-অভিমান নিয়ে সকালে দু'জন ভালবাসার ঝগড়া করেছিল, এখন কিন্তু তার কোনো রাগ নেই। বরং এক উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠায় কাতর।

ছুটন্ত অশ্বের পিছনে হঠাৎ লাফিয়ে উঠল তক্ষক। আর তাতেই শৃঙ্গির পড়ে যাওয়ার মত অবস্থা হল। তক্ষকই সামলাল তাকে। উৎফুল্ল হয়ে শৃঙ্গি বলল, বন্ধু!

তোমার বন্ধু মরেনি, হেরেও যায়নি। আবার ধরা পড়ে বিপদ বাড়ায়নি। বলেছিলাম ভরসা হারাতে নেই। ভরসা হল আশার আলো। হতাশায় তাকে নিভিয়ে দিতে নেই। সময়সীমার ভেতর পরীক্ষিৎকে হত্যা করে তোমার বন্ধু অঙ্গীকার পালন করেছে।

বিস্ময়ে আনন্দে শৃঙ্গির দু'চোখ গোল গোল হল। শৃঙ্গি লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল। তক্ষকের দিকে ঘুরে বসল। বলল, পরীক্ষিৎ নেই। নিজের হাতে বধ করেছ তুমি। ধন্যি ছেলে বটে। সিংহের গুহায় ঢুকে সিংহকেই বধ করে এলে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এত বেপরোয়া হলে কার জন্য বন্ধু? তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার নেই। আমার সব দোষ ক্ষমা করে দাও বন্ধু।

এক ধরনের গৌরববোধে দৃপ্ত হল তক্ষকের মুখ। অন্ধকারের মধ্যে ভাল করে দেখা না গেলেও কণ্ঠস্বরে অভিব্যক্ত হল। বলল, প্রতিহিংসার আগুনটা শুধু নিভল। অখণ্ড খাণ্ডবপ্রস্থের জন্য যতদিন না ইন্দ্রপ্রস্থকে ফিরে পাচ্ছি, ততদিন পাণ্ডবদের সঙ্গে আমার যুদ্ধ শেষ হবে না। দীর্ঘদিন ধরে পরাধীন থাকতে থাকতে একটা জাতির মধ্যে গভীর আত্মগ্লানি জমা হয়। ওই আত্মগ্লানি থেকে তাদের মনে বিরাগ, বিতৃষ্ণা, ঔদাসীন্য এবং হতাশার সৃষ্টি হয়। যাদের নিয়ে আমি লড়াই করব, সেনাবাহিনী গড়ব তারা যদি মেরুদণ্ডহীন ভীরু হয় তাহলে কাদের সাহায্যে অখণ্ড খাণ্ডবপ্রস্থ প্রতিষ্ঠা করব। এদেরকে বেশি করে বোঝাতে হবে প্রত্যাঘাত শুরু হয়েছে। দেশের জন্য, জাতির জন্য তোমাদেরও কিছু দায়িত্ব আছে। তাদের অন্তরের ঘুম ভাঙানোর সেই কঠিন কাজটার জন্য তোমাকে আরো সময় দিতে হবে। দেশের জন্য এটুকু করতে পারবে না?

অভিভূত গলায় শৃঙ্গি বলল, পারব। খুব পারব। পরীক্ষিৎকে হত্যা করার দুঃসাহস নিশ্চয়ই লোকের মনে ভয়, জড়তা, দুর্বলতা দূর করতে সাহায্য করবে।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তক্ষক। বলল, সংকল্পে সিদ্ধ হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে প্রতীক্ষা করছি। দেশের মানুষকে অবিশ্বাসের পাত্র মনে করতে কষ্ট হয়। তাদের উপর বিশ্বাস হারানোর আগেই যেন আমার মৃত্যু ঘটে।

দ্বিতীয় পর্ব

ইতিহাসের আসামী

দশ

মহারাজ পরীক্ষিতের মৃত্যুকালে জনমেনজয় ছিল একান্তই বালক। তবু পিতার শূন্য সিংহাসনে তাকেই অভিষেক করা হল। জনমেনজয় সাবালক না হওয়া পর্যন্ত সম্রাজ্ঞী মাদ্রবতী বিশ্বস্ত মন্ত্রীদের সাহায্যে ও পরামর্শে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। এভাবেই চলল অনেককাল।

শিশুপুত্রকে বুক দিয়ে আগলে রাখল মাদ্রবতী। নাগরাজ তক্ষকের বিষ-নিঃশ্বাস থেকে পুত্রকে দূরে রাখাই ছিল মাদ্রবতীর একমাত্র ভাবনা-চিন্তা। নিরাপত্তার কঠিন বলয়ের ভেতর জনমেনজয়ের সকাল সন্ধে হয়। এত কড়াকড়ির মধ্যে বালক-মন হাঁফিয়ে উঠে। নিজের মত করে থাকতে না পারার কষ্টটা তাকে অসহিষ্ণু করে। ভেতরে ভেতরে একটা প্রবল রাগ হয় মায়ের ওপর। স্বাধীন চলাফেরার পথে মাকেই তার একমাত্র কাঁটা মনে হয়। এত নজরদারির কী আছে ভেবে পায় না বালক জনমেনজয়। খাঁচায় বন্দী বাঘের মত রোজ গজরায়।

বিদ্রোহী মনটা একদিন সরাসরি মাকে প্রশ্ন করল। তোমার ভয়ের কারণটা আমায় একটু বুঝিয়ে বলত। অষ্টপ্রহর নজরদারি আমার ভাল লাগে না। আমার মত একটু থাকতে দাও। তক্ষক কোথাও নেই। তাকে এত ভয় পাওয়ার কী আছে? অনেকদিন হয়ে গেল তবু কোনোরূপ শত্রুতামূলক আচরণ করল না সে। এখনও শত্রুতা পুষে রাখবে মনে হয় না।

পুত্রের ছেলেমানুষি প্রশ্নের উত্তরে মাদ্রবতী বলল, তক্ষক তোমার পিতাকে হত্যা করে শত্রুতার সূচনা করেছিল। কিন্তু সে ভাল করেই জানে তার বিষদাঁত ভেঙে ফেলার ক্ষমতা আমার নেই। তাই, তোমার বড় হওয়া পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। আমার প্রতিহিংসার অস্ত্র তো তুমি। সেই অস্ত্র ভোঁতা করে দেওয়ার চেষ্টায় সে আছে। কিংবা আমার হাতের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে আমাকে অকেজো করে দেওয়ার ধান্দা তার। যে কোনো মুহূর্তে তোমাকে অপহরণ করতে পারে। তাই তোমার বড় না হওয়া পর্যন্ত এই কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখতে হবে।

কেন?

বললাম তো, যে কোনো মুহূর্তে তোমাকে অপহরণ করতে পারে। আমার কাছে সেরকম খবর আছে। কোনো ঝুঁকি নেব না। দেশের বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনীই তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থাদি করেছে। তারা আমার কথা শুনবে কেন? আমিও বা তাদের কাজের ওপর খবরদারি করব কেন?

মায়ের প্রতি গভীর সমবেদনা অনুভব করল জনমেনজয়। বলল, তোমায় কিছুই করতে হবে না। যা করার আমি একা করব। তুমি শুধু নির্দেশ দাও।

মাদ্রবতী কিছু বলার চেষ্টা করলে জনমেনজয় তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, শোন মা, নিরাপত্তা মানে আড়াল করে রাখা নয়, লুকিয়ে রাখাও না। কোথায় কী হচ্ছে, শত্রুরা আমার সম্পর্কে কী ভাবছে সেটা তো আমাকে জানতে হবে। বাস্তব অবস্থাটা কী হতে পারে সে সম্বন্ধে আমারও কিছু ভাবনাচিন্তা থাকতে পারে। কিন্তু তুমি বা তোমার নিরাপত্তাবাহিনী আমাকে সম্পূর্ণ আঁধারে রাখছ। এটা ঠিক নয়। ঘেরাটোপের বাইরে প্রকৃতপক্ষে কী হচ্ছে সেটা আমি জানতে পারি না। এভাবে আগলে রাখলে তো স্বাবলম্বী হতে পারব না। পরনির্ভরশীল হয়ে থাকলে রাজার চলে? শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলার কৌশল যদি আমার জানা না থাকে তাহলে পস্তাতে হবে আমাকেই।

জানি বাবা, তবু তুমি ছোট। গভীর করে বোঝার বয়স হয়নি।

মলিন হেসে জনমেনজয় বলল, মায়ের চোখে কোনো সন্তানই বড় হয় না কোনোদিন, চিরকাল খোকা থাকে সে। কিন্তু সময়স্রোতে আমি বড় হয়ে গেছি। আর কতকাল আঁচলে বেঁধে রাখবে? আমার নিজের দায়িত্বটা কবে বুঝে নেব। পিতৃহন্তা তক্ষককে সবংশে ধ্বংস না করা পর্যন্ত আমি শান্ত হতে পারছি না। স্বর্গ, মর্ত, পাতাল— যেখানেই থাকুক তাকে খুঁজে বার করবই। আমার হাত থেকে তার রেহাই নেই।

পুত্রের কথা শুনে মাদ্রবতী খুশি হল। বলল, আমিও সেদিনটার অপেক্ষায় আছি। এখনও সময় হয়নি তার সঙ্গে বোঝাপড়ার। সবকিছুর জন্য একটা সময় নির্দিষ্ট থাকে তার আগে কিছু হয় না। তুমি আমি চাইলেই কি বসন্তের ফুল বর্ষাঋতুতে ফোটাতে পারি? পারি না। তাই অপেক্ষা করতেই হয়।

জনমেনজয়কে প্রফুল্ল দেখাল। বলল, মা-গো এখন আমি স্বাবলম্বী। আমার পাহারাদার আমিই। তুমি মিছে ভয় পাচ্ছে। আমার ওপর একটু আস্থা রাখ। তোমার নজরদারি তুলে নাও। তাহলেই শত্রুর মুখ দেখতে পাব।

এক গভীর সুখে ভরে যায় মাদ্রবতীর বুক। তৃপ্তির শ্বাস পড়ল। নিজের উৎকণ্ঠা কবুল করে বলল, তোমার কথাই ঠিক। ভয় তো আমারি। তোমার বাবার মৃত্যুটা ভুলতে পারি না। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ঘেরাটোপ ডিঙিয়ে আততায়ী তো তাদের সময়সীমার মধ্যে মহারাজকে খতম করল। নিশ্ছিদ্র পাহারার মধ্যে থেকেও মহারাজকে রক্ষা করতে পারলাম কই? নিয়তির বিধানকে বোধহয় ঠেকানো যায় না। তবু মানুষের মন তো। স্নেহ-মমতায়, ভালবাসায় বড় দুর্বল।

দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে জনমেনজয় বলল, ভাগ্যে যা লেখা আছে তা তো ফলবেই। তাই বলছি, ভয়টা অমূলক। ভয় মানুষকে নির্বীর্য করে। তার সব সাহসকে কুরে কুরে খায়। ভয়ের বোঝা ঘাড়ে চেপে বসলে ওঝা ডেকেও ঘাড় থেকে নামানো যায় না তাকে।

এসব কথা আমারও যে মনে হয় না, তা নয়। কিন্তু আমি যে মা। সন্তানকে নিরাপদে রাখাই মায়ের ধর্ম।

মাগো, নিরাপত্তা কোথাও নেই। পিতার নিরাপত্তার জন্য কত কী করলে, তবু

নিরাপত্তাকর্মীকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পিতাকে হত্যা করে প্রমাণ করল সন্ত্রাস-সৃষ্টিকারীর নিশানা অব্যর্থ। হিংসাই হিংসার শেষ কথা।

বুক কাঁপিয়ে মাদ্রবতীর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। বলল : তোমার বক্তব্যের বিপক্ষে কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছি না। বাজ্য-রাজনীতিটা এত অল্প বয়সে গভীর করে জানা বোঝা হয় না।

জনমেনজয় বলল, সারা জীবনেও হয় না। সিদ্ধান্তটা যথাসময়ে নিতে জানা দরকার। রাজনীতিতে রাজা আর রাজদণ্ডই শেষ কথা।

তবে সংঘাত যখন অনিবার্য হবে তখনই সংঘাত করা উচিত। সুকৌশলে শত্রুর অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাকে দুর্বল করে বশীভূত করবে। প্রতিহিংসা কিংবা প্রতিশোধের দ্বারা কোনো সমস্যার চিরস্থায়ী সমাধান হয় না। সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে সেকথা একইভাবে সত্য।

জনমেনজয় সবিস্ময়ে মাথা নাড়ল। ধীরে ধীরে বলল, তোমার কথা মনে থাকবে।

শত্রুতার ইতিহাসও তোমাকে জানতে হবে পুত্র। জেহাদের উৎস কোথায় যেমন জানা উচিত তেমনি তার দুর্বলতাও খোঁজ রাখতে হবে। এসব কথা বলার কারণ, ইন্দ্রপ্রস্থের জন্মলগ্ন থেকে পাণ্ডববংশের বিরুদ্ধে এক গভীর গোপন ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত। বাপ-ঠাকুর্দার ভুলের মাশুল তোমার পিতাকে জীবন দিয়ে শোধ করতে হয়েছে। অনুরূপ কোনো মাশুল যাতে আর দিতে না হয় সেজন্য তোমায় সতর্ক করছি। এর পরেও কত মূল্য দিতে হবে পাণ্ডব-বংশকে জানি না। কথাগুলো বলার সময় কেমন একটা উদাস বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল মাদ্রবতী।

জনমেনজয় জননীকে আশ্বস্ত করার জন্য বলল, তুমি কিছু ভেবো না। বাবার হত্যাকারী তক্ষককে খুঁজে বার করবই। পৃথিবীর যে প্রান্তে লুকিয়ে থাকুক তোমার কাছে ধরে আনব তাকে। নিজের হাতে তাকে শাস্তি দেবে তুমি। তোমার স্বামীর মৃত্যুর শূন্যতা এবং শোক ভোলার জন্য পুত্র হয়ে এটুকু আমি করবই।

পুত্রের প্রত্যয়দৃপ্ত কঠিন সংকল্পের কথা শুনে মাদ্রবতীর হৃদয়ের মধ্যে কী যেন সব গলে গলে পড়তে লাগল। এক গভীর মায়ায়, ভালবাসায় তার বুক ভাসিয়ে নামল বাৎসল্যের প্লাবন। পুত্রের কাছে এটুকুই ছিল তার প্রত্যাশা।

সে রাতে ঘুম হল না মাদ্রবতীর। একসময় শয্যা থেকেও উঠে পুত্রের কক্ষে এল। মৃদু আলো জ্বলছিল কক্ষে। নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার এক ঝলক আলো পড়েছিল জনমেনজয়ের মুখের ওপর। কী ভালো লাগছিল তাকে। লণ্ডভণ্ড একটা মস্ত বিছানায় হাত পা ছড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে। স্নিগ্ধ স্মিত মুখে মাদ্রবতী কিছুক্ষণ চেয়ে রইল তার এই সুদর্শন তারুণ্য-দীপ্ত পুত্রটির মুখের দিকে। রহস্যময় এক অনুভূতি হল বুকের ভেতর। তাতেই তার বুকখানা কেঁপে উঠল আবেগে। আনন্দে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কত কথা মনে পড়ল। রহস্যময় আনন্দের এক অনুভূতি ঢেউ দিয়ে গেল বুকে। খুব ইচ্ছে হল ঘুম থেকে তুলে জনমেনজয়কে একটু আদর করে। একটা চুমু দেয়। বয়সের

কারণেই পারল না। জনমেনজয় এখন ছোট নেই। বড় হয়ে গেছে। তাই কেমন সংকোচ হল মাদ্রবতীর।

কক্ষে ফিরে ঘুমোনোর চেষ্টা করল। কিন্তু দু'চোখের পাতা কিছুতে এক হল না। রাতের নির্জনতায় অনেক কিছু অনুভব করে। কেমন একটা ঘোরলাগা আচ্ছন্নতার ভেতর সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল পরীক্ষিৎ তার পাশে শুয়ে আছে। তার চোখে চোখ রেখে মৃদু মৃদু হাসছে। তার শ্বাসও লাগছে মাদ্রবতীর গায়ে। আর সে মহারাজের চুলের মধ্যে আঙুলগুলো ডুবিয়ে দিয়ে বিলি কাটছে। আরামে পরীক্ষিতের দু'চোখ বোজা। মনেই হয় না পরীক্ষিৎ নেই। কী আশ্চর্য, হঠাৎ তার কণ্ঠস্বর শুনতে পায় বুকের ভেতর। আর সে তার পরিষ্কার উত্তর দিচ্ছে।

মাদ্রবতীর দু'চোখ বোজা। সে কিন্তু শুয়ে শুয়ে পরীক্ষিতের সঙ্গে কথা বলছিল। পরীক্ষিৎই জিগ্যেস করল, মাদ্রবতী তোমার কী হয়েছে বল তো? তুমিও যে শান্তিতে নেই তোমাকে দেখলেই তা টের পাওয়া যায়। এক গভীর সংকটে আছ তুমি। সব সময় কী যেন ভাবছ। মুখে কিছু না বললেও টের পাই এক অবিরাম যুদ্ধে তোমার ভেতরটা ছিন্নভিন্ন হচ্ছে। যুদ্ধটা তোমার নিজের সঙ্গে এবং পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে।

বিস্ময়ে মাদ্রবতী ওর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ পরে গভীর বিষাদের সঙ্গে নিরুচ্চারে বলল, আমার মনের ভেতরটা এখনও তুমি তেমন করে দেখতে পাও। ইদানীং কারো একটু সহানুভূতি পেলেই মনটা গলে যায়। ভীষণ ভালো লাগে তখন। কিন্তু মনের কথাটা কাউকে বলা যায় না। তোমার কাছেই শুধু নিজেকে উন্মোচন করা যায়। আমার সব স্বীকারোক্তি তোমার কাছেই। সত্যি, আমি সুখে নেই। তুমি আমাকে সুখে থাকতে দাওনি। তোমার গচ্ছিত ধন শুধু আগলানো নয় তাকে তোমাদের উপযুক্ত করতে গিয়ে কত ঝঞ্ঝাট পোহাতে হয় জান? অথচ, কী সুন্দর আছ তুমি। কোনো দায় নেই, দায়িত্ব নেই। প্রতিকার প্রতিরোধের ভাবনা নেই। সব চিন্তা আমার একার যেন। মা হয়েছি বলে সব দায় কী আমার।

পরীক্ষিতের অধরে স্মিত হাসি। অন্ধকারের মধ্যে পরীক্ষিতের কণ্ঠস্বর শুনল মাদ্রবতী। পৃথিবীর সব মায়েরা ছেলের মধ্যে বেঁচে থাকে। তোমার ছেলের জন্য তুমি বেঁচে আছ, এ আর নতুন কথা কী? তার হাতে সর্বস্ব তুলে দেবে বলে তুমি যা করলে তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

মাদ্রবতীর অধর প্রান্তে বিরস হাসি ফুটল। বলল, ব্যস এইটুকুই, আর কিছু নয়।

পরীক্ষিতের মুখে চোখে একটা অপ্রস্তুতভাব ফুটে বেরোল। বলল, আর কী করতে পারি? বেঁচে থেকেও বা কী করতে পেরেছি। পুত্রের প্রতি বাবার কোনো কর্তব্য করা হয়নি। এমন কি ভালো করে একটু আদর স্নেহও করতে পারিনি। কত দুঃখ, বেদনা, অভাব, অপূর্ণতা, শূন্যতা নিয়ে আমায় মরতে হয়েছে, ভাব তো। সেজন্য তোমার করুণা হল না।

তোমার কষ্টটাই শুধু দেখলে। আমার কথাটা ভাব তো। মাঝে মাঝে তোমাকে একটু চোখের দেখা দেখতে এবং কাছে পেতে এত ইচ্ছে করে,— তোমার সামনে

গিয়ে বসার জন্য এমন আকুলি-বিকুলি করে সমস্ত মন যে, পাগল পাগল লাগে। বুকের মধ্যে গেঁথে আছে দাম্পত্যের প্রণয়মধুর কত গভীর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। তার রক্তক্ষরণ কি বাইরে থেকে দেখা যায়? জীবনটা আমার মিথ্যে হয়ে গেল কার দোষে? তাদের কাছে কী অপরাধ করেছি বলতে পার?

তোমার মত নিজের ভাগ্যকে আমিও প্রশ্ন করি। ঠাকুর্দার পাপেই অকালে জীবন দিতে হল। পঞ্চপাণ্ডবের ইন্দ্রপ্রস্থ ও হস্তিনাপুর ত্যাগ করার পরেই ঝামেলার শুরু। চারদিকে দলিত ও বঞ্চিত মানুষের ক্ষোভ, বঞ্চনা নিয়ে যেসব বিক্ষোভ-বিদ্রোহের সূচনা তার সব ঝাপ্টা আমার ওপর দিয়ে গেল। এখনও পর্যন্ত বড় কিছু হয়নি। সব কেমন থমথম করছে। জনমেনজয় বড় না হওয়া পর্যন্ত কোনো বিপদ বাধা আসবে না। কারণ জেহাদিদেরও ঘর গোছানোর সময় চাই।

ছেলের জন্য আমাকেও প্রস্তুত থাকতে হচ্ছে। এই সংকট পিতামহ অর্জুনের সৃষ্টি। খাল কেটে কুমির ঢুকিয়েছেন তিনি। এখন সেই কুমিরছানা খাল আগলে বসে আছে। এখন আমি কী করব বলে দাও।

পরীক্ষিতের মুখখানা সহসা পাণ্ডুর হয়ে গেল। তাকে অত্যন্ত বিব্রত ও বিপন্ন মনে হল মাদ্রবতীর। অসহায়ভাবে পরীক্ষিৎ বলল, কী বলব? অতীতের দিকে যখন তাকাই তখন কেবলই মনে হয় কৃষ্ণার্জুন মিলে সত্যি কি একদল দলিত, পতিত অসহায় মানুষদের ভিটেমাটি পুড়িয়ে বাস্তুচ্যুত করেছিল? কৃষ্ণের মত মানবিক গুণসম্পন্ন মহান চরিত্রের মানুষ এমন জঘন্য অমানবিক কাজ করতে পারে না। আমিও বিশ্বাস করি না। এ হল তক্ষকবংশীয় নাগজাতিদের অপবাদের গল্প। নিছকই অপপ্রচার বলতে পার। এর সত্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে তক্ষকের ক্রোধের শিকার হয়েছি।

গল্পটা কে বা কারা বানাল? কেন বানাল?

দ্যাখ, নতুন সাম্রাজ্য স্থাপনের পেছনে নিষ্ঠুরতার একটা ইতিহাস থাকে। ইন্দ্রপ্রস্থ স্থাপনের পেছনে অনুরূপ নিষ্ঠুরতা থাকতেও পারে। পাণ্ডবেরা নিজেদের সম্মান, মর্যাদা ও গৌরবের ভাবমূর্তি অমলিন রাখার জন্যই রাজ্যের অভ্যন্তরে অগ্নিগর্ভ বিদ্রোহ দমনের কর্মকাণ্ডকে হয়তো ক্ষুধার্ত অগ্নিদেবের আখ্যান দিয়ে মুড়ে দিল। ধর্মপ্রাণ মানুষও বিশ্বাস করল সে গল্প। চোখ বুজলে দেখতে পায় অগ্নিশিখার মত রক্তিম বর্ণের এক মানুষের দিব্যবরণ রোগে ভুগে কৃশ ও মলিন হয়ে গেছে। বিপ্রবেশে ধুঁকতে ধুঁকতে বিশ্রামরত কৃষ্ণ ও অর্জুনের সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, আমি উদরাময়ে কষ্ট পাচ্ছি। গোটা খাণ্ডববনের ভেষজও যদি আত্মসাৎ করি তবু উদরাময় সারবে না। তোমরা দুজন মিলে আমায় একটু সাহায্য করতে পার।

তির্যক দৃষ্টি মেলে ব্রাহ্মণের দিকে অপলক চোখে তাকিয়েছিল কৃষ্ণ। মাদ্রবতীও কল্পনায় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল, ব্রাহ্মণ সংকোচ ভাবটা কাটিয়ে ওঠার জন্য থুতু গিলে অর্জুনের দিকে তাকল। ধরা পড়ে গেলে যেমন অপ্রস্তুত হাসে তেমনিভাবে ব্রাহ্মণ হাসল। কৃষ্ণের ধারণা হল বিপ্রবেশে অগ্নিদেবই তাদের সামনে দাঁড়িয়ে। কৌতুক করে

বলল, আপনার বিশ্বগ্রাসী পথ্য প্রার্থনাই বলে দিচ্ছে আপনি কে? এমন খিদে অগ্নি ছাড়া কারো হয় না।

ব্রাহ্মণ হাসল। তৎক্ষণাৎ আত্মপরিচয় দিয়ে বলল, আপনার অনুমান যথার্থ। সর্বভুক বৈশ্বানর আমি। মহারাজ শ্বেতকীর মহাযজ্ঞে দীর্ঘকাল ধরে এত ঘি-মাখন এবং নিরামিষ ভক্ষণ করেছি যে আহারে কিছুমাত্র রুচি নেই। স্বাদ বদলানোর জন্য চাই এই বিশাল বনভূমির যাবতীয় গাছপালা এবং জীবের রক্তমাংস। তাহলে আমায় ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়।

কৃষ্ণের অধরে স্মিত হাসি। বলল, এ কাজ তো আপনি একাই করতে পারেন। আমার কিংবা অর্জুনের সাহায্যের কোনো প্রয়োজন আছে মনে হয় না।

এই বনভূমি এর আগেও যতবার দগ্ধ করার চেষ্টা করেছি ততবারই তক্ষকের বন্ধু ইন্দ্র প্রবল বারিপাত করে নিভিয়ে দিয়েছে। ইন্দ্র এবারও নিশ্চুপ থাকবে না। তার বারিবর্ষণ প্রতিহত করে আপনারা আমার মনোবাঞ্ছা পূরণ করুন।

কৃষ্ণ বলল, কিন্তু শরজালে আকাশ আচ্ছাদিত করে রাখায় মত অত শর এবং উপযুক্ত ধনু আমাদের নেই।

অগ্নি উৎফুল্ল হয়ে বলল, কার্য সম্পন্ন করার জন্য অক্ষয় তূণ, উত্তম ধনু এবং দ্রুতগতিসম্পন্ন রথ আমি দেব। কার্যোদ্ধারের পর এগুলি আপনাদের হবে।

অন্ধকারের মধ্যে মাদ্রবতী স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল কৃষ্ণ অর্জুন বিশাল সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে একযোগে খাণ্ডববনের চতুর্দিকে অগ্নিসংযোগ করল। দেখতে দেখতে অগ্নি গ্রাস করল অরণ্য। উন্মত্ত বাতাস চতুর্দিক থেকে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আগুনের ওপর। বন থেকে বনে এবং গাছ থেকে গাছে লাফিয়ে পড়ছিল আগুন। নিষ্ক্রমণের কোনো পথই খোলা ছিল না। অবরুদ্ধ হয়ে বন্যপ্রাণী এবং বনবাসীরা অসহায়ের মত পুড়ে মরল।

মাদ্রবতী পাষাণ পুত্তলীবৎ স্থির হয়ে রইল। দৃশ্যের ওপর চোখ দুটি স্থির ছিল। আত্মগতভাবে পরীক্ষিৎকে প্রশ্ন করতে শুনল, মহর্ষি ব্যাসদেব যে এরকম একটা অর্থহীন, কার্যকারণ, সম্পর্কহীন গল্প কেন বলেছিলেন, মাথায় ঢোকেনি। নিছকই গল্প মনে হয়েছিল। গল্পের সত্যাসত্য এবং অবাস্তবতা নিয়ে যে সব প্রশ্নে মন তোলপাড় করছিল তার কিছুই জিগ্যেস করা হয়নি তাঁকে। বিব্রত হবেন মনে করেই সংকুচিত ছিলাম। কত অসংগতি ছিল গল্পের মধ্যে। এখন মনে হয় আমি চাইলেই উপাখ্যানের হাত ধরে ইতিহাসের কিনারায় পৌঁছতে পারি। ব্যাসদেব সেই প্রত্যাশা নিয়ে হয়তো এই উপাখ্যান বর্ণনা করেছিলেন। কৌতূহলের অভাবেই এই উপাখ্যান থেকে ঐতিহাসিক শিক্ষা না নেওয়া আমার ভুল হয়েছিল। একবারও ভেবে দেখিনি এই উপাখ্যান কৃষ্ণ ও অর্জুনের চরিত্র মহিমা ক্ষুণ্ণ করছে! তাঁদের উভয়কে মানবেতিহাসের এক জঘন্য হত্যাকাণ্ডের কলঙ্কিত নায়ক করে রাখল। অথচ, এই উপাখ্যানের মাধ্যমে ব্যাসদেব বোঝাতে চাইলেন যে তাদের সব রাগ কৃষ্ণ-অর্জুনের ওপর। তাদের দুজনের জন্যই তারা বাস্তুচ্যুত ও পরাধীন। স্বজনহারানোর শোক বয়ে বেড়াতে হচ্ছে।

পাণ্ডববংশের নিধনেই তাদের শান্তি। একারণে পাণ্ডবদের শক্তির দুই স্তম্ভ কৃষ্ণ ও অর্জুনকে লোকচক্ষে হেয় করার উদ্দেশ্যে জনমনকে বিদ্বেষ বিষে বিষিয়ে দেওয়ার জন্য অগ্নির ক্ষুধা নিবৃত্তির উপাখ্যানকে অপপ্রচারের হাতিয়ার করল।

বিষণ্ণ গলায় নিজের মনে পরীক্ষিৎকে বলল মাদ্রবতী, ঐ বিষছোবলে পুত্র জনমেনজয় তার পিতাকে হারাল, আমি হারালাম স্বামীকে। এত বুঝেও সেদিন সাবধান হওনি কেন? তোমার এ বিলাপ শুনতে একটুও ভাল লাগছে না। মনের অতলে এত সব ভাবনা সত্ত্বেও ধ্যানস্থ শমীক মুনিকে লাঞ্ছিত করে কার্যত শত্রুর হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিলে।

নিজের ভুলের জন্য আমার কোন পরিতাপ নেই। আমার ভুল হল বলেই নাগজাতির এতবড় অভ্যুত্থান পাদপ্রদীপের সামনে আসতে পারল। একটা সাধারণ ঘটনা কত বড় ইতিহাস হয়ে গেল ভাবতো।

এরকম অদ্ভুত যুক্তি শুনে মাদ্রবতীর রাগ হল। যথাসম্ভব নিজেকে সংযত করে কেটে কেটে বলল : তোমার ভাবনা তো ভুল হতে পারে। ইতিহাসের কলঙ্কিত নায়ক হয়ে মানুষের ঘৃণাও পেতে পার। ইতিহাসের নিরপেক্ষ বিচারে তুমি কোনো মানবিক ক্ষমা পাবে না। স্বামী, ইতিহাসের নায়ক হতে গিয়ে ইতিহাসের আসামি হয়ে গেছে।

হো-হো করে প্রাণখোলা হাসল পরীক্ষিৎ। তার বেপরোয়া হাসির শব্দে ঘুম ছুটে গেল মাদ্রবতীর। ধীরে ধীরে চোখ মেলল। আশ্চর্য লাগল, সে তো নিজের পালঙ্কে নিজের বিছানায় শুয়ে আছে। অন্য কেউ ঘরে নেই। তা হলে, পরীক্ষিৎ কোথা থেকে এল? তার সঙ্গে যে কথোপকথন হল তা বাস্তব। অনুভূতি এবং স্বপ্নেই তা হয়েছে। তাহলে কি তার ভাবনা-চিন্তা, উৎকণ্ঠা-উদ্বেগ-পরীক্ষিতের রূপ ধরে তাকে সতর্ক করল। অনেককাল পরে পরীক্ষিতেব স্মৃতিটা এত গভীর করে মনে পড়ল কেন? বুকের ভেতর এক অদ্ভুত অনুভূতির প্লাবন বয়ে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যে তার ভাবাবেগটা হঠাৎই উদ্বেগে, উৎকণ্ঠায়, রূপান্তরিত হল। মাদ্রবতীর সব সময় মনে হয় একটা অশুভ শক্তির ছায়া পড়েছে এই রাষ্ট্রের উপর। কুরুক্ষেত্রের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের শোক ও দীর্ঘশ্বাসে কাতরাচ্ছে এদেশ। ছত্রিশ বছরেও তার ধাক্কা সামলে উঠতে পারেনি। বরং শোকাভিভূত ধর্মরাজের জন্যই নানারকম প্রশাসনিক দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর নীরবতা, ঔদাসীন্য এবং অনীহার সুযোগ নিয়ে হিংসা, দ্বেষ, বিদ্বেষ, বিদ্রোহ ছোট ছোট আদিম অধিবাসীদের মধ্যে মাথা চাড়া দিল। বিচ্ছিন্ন ঘটনা হলেও লুঠতরাজ, খুনখারাপি লেগে ছিল। বলাবাহুল্য, তার কোনো প্রতিকার কিংবা প্রতিরোধ ছিল না। পরীক্ষিৎকে এই দুরবস্থার সামাল দিতে হয়েছিল একা। কিন্তু পারেনি। আবেদনও করেছিল, সময় দেওয়া হোক তাকে। অন্ধকারে বেরিয়ে পড়া মানুষের পথচলাকে সে অবশ্যই নিরাপদ করতে চেয়েছিল। কিন্তু নিজের ভুলে এবং অহংকারের হঠকারিতায় তা বানচাল হয়ে গেল। বিশ্বাসের মন্ত্র হিংসার তরবারি হয়ে মানুষকে সন্ত্রস্ত করল।

মাদ্রবতীর সব ভয় জনমেনজয়কে নিয়ে। তার সদ্য দেখা চাঁদ পোকা এবং খরগোশের স্বপ্নটা তাকে ভাবিয়ে তুলল। তাই একটা বড় যজ্ঞ করে শান্তি স্বস্ত্যয়নের কথা ভাবল। কিন্তু জনমেনজয়ের কানে সে কথা পৌছতেই মাকে নিবৃত্ত করার জন্য বলল, তুমি ভীষণ ভীতু। এত ভয় নিয়ে কেউ বাঁচতে পারে? যারা ভীরু তারা রোজ হাজারবার মরে আর বেঁচে ওঠে। কিন্তু বীর জীবনে একবারই মরে। হাজারবার মরণের যন্ত্রণা পেতে হয় না তাকে।

জনমেনজয় জানে মায়ের মন দুর্বল। সবসময় হারানোর আশঙ্কা। কোনো কথাতেই প্রবোধ মানে না। ঈশ্বরের আরাধনা করে তাঁর কৃপা ও করুণা নিয়ে মায়েরা শঙ্কামুক্ত হতে চায়।

মাগো, মনের অভ্যন্তরে ভয়ের বাসা বেঁধেছে বলে যজ্ঞ করে পরিত্রাণ খুঁজছ। কিন্তু এই যজ্ঞ আমার গৌরব বৃদ্ধি করবে না। তুমি এ সংকল্প এবং ইচ্ছে ত্যাগ কর। তা-ছাড়া আমার স্বপ্নবৃত্তান্তের মধ্যে কোনো অমঙ্গল নেই। স্বপ্নের শিক্ষণীয় বিষয় হল খরগোশের মত মিত্রবেশীকে বিচার না করে বিশ্বাস করলে তাঁর ফাঁদেই পা দিয়ে পস্তাতে হয়। যেমন বিপ্রবেশী তক্ষককে বিশ্বাস করে বাবা যদি ফলেব ঘ্রাণ না নিত তাহলে কোনো বিপদ হত না। হয়ত আমার উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ, পোকা ও খরগোশের রূপ ধরে স্বপ্নের পৃথিবী তৈরি করেছে। তুমি মিথ্যে উদ্বেগ বোধ করছ।

জানি না। তুমি তো নিজের মত ব্যাখ্যা করে আমার উদ্বেগে জল ঢেলে দিলে। কিন্তু মন আমার শুনছে না। ঈশ্ববেব ইচ্ছে, করুণা এবং আশীর্বাদ নিয়ে আমাদের বাঁচতে হয়। ঈশ্বরের করুণা লাভের জন্য যাগযজ্ঞ করতে হয়। যজ্ঞে অগ্নির তাপের সঙ্গে, মন্ত্রধ্বনির সঙ্গে মনের আকাঙ্ক্ষাকে, বিশ্বাসকে প্রার্থনাকে মিলিয়ে অগ্নির ভাণ্ডার থেকে শক্তি আহরণ করা। এর মধ্যে অগৌরবের কিছু নেই। যজ্ঞে মন পবিত্র হয, দেহে মনে শক্তির জোয়ার আসে।

তোমার মত এমন করে যজ্ঞের তাৎপর্য কেউ চিন্তা করে না। লোকে ভাববে বিপদে পড়ে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হয়েছ তুমি। কী দরকার ঢাকঢোল পিটিয়ে লোক জানানো।

যার যাতে তৃপ্তি।

যজ্ঞ করার সত্যি কোনো দরকার নেই। যজ্ঞ করলে বরং লোকে মনে করবে আমরা অসহায়, আমবা ভীত, বিপন্ন এবং আমরা সন্ত্রস্ত।

কে কী ভাবল তাতে কী এসে গেল। আমার উদ্দেশ্যটা মন্দ না হলেই হল। লোকের ভাবাভাবি কেউ কোনোদিন বন্ধ করতে পারেনি।

সুতরাং ও নিয়ে আমরা বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। আমার মনে যখন সংকল্প জেগেছে তখন যাগযজ্ঞ করব।

সংকটের সময় জনমেনজয়ের ক্ষুরধার মেধা দুরন্ত ক্ষিপ্রতায় কাজ করে। সংঘাত এড়িয়ে মাদ্রবতীকে খুশি করা এবং নিজের ইচ্ছেয় অচল থাকার জন্য বলল, বেশ তো, যজ্ঞটা এমনভাবে কর যাতে সাপ মরে, লাঠি না ভাঙে। পাণ্ডুবংশের

উত্তরাধিকারের হাতে রাজ্যের শাসনদণ্ড তুলে দেওয়ার জন্য যাগযজ্ঞ করলে সবরকম জল্পনা-কল্পনার উর্ধ্বে-থাকা সহজ হয়, তুমি তাই কর।

মাদ্রবতী একগাল হেসে মাথা নেড়ে বলল, তাই হবে।

এগারো

শুভ দিনক্ষণ দেখে যজ্ঞানুষ্ঠান হল। অনুষ্ঠানের দিনে বারংবার পিতার কথা মনে হতে লাগল জনমেনজয়ের। মাত্র দশ বছর আগের ঘটনা। তখন সবে পাঁচে পড়েছে। বাবার মুখখানা ভালো করে মনেও পড়ে না। ছায়া ছায়া অস্পষ্ট একটা মুখ কল্পনায় রূপ পাওয়ার আগেই ভেঙে যায়। কিছু কিছু স্মৃতি মনের ভেতর নড়ে চড়ে। চেষ্টা করেও জোড়া দিতে পারে না। কেবল একটা ব্যথা এবং ব্যর্থতায় বুকটা চিন্‌চিন্‌ করে। পিতাপুত্রের মিলন কিংবা বাৎসল্যের কোনো দৃশ্য দেখলে পরীক্ষিতের অভাবটা তীব্র বোধ করে। বুকটা হু-হু করে। পিতাকে তখন খুব কাছে পেতে ইচ্ছে করে।

অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করে জনমেনজয়। ভাল করে গুছিয়ে ভাবতে পারে না। স্মৃতি-সত্তার মধ্যে পিতার সান্নিধ্য কিছুক্ষণের জন্য মনটাকে ভরিয়ে রাখে। নিজের অজান্তে পনেরো বছরের গণ্ডিটা মুছে যায়। সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তার শিশুকালে।

পরীক্ষিৎ তার চোখের সামনে অন্ধকারের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে ছিল। জনমেনজয় তাঁকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল শয়নকক্ষে। অমনি এক প্রলয় ঘটে গেল বুকের মধ্যে। সরু সুরে একটা কান্না শুনতে পেল। অন্ধকারের ভিতর থেকে পনেরো বছর আগের কান্নাটা ফুঁড়ে বেরিয়ে এল। আশ্চর্য, সে দেখতে পাচ্ছিল নিজেকে। তার চুল অবিন্যস্ত। বেশ কিছুদিন চুলে চিরুনি দেয়নি। ঐ কদিন এক বেলা হবিষান্ন, ফল আর শরবৎ ছাড়া কিছু খায়নি। হঠাৎ একদিন পরামানিক তার মস্তক মুন্ডন করে দিল। মাকে জিগ্যেস করেছিল। মাগো আমার বাবরি করা সুন্দর চুল পরামানিক কেটে দিল কেন? আমরা কি হয়েছে?

মাদ্রবতী কথা বলবে কি? জলভরা চোখে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল পুত্রের দিকে। ঠোঁট দুটি তার থরথর করে কাঁপছিল। অস্ফুট স্বরে বলল, জানি না। আমাকে একটু একা থাকতে দে।

একা থাকলে জনমেনজয়ের এসব কথা মনে পড়ে। নিজেকে প্রশ্ন করে একি শুধু স্মৃতি, না মনগড়া কিছু। অথবা তার বাস্তব অনুভূতি।

জনমেনজয় বেশ বুঝতে পারে তার মধ্যে একটা যুদ্ধ চলেছে। যুদ্ধটা তার নিজের সঙ্গে যত তার চেয়ে বেশি পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে। পিতার হত্যাকারীরা এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের ধরা হয়নি, শাস্তিও হয়নি। নিহত পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া হয়নি। কতকাল হয়ে গেল তবু এসব কথা সে ভোলেনি। বরং যতদিন যাচ্ছে তত বেশি করে মনে হয় পিতার কথা। অনন্ত প্রত্যাশা নিয়ে তিনি যেন তার বড় হওয়ার

প্রতীক্ষায় আছেন।

দশবছর পরেও মৃত্যুর সে দৃশ্যটা চোখ থেকে মুছে যায়নি। হঠাৎ ছবিটা চোখের তারায় জ্বলজ্বল করে উঠল। প্রাণহীন পিতার পায়ের কাছে বসে নির্নিমেষ নয়নে চেয়েছিল। আর জননী শিয়রের পাশে বসে অবনতমুখে নিঃশব্দে অশ্রুবর্ষণ করছিল। মার কান্না কিছুক্ষণের জন্য তাকে পাথর করে দিয়েছিল। তার চোখে কোনো জল ছিল না। নিদাঘতপ্ত বৈশাখের খর রোদের মত তার মুখখানি গনগন করছিল। পিতার জড়বৎ নিষ্প্রাণ দেহটি প্রবল সম্মোহনে তাকে এমনই অভিভূত করে ফেলেছিল যে কাঁদতে ভুলে গেল।

রাজবৈদ্য তার অবস্থা পর্যালোচনা করে বলল, পুত্র, তোমার দু ফোঁটা চোখের জল না পেলে মহারাজের আত্মা শান্তি পাবে না। তুমি একটু কাঁদ।

পরীক্ষিতের নিষ্প্রাণ দেহের দিকে তাকিয়ে থমথমে গম্ভীর গলায় বলল, আমার রাগ বিদ্বেষ অশ্রু জলে ধুয়ে থাক, এ আমি চাই না। বুকের আগুন নিভে গেলে ফের যদি জ্বালাতে না পারি তাহলে পিতৃঋণ শুধব কী দিয়ে? একটু পরেই তো ঐ ফর্সা সুন্দর দেহটা আগুনে সমর্পিত হবে। তারপর তো আর অস্তিত্বই থাকবে না। তবে কি মৃত্যু মানে অস্তিত্বহীনতা।

দশবছর আগে পিতার শবদেহের সামনে এরকম কোনো অনুভূতি হয়েছিল কিনা মনে নেই। তবে সেদিন যা যা ঘটেছিল তার কিছুই ভুলেনি। যজ্ঞের সামনে বেশ কিছুক্ষণ চোখ বুজে বসেছিল। হঠাৎই এসব ভাবনায় নিয়ন্ত্রণ-হারানো কান্না নাভি থেকে উঠে এল। কষ্ট করে তাকে রোধ করল কিন্তু উদ্গত কান্নার অশ্রুবিন্দু তার গাল বেয়ে বুকের ওপর পড়ল। তাতেই চমকাল সে। চিন্তাসূত্র ছিন্ন হল।

মার ডাক কানে পৌঁছল। কেমন একটা ঝিম ধরা ভাব তাকে আচ্ছন্ন করে রাখল। স্বপ্নের জগৎ থেকে বাস্তবে ফেরা বড় কষ্টের। তবু মাকে দেখে উঠে দাঁড়াল। স্বপ্নাচ্ছন্নের মত মার দিকে তাকিয়ে রইল। বলল, অতীতের কত দৃশ্য ও ঘটনায় মন আর্ত হয়। সেগুলো মনের মধ্যে আজও তেমনি আছে। একটুও ক্ষয় হয়নি বরং আরো উজ্জ্বল হয়েছে। সেদিন যা মনে হয়নি, সময়ের ব্যবধানে তার এক নতুন অর্থ বহন করে আনে।

মাদ্রবতী হাসল। বলল, রাজসভায় যাওয়ায় সময় হল, তৈরি হয়ে নাও। আমি নিজের হাতে সাজিয়ে দেব।

রাজবেশ পরানো হয়ে গেলে মাদ্রবতী বিভোর হয়ে চেয়ে রইল। অধরে গর্বিত হাসি। নয়নে অপার প্রশান্তি। অপত্য স্নেহের মুগ্ধতায় জনমেনজয়কে বুকে টেনে নিল। বুকটা ভরে গেল এক অনাস্বাদিত তৃপ্তি ও সুখের উল্লাসে। পুত্রের প্রশস্ত বুকের ওপর মাথা রেখে আস্তে আস্তে বলল, তোমার চোখে ও কিসের আগুন পুত্র? মুখের রেখায় প্রচ্ছন্ন জিঘাংসা, ধনুকের মত ওষ্ঠাধরে পাথর-কঠিন অঙ্গীকার। কোনো কিছু আড়াল করে রাখনি। বোকা ছেলে। নিজের কাছেও নিজেকে লুকোতে হয়। এমন কি নিজের

জিভও বিশ্বাসভঙ্গ করে। একটু অসতর্ক হলে কামড়ে দেয়। রক্ত ঝরে। আশা করি আমার কথাগুলো হৃদয়ঙ্গম করতে অসুবিধা হয়নি। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং সময় ও সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে যে জানে জয়লক্ষ্মী তাকে ত্যাগ করে না।

কথাগুলো মন দিয়ে শুনল জনমেনজয়। উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠা ও শঙ্কা থেকে উদ্‌গত মায়ের হৃদয় নিঙড়ানো কথার মধ্যে এত মমতা ও মাধুর্য ছিল যে তার বুকের ভেতর ব্যথার পাহাড় গলে গলে করুণার নদীতে মিশল। হৃদয় জুড়ে বিদগ্ধ ব্যথার ঢেউ। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ-হারানো এক দুরন্ত অভিমানে জনমেনজয় মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদল। বলল, অনেককাল পরে বাবার কথা মনে পড়ছে। আমার চোখের জলে বুকের আগুন যদি নিভে যায় তাহলে যে পিতৃঋণ শোধ হবে না। পিতৃপিতামহের সিংহাসনের দায়িত্বভার গ্রহণের আগে এমন মন কাড়া কথা না বললে কি চলত না তোমার?

মাদ্রবতী আদরে সোহাগে বুকের মধ্যে টেনে নিল। সস্নেহে বলল : পাগল ছেলে। খাণ্ডববনের দাবানলের আগুন কী সহজে নেবে বাবা? আকাশ থেকে প্রবল বারিবর্ষণ করে ইন্দ্রও পারেনি ঐ লেলিহান আগুন নেভাতে। দু'ফোঁটা চোখের জলে কি নেভে কখনও? আগুনে পোড়া দাগ কখনও মিলিয়ে যায় না।

মার সঙ্গে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল জনমেনজয়। যেতে যেতে হঠাৎ মনে হল, খাণ্ডববনে অগ্নিদগ্ধ রাশিরাশি শব মাড়িয়ে সে যাচ্ছে। খাণ্ডববনের যে শ্মশানভূমির ওপর ইন্দ্রপ্রস্থের প্রতিষ্ঠা আর সভাগৃহর তলায় অনেক জীবজন্তু, মানুষের মরণ-আর্তনাদ, কান্না এবং মৃত্যুযন্ত্রণার কষ্ট চাপা পড়ে আছে। খালি চোখে দেখা যায় না তাকে। জীবন খুঁড়ে দেখতে হয়। কিন্তু সে চেষ্টা করেনি কেউ। এমন কি কৃষ্ণও নয়। জনমেনজয়ের মনে হল, তার মা সর্বপ্রথম এই সত্যকে গভীর করে উপলব্ধি করেছে। তাই, শরীর থেকে আগুনের পোড়া দাগ মেলায় না বলে চমকে দিয়েছে তাকে।

রাজসভা ছিল লোকারণ্য। সারিবদ্ধ জনতার ভেতর দিয়ে দৃপ্তপদে হেঁটে গিয়ে সিংহাসনে বসল জনমেনজয়। প্রধানমন্ত্রী রাজকুমারের অভিষেক ঘোষণা করতেই রাজপুরোহিত মঙ্গলাচরণ করে কপালে রাজতিলক এঁকে দিল। তারপরেই মাদ্রবতী নিজের হাতে পুত্রের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়ে শিরশ্চুম্বন করল।

সভাসদবর্গের দিকে তাকিয়ে জনমেনজয় বলল : আপনারা সবাই আমাদের পরিবারের বন্ধু। আপনাদের কাছে অনেক কিছু শিখেছি। কিন্তু নাবালকত্বের তকমা লাগিয়ে আমায় আর শিশু করে রাখবেন না। বরং আগামী দিনের নেতা হয়ে ওঠার জন্য সাহায্য করুন।

মা'র স্বল্প ভাষণ জনমেনজয়কে চমৎকৃত করল। কথাবার্তায় কত সতর্ক এবং সাবধান হলে তবে ভাষণে এমন কথা বসানো যায়। ভাষা কত শক্তিশালী, কত বেগবতী এবং কত অনায়াসে মানুষের মর্মস্থল বিদ্ধ করতে পারে তার সাক্ষ্য রাখল মাদ্রবতী। বলল : আপনারা তো জানেন, রাজনৈতিক স্বাধিকার দাবির নামে একদল দেশদ্রোহী

হিংসার পথে গিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থকে এক ভয়ংকর জঙ্গলে পরিণত করতে চাইছে। নাগরিকরা ভয়ে বিপন্ন। তাই দমননীতির পথেই তারা রাজশক্তি পদানত করার স্বপ্ন দেখে। শুধু এই কারণে তরুণ রাজাকে অভরসা করার কোনো কারণ নেই। আপনারা তার পাশে দাঁড়িয়ে তার হাত শক্ত করুন। আমি চাই না আব একটা কুরুক্ষেত্র হোক।

জনমেনজয়ের আশ্চর্যের সীমা নেই। কী সূক্ষ্ম ক্ষুরধার পথে মাদ্রবতীর মেধা বিদ্যুতের মত জ্বলন্ত ক্ষিপ্রতায় কাজ করল। খুব কাছে থাকার জন্য মায়ের ব্যক্তিত্ব দেখা হয়নি তার। এমন কূটভাষণ শোনার সুযোগ হয়নি বলে জননী অজ্ঞাত রয়ে গেছে তার কাছে। মার জন্য জনমেনজয়ের গর্বে বুক স্ফীত হল। মায়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল : মা-গো, এ তো কথা নয়, সুধা। কথা দিয়ে অন্তরে এমন সুধাসিন্ধু বইয়ে দিতে তোমার মত কাউকে দেখিনি।

মাদ্রবতী হাসল। খুশির ছটা লাগল জনমেনজয়ের মুখে। অধরে স্মিত হাসি, বিজ্ঞের মত আস্তে আস্তে বলল, হৃদয়ের আচরণ চিরকালই বিচিত্র।

বারো

জনমেনজযের অঙ্গীকার নগর ছাড়িয়ে বনভূমির তক্ষক পল্লী, নাগপাড়া, পক্ষীকুঞ্জ, নিষাদ-বিহার প্রভৃতি ছোট ছোট জনবসতিতে খবরটা পৌঁছে গেল। কিন্তু ঘোষণাটা কারো মনে ছাপ ফেলল না। বরং তাদের কাছে এটাই বেশি করে পরিষ্কার হয়ে গেল যে এটা নতুন রাজার নতুন ফন্দি। খাণ্ডববনের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জোট ভেঙে ফেলা এবং তক্ষক ও শৃঙ্গির প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য ধ্বংস করার জন্য জনমেনজয় যে আটঘাট বেঁধে পরিকল্পনামাফিক এগোচ্ছিল এই সত্যটা শমীক মুনির পুত্র শৃঙ্গি তাদের বোঝাতে সফল হল। বলল, নিমগাছে নিমফলই হয়, আঙুর হয় না। আমাদের মত ঘরপোড়া, শোষিত, লাঞ্ছিত মানুষের জীবনের শান্তি ও সুখের লোভ দেখিয়ে এক নতুন স্বপ্ন তৈরি করে দুর্বল করার ষড়যন্ত্র করছে। নতুন রাজা সংঘাত চায় না, সংঘাত এড়িয়ে যাওয়ার জন্য শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথা বলছে। এটা ওঁর মনের কথা নয়। আমাদের লোভ দেখাচ্ছে। বোকা বানাচ্ছে। আসলে রাজশক্তি ভীত, রাজা দিশাহারা। তাই বন্ধুত্বের লোভ দেখাচ্ছে। আমাদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে কোনোদিন সমাধানে পৌঁছনো যাবে না। ধ্বংস হওয়ার আগে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পক্ষে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। এটাই হল ওদের দুর্বলতার মুহূর্ত। আমাদের আক্রমণের উপযুক্ত সময়। করাল নখদন্ত বিস্তার করে আমরাই আঘাত করব ওদের।

শৃঙ্গির প্রচার জনমেনজয়ের কানে গেল। কিন্তু তার আস্ফালনকে পাত্তা দিল না। শুধু জানতে চাইল শৃঙ্গি কে? কোথায় থাকে? তার রাজনৈতিক কার্যকলাপ কী?

গুপ্তচর সংস্থার প্রধান যুধাদিত্য বলল, শৃঙ্গি শমীক মুনির পুত্র। তক্ষকের অনুগামী। কিন্তু ওর পিতা পাণ্ডবদের প্রতি সহানুভূতিশীল। পুত্রর কার্যকলাপ অনুমোদন করেন না। বৃদ্ধ হয়ে গেছেন বলে পুত্রের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। পুত্র নাগপল্লী ঘুরে

ঘুরে রাজার বিপক্ষে মানুষ খেপিয়ে তোলার কাজে লিপ্ত। বিশেষ করে স্বর্গত মহারাজের হাতে শমীক মুনি নাকি হেনস্তা হয়েছিলেন। সেই কথা বলে পাণ্ডববংশের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক প্রচার চালাচ্ছে। আপনি অনুমতি করলে দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা তুলে ধরতে পারি।

জনমেনজয়ের খুব অবাক লাগল। সোজা কাজটা কার অদৃশ্য হাতে যেন দুরূহ হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, সত্য যত নির্মম হোক তাকে তো বুক পেতে গ্রহণ করতে হবে। আপনি বলুন।

যুধাদিত্য তার দ্বিধার ভাবটা কাটিয়ে বলল, নাগেরা আজও ইন্দ্রপ্রস্থকে খাণ্ডবপ্রস্থ বলে ভাবে। ওরা নাম পরিবর্তনকে স্বীকার করে না। খাণ্ডববনকে অতীতের গর্ভে হারিয়ে যেতে দেয়নি। ইন্দ্রপ্রস্থ তাদের চোখে অমানবিক নিষ্ঠুরতার প্রতীক। তাদের বিবিধ পীড়নের সাক্ষী। তাই ওই দিনটা অরন্ধন পালন করে। নাগদের প্রতি পাণ্ডবদের বৈরিতার অবসান হয়নি বলে মহামুনি শমীককে তারা লাঞ্ছিত করেছে। পাণ্ডবরা নাগদের মানুষ ভাবে না বলেই যোগস্থ ঋষির কণ্ঠে মৃত সাপকে মালা করে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। সাপের মতই নিষ্ঠুরভাবে পিষে মারার মনোগত অভিপ্রায়ই তাতে প্রকাশ পেয়েছিল। এটা হল তার প্রতীকী আচরণ। পল্লীতে পল্লীতে এসব কথা হলে ছোট-বড়, বৃদ্ধ সকলে ক্রোধের আগুনে টগবগ করে ফোটে।

জনমেনজয় মৌন হয়ে রইল। এতবড় একটা অগ্নিকুণ্ডের ওপর বসে আছে, অথচ কিছুই জানে না তার। খাণ্ডবপ্রস্থের আগুন তাহলে নেভেনি। তুষের আগুনের মত ধিকিধিকি করে জ্বলছে তাদের বুকে। যে কোনো মুহূর্তে তা দাবানলে পরিণত হতে পারে। অথচ, তার প্রতিরোধের জন্য কোনো রাজনৈতিক প্রস্তুতি নেই। নাভি থেকে উঠে আসা একটা লম্বা শ্বাসের সঙ্গে উচ্চারণ করল, যুধাদিত্য তোমার মত এত স্পষ্ট করে এসব কথা কেউ বলেনি। তাই, একটু বেশি অবাক হচ্ছি। যাই হোক, তুমি বিশ্রাম নাও।

যুধাদিত্যের প্রস্থানের পরেও জনমেনজয় স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। পাণ্ডবদের সঙ্গে নাগদের বিরোধ নতুন নয়। বহুকালের জমানো ঘৃণা, ক্রোধ, বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা থেকে প্রতিশোধাত্মক মনোভাবের জন্ম। ইন্দ্রপ্রস্থের জন্মলগ্ন থেকে তার সূচনা। কারণ খাণ্ডবপ্রস্থের অগ্ন্যুৎপাত দাবানল ছিল না। মানুষের সৃষ্টি। অগ্নিগর্ভ বিদ্রোহ যা কালক্রমে এক গৃহযুদ্ধের আকার নিল। মানুষের রোষ ও ক্ষোভ দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল। কৃষ্ণ অর্জুনের ওপর চাপিয়ে দিয়ে তাদের চরিত্র কলঙ্কিত করল। দোষ স্খালনের জন্য যুধিষ্ঠির এক পাল্টা সমান্তরাল কাহিনি অলৌকিকতার মোড়কে মুড়ে দিল। আগুনের স্মৃতিটা মানুষ ভুলতে পারল না। তাই ক্ষুধার্ত অগ্নিদেবের গল্পটা কারো কাছে গ্রহণযোগ্য হল না। সন্দেহটা রয়েই গেল। উল্টে, খাণ্ডববনের অগ্ন্যুৎপাতে তাদের ভূমিকাকে ইতিহাসের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে এক নৃশংস অমানবিক হত্যাকাণ্ডের কলঙ্কিত নায়করূপে কৃষ্ণ-অর্জুনকে চিহ্নিত করল তক্ষক। অর্জুন এবং কৃষ্ণ যখন ধরাধামে নেই তখন তাদের নিয়ে এক নতুন বিতর্ক সূত্রপাত করল তক্ষক ও শৃঙ্গি।

জনমেনজয়ও জানে অভিযোগগুলো সত্য নয়। এগুলো জোর করে অস্বীকার করা যায় হয় তো। কিন্তু ইতিহাস তো কোনো কৈফিয়ত মানবে না? একটা গভীর সত্য এর মধ্যে লুকোনো আছে। সেই লুকোনো রহস্য উদ্ঘাটন না হওয়া পর্যন্ত নাগদের সঙ্গে বিবাদের কোনো সুরাহা হবে না। নিবিষ্ট চিত্তে সে কথা ভাবতে ভাবতে এক সুদূর অতীতের মধ্যে প্রবেশ করল।

নিজের ভাবনায় জনমেনজয় এতই অন্যমনস্ক ছিল যে মাদ্রবতীর আগমন টের পেল না। পুত্রের কাঁধে আস্তে হাত রাখল তাতেই জনমেনজয় কেঁপে উঠল। মাদ্রবতী জিগ্যেস করল, এত ভাবছিস কী?

ভাবনার কি শেষ আছে?

মাকেও বলা যায় না?

তোমার কাছেই আমার জিজ্ঞাসা। পাণ্ডবদের উন্নতি, সৌভাগ্য, খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার মূলে যাঁর অবদান কোনোকালে বিস্মৃত হওয়ার নয় সেই কৃষ্ণ সখা পাণ্ডবদের জন্য ইতিহাস সৃষ্টি করতে গিয়ে নিজেই ইতিহাসের হাতে বন্দী হয়ে রইলেন। পরবর্তী প্রজন্মের চোখে তিনি কি শুধুই ইতিহাসের কলঙ্কিত নায়ক! একথা তো সত্য। কৃষ্ণ অর্জুন মিলে খাণ্ডববনে গৃহযুদ্ধের আগুন জ্বেলেছিলেন। তাদের ধর্মীয় ভাবাবেগকে উস্কে দেবার জন্য তো সরল সাদাসিধে মানুষগুলো নিজেদের ভেতর খণ্ডযুদ্ধ বাধিয়ে বনভূমিতে এক অগ্নিগর্ভ-পরিবেশ সৃষ্টি করল। তার ফলে গৃহযুদ্ধের যে আগুন জ্বলেছিল এবং বিরাট সংখ্যক মানুষ নিহত হল তার নেপথ্য নায়ক তো কৃষ্ণ-অর্জুনই ছিল। এরকম জঘন্য হত্যাকাণ্ডের জন্য অনুতপ্ত হওয়ার বদলে তারা অগ্নি ও শ্বেতকী রাজার গল্প জুড়ে দিয়ে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডকে মহিমান্বিত করলেন। এরপরে কোন যুক্তিতর্ক দিয়ে নিন্দুকদের বক্তব্য খণ্ডন করব? রাজনীতি তো মানুষকে নিয়ে। সুতরাং কোনো অমানবিক ব্যাখ্যা দিয়ে তার কৈফিয়ত হয় না। দুর্ভাগ্য! বড় দুঃসময়ে আমার জন্ম। সেই বংশের সন্তান হওয়ার জন্য অপরাধী মনে হয় নিজেকে। আস্ফালন করার জোর পাই না মনে। তবু মনকে প্রশ্ন করি, যে কৃষ্ণ মানুষের সেবায় নিজের সারা জীবন উৎসর্গ করলেন কিন্তু নিজের সুখের দিকে কখনও ফিরেও তাকাননি। ক্ষমতার লোভ তাঁকে স্পর্শ করেনি। যিনি অখণ্ড ভারতরাজ্য গঠন করার স্বপ্ন সফল করার জন্য অকাতরে নিজের যা কিছু সব দু'হাতে বিলিয়ে দিয়ে দুঃখী দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের দুর্দিনের বন্ধু হয়েছেন তাঁকে মানবতার হত্যাকারী ভাবি কেমন করে? এরকম অমানবিক জীবনমেধ যজ্ঞে তাঁকে এবং পিতামহকে খলনায়কের ভূমিকায় কলঙ্কিত করতে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরই বা সম্মত হলেন কেন? মানুষের প্রতি ঘৃণার এই উগ্রমূর্তি তো কৃষ্ণের চরিত্রে এবং ব্যক্তিত্বে দেখতে পাই না। তা-হলে দেব-দানব-মানব-ও-জীবজন্তুর গল্প বানিয়ে কে বা কারা তাঁর চরিত্র কলঙ্কিত করল? তা না জানা পর্যন্ত নানাজাতির সঙ্গে আমাদের বিবাদ-বিদ্বেষের মীমাংসা হবে না। সাধারণ বুদ্ধিতে বলে, পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানের পর এবং কৃষ্ণের তিরোধানের পর শত্রুরা এরকম এক আষাঢ়ে গল্প রচনা করে কৃষ্ণ-অর্জুনের মহানুভবতার গায়ে অপবাদের তকমা এঁটে দিয়েছে।

কৃষ্ণ ও অর্জুনকে নির্দোষ প্রমাণ করার পরিপ্রেক্ষিতে পুত্রের মনে যে প্রশ্ন জাগল তা শুনে মাদ্রবতী প্রীত হল। বলল : বৎস, এ এক বিরাট ষড়যন্ত্রের কাহিনী। ঘটনার আদ্যোপান্ত না জানলে কোথায় অসংগতি আর কোথায় কত মানুষের কত রকম স্বার্থ ও অভিপ্রায় কাজ করছে তা বুঝবে না। বহুবার তোমাকে একথাটা বলার চেষ্টা করেছি। কিন্তু পারিনি। সময় হলে তুমি প্রশ্ন করবে এই বিশ্বাস নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম। আমার সে প্রতীক্ষা সফল হল।

ওসব অর্থহীন কথা শোনার মন নেই আমার। একেবারে সূচনা থেকে কী হয়েছে বল।

তাহলে তো এক বিরাট উপাখ্যান শোনাতে হয়। ইতিহাসের সে নিরপেক্ষ বিচার আমার কাছে যেমন সুখকর নয়, তেমনি তোমার কাছে প্রীতিপ্রদ নয়। অনেক অপ্রিয় সত্য তোমাকে আমাকে পীড়িত করবে। কারণ আমি পাণ্ডববংশের বধূ, আর তুমি ঐ বংশের সন্তান।

তাতে কী হয়েছে। তুমি আমি চুপ করে থাকলে তো ইতিহাস থেমে থাকবে না। একদিন চাপা পড়া কথাস্তূপ খুঁজে ইতিহাস তার ফসিল উদ্ধার করবেই।

মাদ্রবতী কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল। মাথার মধ্যে অদ্ভুত একটা বোবার ভাব। বেশ বোঝা যাচ্ছিল কথাগুলো দ্রুত পর্যালোচনা করছিল নিজের মনে। থমথমে গলায় বলল, শতশৃঙ্গ পর্বত থেকে যেদিন পাণ্ডুপুত্ররা একদল ব্রাহ্মণ ও মুনি-ঋষিসহ একত্রে মৃত পিতার শবদেব বহন করে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করল সেদিন থেকে হস্তিনাপুরে তাদের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে একটা বিরাট প্রশ্ন সকলের মন জেগেছিল। এরা কী সত্যিই পাণ্ডুর পুত্র? তাদের মনের সে সংশয় দূর করতে মুনি-ঋষিরাই বলল, পাণ্ডুর ইচ্ছাক্রমে চারজন পাহাড়ি রাজার ঔরসে পাণ্ডুমহিষীদের গর্ভে এরা একে একে জন্মগ্রহণ করেছিল। এরা হল পঞ্চপাণ্ডব। বিরোধের সূত্রপাতটা এখান থেকে। হস্তিনাপুরে পদার্পণের প্রথম দিন থেকেই এদের গায়ে কৌরবের বদলে পাণ্ডবের তক্‌মা এঁটে দেওয়া হল। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা কেউ ধার্তরাষ্ট্র হল না, তারা কৌরবই রয়ে গেল। এক পরিবারের মধ্যে পাণ্ডব এবং কৌরবের জন্ম হল, সূচনা হল উত্তরাধিকারিত্ব নিয়ে অন্তর্বিরোধ। পাণ্ডবদের আগমনে কৌরবরা খুশি হয়নি। তাদের চোখে পাণ্ডবরা ছিল বহিরাগত। ভিনদেশের নরপতিদের মাধ্যমে এদের জন্ম বলে হস্তিনাপুরে তাদের আশ্রয় দিতে ধৃতরাষ্ট্র এবং ভীষ্মের আপত্তি ছিল। তবু ঘটনাস্রোত তাদের অনুকূলে গেল। রাজপুরীতে আশ্রয় পেল। এমন কি সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব পর্যন্ত।

জনমেনজয় বলল, এতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে?

মাদ্রবতী বলল, আছে বৈকি। তারা যে পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্র তার প্রমাণ কী? মুখে বলল, আর পাণ্ডুর পুত্র হয়ে গেল—তাই কখনও হয়? মুনি-ঋষিরা কে, যে ওদের কথা মানতে হবে। প্রমাণ কোথায়? পারিবারিক অনুমোদন এবং স্বীকৃতি ছাড়া পরিবারের অজান্তে পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পুত্ররা হয়েছে। ব্যাপারটা খুব গোলমেলে ছিল।

হস্তিনাপুরের চোখে কুন্তীর সন্তানেরা অবৈধ। উত্তরাধিকারিত্ব নিয়ে তাই প্রশ্ন উঠল। পাণ্ডুর পরিচয় নিয়ে যে পাঁচজন বালক এল—তারা কারা? এদের রাজ্য দাবি করার অধিকার কোথায়? প্রশ্ন তো হতেই পারে। রাজ্যের উত্তরাধিকারিত্ব সেই দাবি করল কিন্তু পাণ্ডু জীবিত থাকতে হস্তিনাপুর ফিরল না কেন? এর কোনো সদুত্তর কুন্তীর কাছে ছিল না। তাই অনেক আটঘাট বেঁধে কুন্তী কাজ করেছিল, দৈব তার সহায় হয়েছিল।

জনমেনজয় ভুরু কুঁচকে বলল, এ কথা বলছ কেন?

লোকচরিত্র অভিজ্ঞতা দিয়ে কুন্তী বুঝেছিল, দেবপুত্রদের দেখার জন্য রাজপুরীতে কৌতূহলিত নাগরিকরা ভিড় করবে। লোকলজ্জার সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করল কুন্তী। তাদের স্বীকৃতি নিয়ে কৌরব পরিবার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠতে যত বিলম্ব করছিল নাগরিকদের গুঞ্জন, কটূক্তি, ধৃতরাষ্ট্র এবং পিতামহকে ততই অস্বস্তিতে ফেলল। পাণ্ডু-পত্নীরা অবৈধ সন্তানের জননী একথা রাষ্ট্র হয়ে গেলে হস্তিনাপুরের রাজপরিবারের সুনাম নষ্ট হবে তাই মানসিক চাপে পড়ে কুন্তী ও কৌন্তেয়দের স্বীকার করে নিল। কুন্তী নিজস্ব প্রজ্ঞা বলে বুঝেছিল, মৃত মানুষ জীবিত মানুষের চেয়ে বেশি জোরে সওয়াল করে। গভীর করে মানুষের অন্তরে পৌঁছে দিতে পারে অনেক অব্যক্ত কথা। পাণ্ডুর শবদেহ বহন করে এনে কুন্তী প্রমাণ করল পাণ্ডুর শবদেহ যতক্ষণ আছে ততক্ষণ কেউ তার বিপক্ষে যাবে না। বরং সব বিরোধিতা এবং প্রতিকূলতাকে তার অনুকূলে ঘুরিয়ে দিতে পারে। শবদেহই পারে বুক ভাসিয়ে দয়া, মায়া, মমতা, করুণা, সমবেদনা, সহানুভূতির ঢল বইয়ে দিতে। এই হল মহারাজ পাণ্ডুর হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের গোড়াপত্তনের নাটক।

জনমেনজয় ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, ছিঃ। পাণ্ডববংশের বধূ হয়ে এসব কথা বলতে তোমার লজ্জা করল না!

মাদ্রবতী বলল, লজ্জা পাওয়ার কী আছে? এটা একটা বংশের উত্থানের ইতিহাস। রাজনৈতিক ঘটনাস্রোত মহিষী কুন্তীকে বাধ্য করেছিল জয়ের একটি সহায়ক শক্তি খুঁজে নিতে। একজন পুরুষ রাজনৈতিক উত্থানের জন্য হীন কাজ করলে তার সাফল্য নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। কিন্তু একজন নারী পুরুষের মত পরাজয় থেকে যদি সুকৌশলে বিরাট জয় আদায় করে নেয় তাহলে তা দোষের হবে কেন? তাঁর বুদ্ধিমত্তাতেই পাণ্ডববংশের উদ্ভব, বিকাশ এবং ব্যাপ্তি। ইতিহাসে একথাটা লেখা হলে তাঁর গৌরব কিছুমাত্র কমবে না। পাণ্ডববংশের উদ্ভব এবং প্রতিষ্ঠা তাঁর হাতেই হয়েছিল। এ তো মস্ত সম্মানজনক কাজ। তিনি ঐতিহাসিক মহিলা, তাঁর জন্য আমার গর্ব হয়। নারীর ভাগ্য জয়ের অধিকারকে আমি ইতিহাস করে তুললাম। সেই ইতিহাসের আমিও একজন কুশীলব। মহীয়সী কুন্তীকে না পেলে কোথায় পেতাম এই গৌরব!

তেরো

সিংহাসনে অভিষেক সম্পন্ন হওয়ার পরে নিজেকে দেশের সর্বময় শাসনকর্তা ভাবতে জনমেনজয়ের সারা শরীরে এক অদ্ভুত আনন্দের শিহরন খেলে যেত। এই বোধটা প্রথম প্রথম এক তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করত। বালক জনমেনজয়, কিশোর জনমেনজয়ের ফেলে আসা স্মৃতি স্তূপের মধ্যে এক নতুন নৃপতি জনমেনজয় উঠে দাঁড়াল। তার চারপাশ থেকে আগলে রাখার স্নেহচক্রগুলি যত আলগা হয়ে পড়ছিল ততই একা হয়ে যাচ্ছিল সে। কিন্তু এই একাকীত্বের মধ্যে নৃপতির সর্বময় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাকে অনুভব করল সে। যতদিন যায়, ততই নিজস্ব শক্তি আবিষ্কার করে। রাজ্যশাসন তার জন্মগত অধিকার। সে সম্রাট, একজন যোদ্ধাও বটে। যুদ্ধ তো শুধু রণক্ষেত্রে হয় না, রণক্ষেত্রের বাইরেও জীবনের সঙ্গে জীবনের এবং পরিবেশের যে অহরহ যুদ্ধ, সেটা চোখে দেখা যায় না, কিন্তু মনের ভেতর সারাক্ষণ ধরে তার রক্তক্ষরণ হতে থাকে।

নতুন বিবাহ, নতুন প্রণয, জীবনে প্রথম নারীকে নিয়ে সুখের স্বপ্ন দেখা, আবেগের মোহন আবরণে ঢাকা কামনা জনমেনজয়কে শান্তি দেয়, কিন্তু শান্ত থাকতে দেয় না। নিবিড় বাহুবন্ধনের মধ্যে তরুণী-ভার্যা বপুষ্টমা স্বামীর উদ্বেগ টের পায়। দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বলল, স্বামী, তোমাকে সর্বদা অন্যমনস্ক মনে হয়। তোমাকে আমার করে পাই না কেন? তুমি এত কি ভাবো? তোমার ভাবনার সাগর থেকে একমুঠো উদ্বেগের ফেনা নিয়ে যদি কিছুক্ষণের জন্য জীবনের সফেন সমুদ্রে আমরা সাঁতার কাটি তা-হলে ভাবনার সমুদ্র কী বিক্ত হয়ে যাবে?

একটা অদ্ভুত ভাললাগার আবেশে জনমেনজয়ের কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়। অভিভূত গলায় বলল, বপুষ্টমা! এমন কাঙালের মত চাইলে প্রেম ছোট হয়ে যায়। এই না পাওয়ার ভাবটাই প্রিয় মিলনকে মধুর করে। অনুক্ষণ সহজে পাওয়াতে বোধ হয় প্রেমে তেমন মজা থাকে না।

বপুষ্টমার চোখে ধূর্ত হাসি। জীবনরহস্য বোঝার কৌতুক। বলল, নববধূর কাছে পাছে ধরা পড়ে যাও তাই কথা দিয়ে নিজেকে মুড়ে রাখছ। কিন্তু কী হয়েছে তোমার? তোমার অনিচ্ছুক মনের কারণে আমার সব আনন্দ, সুখ টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে।

অবাক চোখে চেয়ে রইল জনমেনজয়। বলল, মনের কথা মনই জানে। মনকে দেখার চোখ ক'জনের থাকে।

ভাগ্যিস, মনটাকে খালি চোখে দেখা যায় না, তাই এত ছলচাতুরী চলছে।

আমি মানি না। ভালবাসার মানুষের মনের গন্ধ ফুলের গন্ধের মত আপনি ছড়িয়ে যায় তেমনি যে মানুষের মন ছোট সে যতই মহত্ত্বের ভান করুক না কেন তার সংস্পর্শে এলেই কেমন একটা অস্বস্তি লাগে। বুকের মধ্যেও একধরনের নিরানন্দ এবং কষ্ট হতে থাকে। বুঝলে মশাই, ভালবাসা দেনেওয়ালা যদি খাঁটি হয় তাহলে তার লেনেওয়ালার অভাব হয় না কোনোদিন।

বপুষ্টমা জবাব দেবার কথা খুঁজে পেল না। প্রিয় মানুষের কাছে হেরে যাওয়ার মধ্যে এক তীব্র সুখ লুকোনো থাকে। হয়তো, সে কারণেই মন আলো-করা প্রসন্নতায় তার চোখের পাতা ভাব হয়ে গেল। তারপর জনমেনজয়ের বুকে মুখ রাখল অনেকক্ষণ ধরে। মুখ ডুবিয়ে স্থির হয়ে রইল। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে প্রিয় পুরুষের কপালে, চোখে, চিবুকে, গলায়, ঠোঁটের ওপর ঠোঁট রেখে চুমু খেতে লাগল শব্দ করে। ওর নাকের নিশ্বাস উষ্ণ হয়ে উঠল। বুকের গতি দ্রুত হল।

জনমেনজয় হাসতে লাগল। বপুষ্টমার আমন্ত্রণ জানানো শরীরের দিকে লুব্ধ দুটি হাত উত্তেজনায় স্পন্দিত হল। অমনি বপুষ্টমা নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, আজ আর নয়। তোমাকে বড় কাছে পেতে ইচ্ছে করছিল। একেবারে নিজের মত করে পেতে লোভ হয়েছিল।

জনমেনজয় ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, আমি তো তোমারই ছিলাম। তোমারই আছি। থাকবও চিরকাল। যখন খুশি আমাকে ডেকে পাঠাতে তো পারতে। দেখ, আমি সব কাজ ফেলে তোমার কাছে দৌড়ে যাব ঠিক।

হঠাৎ দুরন্ত অভিমানের সাগর উথলে উঠল বপুষ্টমার বুকের ভেতর। কানটা তেতে গিয়ে লাল হল। বলল, এই মিথ্যে কথাটা না বললে কী হত না?

জনমেনজয় অবাক হল। বপুষ্টমার চোখের উপর চোখ রেখে অপরাধীর মত আস্তে আস্তে বলল, তোমার অভিযোগের কারণটা যে অনুভব করি না তা নয়। কিন্তু দুই মেরুর মানুষ বলে তোমার আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আমার দায়িত্ব-কর্তব্য, সময়ের মেলবন্ধন হয় না। তোমার আবেগ, ইচ্ছে, সুখ, তৃপ্তি সবই সোজাসুজি। হৃদয়কুসুম আপনি ফোটে, আপন আনন্দে বিকশিত হয়। কোনোরূপ মুখাপেক্ষী নয়। যে সুখ-শান্তিতে তুমি ভরে ওঠ, সেই মনটা সত্যি হারিয়ে গেছে। শান্ত চন্দ্রালোকিত পৃথিবীর মত প্রিয়ার বুকে লীন হয়ে যেতে আমারও খুব ইচ্ছে হয়। কিন্তু আবেগ ফুরিয়ে গেলে দেখি আমার সব পুঁজি হারিয়ে বসে আছি। তোমার মত সহজ স্বাভাবিক হতে না পারলে মুক্তি কোথাও নেই। তোমার কাছে যা মুক্তি আমার তা বন্ধন। সেই বন্ধনের চাপে সমস্ত সত্তা লাল হয়ে ফুলে উঠে। তখন লোভীর মত তোমার দিকে তাকিয়ে বলি, আমি রিক্ত, আমি নিঃস্ব। তোমার একটু করুণা পেলেই আমি খুশি।

বপুষ্টমা স্বামীর কথায় চমকে উঠল। কষ্টের সঙ্গে উচ্চারণ করল, এত ভয় কেন?

শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে থাকলে কার না ভয় হয়। মিত্রের বড় আকাল। আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় তটস্থ থাকি। কতরকম সংকটের মধ্যে কাটাতে হয় আমাকে। অন্তঃপুরের বাসিন্দা হয়ে তুমি তা টেব পাও না। কারো গায়ে তার আঁচ লাগতে দেই না। আমার সমস্যা সমাধান তো আমাকেই করতে হয়। তাই, নিত্য উদ্বিগ্ন অসহায়তার মধ্যে কাটে। শান্তিতে থাকার উপায় নেই আমার।

বপুষ্টমা সন্দেহের গলায় বলল, এত অশ্রান্তির আশঙ্কা কেন? অশান্তি একটা অসুখ।

এ অসুখ একবার যার হয়, সারা জীবন পস্তাতে হয় তাকে। সে নিজেও শান্তি পায় না, অন্যকেও শান্তিতে থাকতে দেয় না।

বপুষ্টমার অদ্ভুত যুক্তি জনমেনজয়কে একটু অবাক করল। এমন অভিযোগে মনটা খারাপ হয়ে গেল। দু'চোখের পাতায় গভীর বিষণ্ণতা নেমে এল। বলল, অশান্তি অসন্তোষ থাকেই। যে কোনো মাটিতেই আগাছার মত গজিয়ে উঠে। অযত্ন অবহেলাতেও এর জীবনীশক্তি ক্ষয় হয় না। এর কোনো বিনাশ নেই। সময়ের মধ্যে মানুষের মূল্যবোধ বদলে গেছে। প্রজাদের রাজানুগত্যের ভাঁড়ার শূন্য। রাজরক্ষীকেও তারা ভয় পায় না। অবিচার, অত্যাচার এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মনোবল, তাদের সাহস, শক্তিকে এমন জায়গায় এনেছে যে মরতে ভয় পায় না তাবা। তক্ষক তিল তিল করে তাদের আত্মার মধ্যে গণজাগরণের মন্ত্র ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাদের চোখে আগুন, বুকে বিতৃষ্ণা, ঘৃণার দাহ। তাদের অভিযোগের ভাষাও মার্জিত নয়। মানী ব্যক্তিকে সম্মান পর্যন্ত দেয় না। তাদের ধারণা. অনার্য এবং উপজাতি বলেই তারা আর্যদের ঘৃণা, অবহেলা, অনাদরের শিকার। দলপতিরা তাদের যা বোঝায় তাই বোঝে। নিজেদের বিচার বুদ্ধির অভাব বলেই স্বার্থান্বেষী রাজশক্তি তাদের দিয়ে যা খুশি তাই করছে। অশান্তির এই হেতুটা সমূলে বিনাশ করলে তবে শান্তি ফিরবে।

জনমেনজয়ের বিপন্ন অসহায়তাবোধ হঠাৎ তাকে করুণায় আপ্লুত করল। বুকের মধ্যে কত কী যেন গলে গেল। স্বামীর খুব কাছে এসে নাকটা মুচড়ে দিল। লম্বা নাকটা ধরে একবার এদিক একবার সেদিক নাড়িয়ে দিয়ে বলল, মশাই, সব দিন কী এক রকম যায়? সবদিনের ঘটনাও এক নয়। প্রতিদিনই নতুন। নতুন চমক, নতুন বিস্ময় নিয়ে কখনও অবাক করছে আমাদের, কখনও বা বোকা বানাচ্ছে, কেউ কেউ রাজা-উজীরও হচ্ছে, আবাব ভিখিরি হচ্ছে। এর মধ্যে কোনো বিস্ময় নেই।

তা হয়তো নেই। কিন্তু সহজ জিনিসটাকে আরো কঠিন করে দিলে'

বপুষ্টমার অধরে মোহন হাসি। বলল, তোমার হতাশ হওয়ার কারণটা বলবে?

খুব বেশিদিনের কথা নয়। বধূবরণ উৎসবে কুকুর উপজাতিদের দুটি ছেলে প্রহরীদের দৃষ্টি এড়িয়ে মলিন জামা-কাপড় পরে একেবারে ভোজের আসরে ঢুকে পড়েছিল। রাজকীয় সাজ-সজ্জা, সমারোহের ভেতর তাদের উপস্থিতিটা এতই বেমানান এবং পীড়াদায়ক ছিল যে, কনিষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয় ভীমসেন এবং অশ্রুসেন ঘাড় ধরে ওদের বের করে দিতে গেলে ঘাড় থেকে শক্ত হাতটাকে তারা জোর করে সরিয়ে দিয়েছিল। তাতেই দু'ভাই খেপে গিয়ে তাদের প্রহার করল।

ওই দুই শিশু মার কাছে গিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে তাদের নির্যাতন এবং লাঞ্ছনার কাহিনি শোনাল। তখন বালকদ্বয়কে নিয়ে একেবারে ভোজসভায় হাজির হল তাদের জননী। এমন এক নাটক করল যে, লোকলজ্জার ভয়ে নগরপাল আমরা কাছে হাজির করল তাদের। মহিলা প্রশ্ন করার অবকাশ দিল না। হিংস্র রাগে, আক্রোশে সে গরর্‌গরর্‌ করছিল। দুই চোখ তার জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল। কথা বলায় সময় গলায় শিরাগুলো

ফুলে ফুলে উঠল। রুক্ষ গলায় উস্মা প্রকাশ করে বলল, মহারাজ, আপনার রাজত্বে আমরা খাজনা দিয়ে বাস করি। আপনার এই বিলাস-বৈভব, আনন্দ-স্ফূর্তি সবই আমাদের মত গরিবদের টাকায়। গরিব সংখ্যালঘু বলে আমরা কী জানোয়ার হয়ে গেছি। আমার দুটি বাচ্চা রাজবাড়ির জাঁক-জমক, আড়ম্বর চোখে দেখেনি। ওরা ছেলেমানুষ। দেখার কৌতূহল নিয়ে একটু ভেতরে গিয়েছিল। খাদ্যবস্তুতে হাত দেওয়া তো দূরের কথা, নজর পর্যন্ত দেয়নি। তবু তাদের সঙ্গে ইতর প্রাণীর মত আচরণ করল আপনার ভাই। পথের কুকুরের মত তাদের পেটানো হল। কারণ, ওদের জামাকাপড় ছেঁড়া, ময়লা,—কিন্তু ওর বেশি যে জোটে না। ঐ পোশাকে যে রাজবাড়ি আসতে নেই এই বোধবুদ্ধি হয়নি বলেই এসেছিল, নইলে আসতো কি? তবু ওদের ধরে মারা হল। প্রজাদের এই দারিদ্র্য তো ভগবানের তৈরি নয়। মানুষের সৃষ্টি। দেশের রাজা তার প্রতিকারের জন্য করেছেন কি? আদর করার কেউ নয়, কিল মারার গোঁসাই!

কুকুরের মার কথা শুনে আমি তো থ। আমার গলা দিয়ে স্বর বেরোল না। একজন সামান্য উপজাতির ঘরের স্ত্রীলোক এত জ্ঞানগর্ভ কথা গুছিয়ে বলল কী করে? রাজার সামনে দাঁড়িয়ে অভিযোগ করার এই শিক্ষা ও সাহস পেল কোথায়? কে তার মনে ভয় ভাঙাল? এসব কথা বলতে কার কাছে শিখল? এইসব প্রশ্নে আমি স্তম্ভিত। এক গভীর অপরাধবোধে আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। সারা দেহে একটা উত্তাপ প্রবাহ বয়ে গেল। তার উষ্ণতা মনের ভেতর চারিয়ে গেল। ভীষণ শ্রান্তবোধ করছিলাম। মনে হল, আমার চারদিকে ঘন অন্ধকার নেমে এল। উৎসবের যে হাওয়াটা মনকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল আনন্দের পাহাড়চুড়ো পার করে অন্য পাহাড় চুড়োয়, সেই হাওয়া কুকুর মায়ের অভিযোগ হয়ে অন্য পাহাড় চুড়ো থেকে কালো মেঘের কালিমা নিয়ে ফিরে এল যেন।

বপুষ্টমা বলল, তুমি একটুতে বড় আবেগপ্রবণ হও।

রূঢ় বাস্তবের কথা। কুকুরের মা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল ; রাজা বিনা দোষে তোমার ভাইরা আমার পুত্রদের মারল। এর ফল তোমরা হাতে হাতে পাবে। তোমার পিতা ঋষিতুল্য ব্যক্তিকে অপমান করার ফলভোগ করেছিল। একপক্ষকালের মধ্যে। আমার কথাও অন্যথা হবে না। কাল বদলাচ্ছে। গরিব বুভুক্ষু মানুষগুলোকে তোমরা মানুষ মনে কর না। তারা কিন্তু জন্তু-জানোয়ার নয় যে, বিড়াল কুকুরের মত দূরদূর করবে। ভুলে যেও না তারা আর ঘুমিয়ে নেই। যা খুশি বুঝিয়ে দেবে তাও নয় তারা। তাদের ঘুম ভাঙছে। তোমাদের চরম সর্বনাশের দিন ঝড়ের বেগে তেড়ে আসছে। এমন সব ভয়, আতঙ্ক, উৎপাত তোমার সামনে আসবে যে তুমি সামাল দিতে পারবে না। অন্যায় না করে তোমাদের চাবুক মারার দিন শেষ হয়ে গেছে। নিরপরাধীকে বিনা দোষে শাস্তি দিলে তারাও তোমার শাস্তির দাবি তুলবে—ঈশ্বরের কাছে, অদৃষ্টের কাছে।

এসব কথা বলে কুকুরের মা কখন চলে গেল জানিও না। উল্লসিত আমন্ত্রিতদের কোলাহল, এবং দুপ্‌দাপ্‌ করে ব্যস্ত কর্মীদের দৌড়াদৌড়ির পায়ের শব্দে আমার ঘোর কাটল। কুকুর মায়ের কথাগুলো, তার অভিশাপ, আমাকে ভীষণ বিদ্ধ করল। মনে

হল কালের ঘন্টাধ্বনি আমি শুনতে পাচ্ছি। কলির পায়ের শব্দ পাচ্ছি। আমার নিজের চোখ নিজের দিকে তাকিয়ে আছে। যেখানে এক অজ্ঞাত গুহার অন্ধকার সেইদিকে ফেরাল সে চোখ। বাবার মৃত্যুটা আমার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। কেমন একটা ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছিল আমার ভেতরটা। আমি মুখে বলছি, এসব কিচ্ছু নয়, একটা মিথ্যে ভয়কে আঁকড়ে ধরার কোনো মানে নেই, তবু আমার সমস্ত অনুভূতির মধ্যে সর্বনাশের ঝড় বয়ে যাচ্ছিল।

বপুষ্টমার হাসি ব্যঙ্গের মত বিঁধল জনমেনজয়কে। তির্যক কটাক্ষ তার দুই চোখে। বপুষ্টমা বলল : তুমি একটা পাগল। সামান্য একটা কুকুরের মায়ের আস্ফালনে এত ভীত হওয়ার কী আছে? এই নিয়ে দুশ্চিন্তারও কিছু নেই। শকুনের অভিশাপে কী গরু মরে? হায়রে কপাল, এখন দেখছি কুকুরের গালমন্দে, রাজার রাতের ঘুম গেছে। রাজার প্রিয় স্ত্রী সান্নিধ্যও বিষবৎ বোধ হয়। এতখানি, বাড়াবাড়ি তোমার শোভা পায় না।

জনমেনজয় বলল : শত্রু যত ক্ষুদ্রই হোক, তাকে অবহেলা করতে নেই। কুকুর একটা সংখ্যালঘু উপজাতি মাত্র। তার অভিযোগ, অনুযোগ উড়িয়ে দেওয়া সহজ। কিন্তু প্রকারান্তরে সে আমাকে সতর্ক এবং সজাগ করে দিল। নিচুতলার মানুষকে আর বশে রাখা যাচ্ছে না। খিদের চাবুক, অবহেলা, অনাদর, উপেক্ষার যন্ত্রণা তাদের সারা অঙ্গে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে। সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে আমাদের ঔদাসীন্যের কারণে। দেওয়ালে ওদের পিঠ ঠেকে গেছে। তুমি দেখতে পাও না, কিন্তু আমি দেখছি, কালবৈশাখীর ডাকাতে মেঘ আকাশে জড় হচ্ছে।'

স্বামী, রাজনীতির আসল কথা হল শত্রু নিধন। কুকুরের আস্ফালন শুনে আমারও মনে হচ্ছে, বেচারী বড় নির্বোধ। তোমার কাছে তাদের শত্রুতার যদি খবর থাকে, তা-হলে তাকে বাড়তে না দিয়ে সমূলে বিনাশ কর। তক্ষকের শত্রুতাকে ভয় করে অকারণ ভয়ের প্রশ্রয় দিচ্ছ। মনের অভ্যন্তরে ভয় বাসা বাঁধলে ভয়ের ভূত তাড়ানো খুব শক্ত কাজ। তাই বলছি ভয়ের ভূত তাড়াও এবং তক্ষকের বিষদাঁত এখনি ভেঙে দাও। শক্ত হাতে সমস্ত শক্তি দিয়ে চতুর্দিক থেকে রুখে দাঁড়াও। সন্ত্রাসকে সন্ত্রাস দিয়ে রুখতে হয়।

কাজটা যত সহজ ভাবছ, ততটাই কঠিন। তক্ষকের বিষদাঁতের বিষ অনেক গভীরে ছড়িয়ে পড়েছে। নইলে, রাজ অন্তঃপুরে নিরাপত্তা রক্ষীকে বোকা বানিয়ে পিতাকে হত্যা করার সাহস হত না। কার্যত, হস্তিনাপুরের সার্বভৌমত্বকে গুঁড়িয়ে দিয়ে তক্ষক প্রমাণ করল হস্তিনাপুরে অবিসংবাদিত আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। সেই একমাত্র নেতা। সে চাইলে, নাগ-বিরোধী রাজ্যগুলিতে অনুরূপ আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারে, যা আগে কেউ সাহস করেনি। ফলে, আতঙ্কমিশ্রিত একটা সমীহও সৃষ্টি হয়েছে তার প্রতি। কিন্তু এই খবরটা কতটা সত্য, কতটা অভিসন্ধিমূলক প্রচার তা যাচাই করার ক্ষমতা সেই মুহূর্তে হস্তিনাপুরের ছিল না। তাই, তক্ষকের বিরুদ্ধে কোনোরকম ব্যবস্থা নিতে তারা স্বেচ্ছায় বিরত ছিল। সমস্যা যাই হয়ে থাকুক তাকে

খুঁচিয়ে ঘা না করার নীতি নিয়েছিল তারা। তারও কারণ ছিল। হস্তিনাপুরকে হঠাৎ নাগরাজ্য বলে দাবি করে বসল তক্ষক। এই অভিনব দাবিতে নাগেরা উল্লসিত হল। অতীতে হস্তীনাগ বলে একজন এখানে রাজত্ব করতেন। তখন এর নাম ছিল হস্তিনাগপুর। সেও অনেককাল আগের কথা। কুরুবংশের পরাক্রমশালী রাজা হস্তী দিগ্বিজয় যাত্রা করে এই রাজ্য জয় করে কুরুসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করল। তাঁর নামেই নতুন রাজ্যের নামকরণ হল হস্তিনাপুর। এটি অতীতে নাগরাজ্য ছিল। তাই এ দেশ এবং রাজ্য তক্ষককে ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি উঠল। তাই সংঘাত এড়িয়ে যাওয়ার জন্যই মা তাদের উপেক্ষা করতে লাগল। মা'র ঔদাসীন্য এবং নীরব অবহেলার কারণে প্রকাশ্য বিরোধ জমল না, কোনোরূপ উত্তেজনাও সৃষ্টি হল না। আস্তে আস্তে তার সম্পর্কে বীরত্বমিশ্রিত যে শ্রদ্ধা সৃষ্টি হয়েছিল তা ক্রমেই ফিকে হয়ে গেল। আনুগত্যকে ধরে রাখার জন্য তক্ষক ঘরে ঘরে আদি মাতা কদ্রুর পূজা প্রচলন করল। নাগজাতির বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিরোধ ছিল আস্তে আস্তে তার উত্তাপ কমল এবং সৌভ্রাত্রবোধের সেতু তৈরি হল। বিচ্ছিন্নতার জায়গায় এক জাতি, এক প্রাণ এই ভাবাবেগে তাদের ঐক্যবদ্ধ হল। ফলে, ভারত-রাজনীতিতে একটা থমথমে অবস্থা বিরাজ করছিল।

বপুষ্টমা বলল, হস্তিনাপুরের কথা না হয় ছেড়ে দিলাম। কিন্তু তক্ষক একজন খুনি। একজন আতঙ্কবাদী। তার ভয়ে গোটা ভারতবর্ষ স্তম্ভিত হয়ে রইল। অথচ তাকে শায়েস্তা করার জন্য কেউ কিছু করার চেষ্টা পর্যন্ত করল না। কাকে বলব? তুমিও তো সেই ভয়ে ভুগছ। রাজত্ব হাতে পেয়ে পিতৃহন্তা খুনির বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কিছু করতে পারলে না। তক্ষক এবং তার অনুগামীরা প্রকৃতপক্ষে কী করতে পারে, আর পারে না তা নিয়ে যে নবপুরাণ তৈরি হল তা কতটা সত্য যাচাই করে দেখেছ?

যাচাইর সময় পেলাম কোথায়? তার আগেই তো বিতর্ক শুরু হয়ে গেল।

প্রশ্রয় পেলেই হবে। কার্যত, তোমরাই তার স্রষ্টা। তাই তার মনোবলে একটুও চিড় ধরেনি। ভারতবর্ষে একজন রাজাও সাহস করে তাকে নতি স্বীকারে বাধ্য করতে পারল না। তাই সে নিরন্তর আক্রমণের হুমকি দিচ্ছে। ত্রাস সৃষ্টি করছে, সন্ত্রাসের দোর প্রান্তে নিজেকে টেনে এনে একটা জোর বিতর্ক সৃষ্টি করে প্রচারের কেন্দ্রে থেকে আধিপত্য স্থাপন করছে। এটা করতে পারার জন্য তোমাদের স্নায়ুর ওপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হচ্ছে সে। এও এক ধরনের সাফল্য তার।

ঠিকই। কিন্তু নাগজাতিকে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য কেউ যদি সত্যি প্রাণ দিতে চায় সে কেবল পারে তক্ষক। বলাবাহুল্য, কাজের দ্বারা নিজের একটা ভাবমূর্তি করে বিরোধীদের অন্তরে আতঙ্কমিশ্রিত একটা শ্রদ্ধার মনোভাব সঞ্চার করতে সফল হয়েছিল সে। আমরা যতই তাকে রক্তচোষা স্বৈরতন্ত্রী বা নাগদের জল্লাদ বলি না কেন, তাদের গৌরব বাড়াতে হেন কাজ নেই যা তক্ষক করেনি। নাগসম্প্রদায় তার কাছে কৃতজ্ঞ। কারণ, তার আগে নাগদের গৌরবকে সবাকার চোখের সামনে এত বড় করে কেউ মেলে ধরেনি। এটাই তক্ষকের বড় সাফল্য।

বপুষ্টমা মুখ টিপে হাসল। বলল, তুমিও তার একজন ভক্ত হয়ে গেলে।

সকলের দৃষ্টিকে সে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়েছে—এটা কী কম কথা! এমন হবার কথা ছিল না। কিন্তু হস্তিনাপুরের শত্রুরা, বিরোধীরা গোপনে তক্ষককে মদত দিচ্ছে। যুধাদিত্যের সংবাদ সত্যি হলে তক্ষকের মৃত্যুতে এ সংগ্রামের পরিসমাপ্তি হবে না। এক তক্ষক যাবে, আর এক তক্ষক আসবে। বোধহয় সে দিনটা খুব বেশি দূরে নেই। সেজন্য হস্তিনাপুরে যে সব নাগরা বাস করে তাদের তাতানোর জন্য হস্তিনাপুরকে নাগরাজ্যের অন্তর্গত বলে নতুন করে দাবি করছে যাতে তারা বিদ্রোহী হয়। সেকারণে হস্তিনাপুরের অভ্যন্তরে একটা ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে তোলার ছক করেছে তারা। অবস্থা খুবই ঘোরাল। তক্ষক যাই ভেবে থাকুক হস্তিনাপুর তার পুরো অস্তিত্ব নিয়ে ইতিহাসের পাতায় অটুট থাকবে স্রেফ বুদ্ধির জোরে। তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমার ওপর একট ভরসা রাখ শুধু।

চোদ্দ

হস্তিনাপুরের অভ্যন্তবে আতঙ্ক এবং অস্থিরতা বেড়ে যাওয়ায় জনমেনজয় বেশ চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হল। নিজেকে তার ভীষণ বিপন্নবোধ হল। রাজ্যে প্রভাবশালী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং ধনবান ব্যক্তিরা হঠাৎ তক্ষকের দলবলের হাতে অপহৃত হতে লাগল। মুক্তিপণ আদায় করে তাদের মুক্তি দেওয়া হচ্ছিল। এর ফলে সর্বত্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। রাজ্যে অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে জনমনে জনমেনজয়ের প্রতি একটা ঘৃণা উদ্রেক করা এবং রাজকার্য পরিচালনায় তার যোগ্যতা সম্পর্কে অনাস্থা জাগ্রত করা ছিল তক্ষকের উদ্দেশ্য। প্রশাসন দুর্বল হওয়া মানে ক্ষুব্ধ-হতাশ মানুষকে দলে পাওয়া। তাদের সমর্থন এবং সহানুভূতি জনযুদ্ধকে শক্তিশালী করছিল। তক্ষকের এই অভিনব কৌশল জনমেনজয়ের মনোভাবকে কঠোর করল। তার ভুল রাজনীতির পথ ধরেই তক্ষকের ঔদ্ধত্য বৃদ্ধি পাচ্ছিল। পাছে, আর একটা কুরুক্ষেত্র সৃষ্টি হয় তাই যুদ্ধ এড়িয়ে চলছিল। কিন্তু সংঘাত বাধানো যাদের নীতি, যারা ক্রমাগত সংঘাতের ক্ষেত্র তৈরি করছে এবং সংঘাতকে নানা ছলে অনিবার্য করে তুলছে তখন তাদেরও সংঘাত করা ছাড়া এ বিবাদ এড়ানো যাবে না। যুদ্ধ বাঁধানো তার উদ্দেশ্য নয়। তবু যুদ্ধের জয় পরাজয় দিয়ে এই সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। যুদ্ধ করে কোনো সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, তবু মেরে এবং মরে জেতার বিচিত্র নেশায় লক্ষ লক্ষ মানুষের স্তিমিত প্রাণ হঠাৎ জাতীয় আবেগে উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। সেজন্য চাই একটা নিখুঁত পরিকল্পনা।

তবু পাঁচরকম ভাবনায় মন বিভ্রান্ত হয়। বিচলিত হয়। জীবন ও যুদ্ধের অন্তিম ক্ষণে দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে যে কথাগুলো বলেছিল থেকে থেকে সেই কথাগুলো প্রতিধ্বনিত হয় জনমেনজয়ের অন্তঃকরণে। ধর্মরাজ, যুদ্ধ মানে অবাধ হত্যাকাণ্ড নয়, যে কোনো উপায়ে বর্বরের মত প্রতিপক্ষের প্রবল যোদ্ধাদের হত্যা করে নিজে বাঁচার

নাম যুদ্ধ নয়। এটা হল, বর্বরের নৃশংসা হত্যাকাণ্ড। আঠারো দিনের যুদ্ধে তোমরা সেই কাজটাই করেছ। পিতামহ ভীষ্ম এবং আচার্য দ্রোণকে নির্দয়ভাবে হত্যা করে তোমরা বিবেক, নীতি, ধর্ম, ন্যায়কে হত্যা করেছ। কোনো যুদ্ধনীতি মাননি। তোমাদের বন্ধু, উপদেষ্টা, নেতা কৃষ্ণের উৎসাহে, পরামর্শে হত্যার রাজনীতি করেছ। বালক অভিমন্যু তোমাদের ভুল সিদ্ধান্তের বলি হয়েছে। অভিমন্যু তো একা যুদ্ধ করেনি, বিশাল পাণ্ডববাহিনী ছিল তার সঙ্গে। সে ছিল সৈন্যাধ্যক্ষ। সপ্তরথীর সঙ্গে তার যে যুদ্ধ হল, তোমরা বীর পুঙ্গবেরা মৃত্যুভয়ে সরে থাকলে। তার পাশে দাঁড়ালে না। আশ্চর্য তোমাদের নীতিজ্ঞান। ভয়ঙ্কর যুদ্ধে সে যখন সৈন্যবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একা হয়ে গেল তখনও সপ্তরথী তার ওপর তীর বর্ষণ করেনি। যুদ্ধ হয়েছিল ভাইয়ে ভাইয়ে। দুই কিশোরের। আমার পুত্রের সঙ্গে তোমাদের পুত্রের। তারা দু'জন দুজনকে আঘাত করে নিহত হয়েছিল। তবু আমাদের নামে মিথ্যে কলঙ্ক লেপন করলে। প্রচার কৌশলেব আড়ালে নিজেদের দোষ, অযোগ্যতা ঢাকলে। মানুযেব চোখে আমাদের চির অপরাধী করে রাখার চাতুরীতে তোমাদের কাছে হেরে গেলাম। তোমাদেব দেওয়া অপবাদ এবং নিন্দে নিয়ে আমাদের বাঁচতে হবে। আজ আমার বেলাতেও সব রণনীতি লঙঘন করে কাপুরুষের মত কৃষ্ণের প্ররোচনাতে ন্যায়, নীতি বিসর্জন দিয়ে আমাকে হত্যা করলে। কিন্তু এত সব করেও কী পেলে তুমি? আমি তো অনেক পেয়েছি। ইচ্ছেমত জীবন উপভোগ করেছি। আর তুমি, সমস্ত জ্ঞাতি, বন্ধু, আত্মীয় এবং প্রজাকুল হারিয়ে শুধু কৃষ্ণকে নিয়ে কোন শ্মশানে রাজত্ব করবে? বল ধর্মরাজ, বিবেক কী তোমায় শান্তিতে থাকতে দেবে? তোমার নতুন রাজ্যের বাসিন্দা হবে কারা? সব হারানো মানুষের আত্মীয়েরা, সন্তানহীনা জননী, বিধবা, আর হতভাগা অনাথ শিশু ছাড়া আর কে রইল? এই মহাশ্মশান সৃষ্টির জন্য দায়ী তোমাদের প্রবল রাজ্যলোভ এবং ক্ষমতা-লোভ? অথচ, আমি আপস করতে চেয়েছিলাম। নিজে গিয়েছিলাম শান্তির দূত কৃষ্ণকে বরণ করে আনতে। কিন্তু কৃষ্ণ আমাকে বিশ্বাস করল না, আমার সমাদরকে সন্দেহ করল, আন্তরিকতাকে অবিশ্বাস করল, আমার শ্রদ্ধাকে অসম্মান করল, প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করল। আমার আতিথ্যকে পর্যন্ত অস্বীকার করল। শুধু কৃষ্ণের জন্য আমাদের সন্ধি হল না। বিরোধ মিটল না। কৃষ্ণকে বিশ্বাস করে, কৃষ্ণের পরামর্শ শুনে তোমরা কৌরব-বংশ ধ্বংস করলে, ভারতবর্ষকে অনাথ করলে। এই মহাশ্মশানও কৃষ্ণের সৃষ্টি। তার বন্ধুত্বের উপহার।

দুর্যোধনের কথাগুলো যে কত সত্য ছিল, পঞ্চাশ বছর পরেও জনমেনজয় তা অনুভব করল। রাজ্য-সিংহাসনে বসে যুধিষ্ঠির সুখে ছিল না। এখনও রাষ্ট্রে শান্তি-শৃঙ্খলা নেই। কৃষ্ণের তিরোধানের পরেও তক্ষক নামটি অক্ষয়, অব্যয় হয়ে রইল। তক্ষকের বৈরিতাও কৃষ্ণের সৃষ্টি। তক্ষক কোনো একটি ব্যক্তির নাম নয়। তক্ষক একটি সম্প্রদায়, রাজনৈতিক গোষ্ঠী। একটা জেহাদ বাহিনী গঠন করে নিজেকে সে বিতর্কিত ব্যক্তি করে তুলল। নাগদের জন্য তক্ষকের স্বায়ত্তশাসন দাবি করা কোনো অন্যায়

ছিল না। অনেক আগেই তা মেনে নেওয়ার যেত। কিন্তু পাণ্ডবপক্ষের কিছু কিছু রাজনীতিকের তীব্র বিরূপতা এবং হারজিতের জেদাজেদিতেই তা হল না। ফলে, পাণ্ডবদের এবং পাণ্ডবদের বন্ধুরাষ্ট্রের সমর্থকদের জব্দ করার মনোভাবের পথ ধরে তারা উগ্রপন্থা আশ্রয় করল। তাদের চাপে রাখার ভয় দেখাচ্ছিল তক্ষক। পরীক্ষিৎ চেয়েছিল এই বিবাদের মীমাংসা করতে। কিন্তু ভাল কাজের বাগড়া দেওয়া লোকের অভাব হয় না। পরীক্ষিতের সেই প্রয়াস তার নিজের ভুলেই অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। এতে নাগদের সঙ্গে পাণ্ডবদের শান্তিপ্রয়াসের পথে একটা বড় বাধা সৃষ্টি হল। সেই বাধা অপসারিত করার কোনো পথ খোলা রইল না। জনমেনজয়ও চেষ্টা করল না তার জট খোলার।

এতে লাভ হল তক্ষকের। রাজনীতিতে তাকে এড়িয়ে চলার আর উপায় রইল না, কিন্তু জনমেনজয়ের রাজনৈতিক লাভালাভের হিসেবটা একটু অন্যরকম ছিল। তাই সময়ের অপেক্ষায় ছিল। দক্ষিণপন্থী নাগেরা তক্ষকের কাজের নির্মম সমালোচক। তাদের কাছ থেকে একটা বড় ধরনের প্রত্যাঘাত আশা করছিল জনমেনজয়। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা নীতি প্রয়োগ করে তক্ষকের অন্তঃসারশূন্য জনপ্রিয়তার মূলে কুঠারাঘাত করে নিজের সম্প্রদায়ের কাছে তাকে অচ্ছুৎ করা ছিল তার পরিকল্পনা। কিন্তু কাজটা সহজ ছিল না। যুধাদিত্য সেই কথা স্মরণ করে দিয়ে বলল তুমি যা ভাবছ তা হবার নয়। নিজের সুখ-শান্তি, আনন্দ-বিশ্বাস, ঐশ্বর্য, সর্বস্ব ত্যাগ করে যে মানুষ নাগজাতির মুক্তির স্বপ্ন দেখছে, এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে বেড়াচ্ছে দুর্নাম রটিয়ে তার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না। খুন, রাহাজানি, ডাকাতি, অপহরণ করে যে অর্থই সংগ্রহ করুক তার কানাকড়ি সে ছোঁয় না, দেশের কাজে সবটুকু ব্যয় করে।

জনমেনজয় বলল, তক্ষকের সঙ্গে সংঘাত যখন অনিবার্য হবে তখনই তাকে আক্রমণ করব। আমরা বিশ্বাস উদাসীনতাও এক ধরনের অস্ত্র। এই অস্ত্রে নিপুণ প্রয়োগ যে করতে পারে সেই জানে কী ভয়ংকর তার শক্তি। তার প্রতি নজর না দেওয়া এবং উদাসীন থাকাটাই হবে তার কাছে চরম অপমানের এবং সবচেয়ে অস্বস্তির। তার নজর কাড়ার সব পথ যখন অকেজো হয়ে যাবে তখন কী করে সেটাই আমার দেখার বিষয়। আমার কাছে খবর আছে, সাধারণ মানুষ প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। মহাবল দানবের মত সাধারণ মানুষ যেদিন তার বিপক্ষে রুখে দাঁড়াবে সেদিন বুঝবে তার জনপ্রিয়তা কত অন্তঃসারশূন্য। বোধ হয়, সেদিনটা খুব দূরে নয়।

উতঙ্কের সঙ্গে তক্ষকের একটা বিরোধ ছিল, সেটা কাজে লাগানোর পরামর্শ দিল মাদ্রবতী। মন্ত্রণাসভায় বিশ্রামকক্ষে তার জন্য প্রতীক্ষা করছিল জনমেনজয়। সে আসতেই তাকে সযত্নে এবং সসম্মানে কাছে বসাল জনমেনজয়। একটা বড় তাকিয়া তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, বস ভাই। আরাম করে বস। জমিয়ে না বসলে কি

মন খুলে কথা হয়। এমন একটা সংকট সময়ে রাজত্ব করছি যে, আরাম কথাটা ভুলে গেছি। সে যাই হোক, আপনার মন ভালো আছে তো? মুখে বিষণ্নতা কেন ভাই? কী হল, এখনো দাঁড়িয়ে আছ? বসতে সংকোচ হচ্ছে? সংকোচের কী আছে? আমরা সমবয়সী। পরস্পরের বন্ধু হতে পারি। আমরা একই সময়ের সঙ্গী। বস।

দ্বারীর দিকে তাকিয়ে ইশারা করল, এক গ্লাস শরবত আনার জন্য।

উতঙ্ক জনমেনজয়ের আকস্মিক সমাদরে একটু হক্‌চকিয়ে গেল। এটা রাজার কোন ধরনের কৌতুক মনে মনে তার হিসেব করছিল। তার আন্তরিকতা কতখানি সত্য তাও বোঝার চেষ্টা করল। মুখে যাই বলুন, তাঁর আদেশই সব। তাই, পাশে বসার সময় অনেক কিছুই মনে হচ্ছিল তার। আবার, কাছে বসেও স্বস্তি পাচ্ছিল না। উসখুস করছিল। মনে হচ্ছিল, তার চতুর চোখ দুটি বইর পাতার মতই খুলে খুলে দেখছিল আদ্যোপান্ত। তার বোধবুদ্ধির জরিপ করছিল। আর সে একটা কঙ্কাল হয়ে বসেছিল তার সামনে।

পরিচারিকা শরবত রাখল উত্তঙ্কের সামনে। তারপর করজোড় করে বিদায় নিল। দ্বারীও দ্বার বন্ধ করে দিল। রুদ্ধদ্বার কক্ষে এবার তারা দুজন মুখোমুখি বসল। উতঙ্কের একটু ভয় হচ্ছিল। তবু যথাসম্ভব নিজেকে সংযত রাখল। জনমেনজয় বলল : আপনি কিন্তু স্বাভাবিক হতে পারেননি। বিশ্বাস করতে ভয় হচ্ছে। আমি আপনার মিত্রতা চাই।

মিত্রতা! আমাকে? আপনার মিত্র হওয়ার কোন্ গুণে গুণী?

যদি বলি বিশ্বস্ততা, সততা, আনুগত্য হল সেই গুণ।

বিস্ময়ে চমকাল উতঙ্ক। তক্ষকের ওপর আক্রোশটা তার কাছে যত বড় হোক জনমেনজয়ের কাছে তার কোনো গুরুত্ব নেই। এমন কি এই বিরোধ-বিদ্বেষ তাঁর জানার কথাও নয়। তবু যেভাবেই হোক জনমেনজয় সেটা জেনেছে এবং নিজে থেকে তার প্রতিকারের কথাও বলছেন। উতঙ্ক তাই খুব আশ্চর্য হল। জনমেনজয় তার প্রতিকারহীন ব্যথার জায়গাটায় যেন হাত দিল। আর তাতেই ব্যথা লাগার মত ঝলকে ওঠল তার সুদূর অতীত।

গুরুপত্নীর আদেশ পুরণ করাই ছিল তার গুরুদক্ষিণা। সেইমত রাজা পৌষ্যের পত্নীর হীরকখচিত কুণ্ডল দুটি রানিমার কাছ থেকে ভিক্ষা করে এনে তাকে দিতে পারলেই গুরুদক্ষিণা দেওয়া হবে তার। উতঙ্ক ঐ কুণ্ডল জোড়া নিয়ে আশ্রমে ফেরার পথে তক্ষকের দল তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল। গুরুপত্নীর কাছে মিথ্যেবাদী এবং চৌর্যবৃত্তির অপরাধে অপরাধী হওয়ার ভয়ে সে তক্ষকের সাক্ষ্যপ্রার্থী হলে নানাভাবে লাঞ্ছিত এবং প্রহৃত হল। তক্ষক তার সব কথা শুনে বলল : এই মূল্যবান অলঙ্কারটি একজনের ভোগ বিলাসের সামগ্রী হওয়ার চেয়ে জনহিতকর কাজে ব্যবহৃত হলে তার গৌরব বৃদ্ধি পাবে। আপনি এই ভিক্ষালব্ধ রত্নদ্বয় স্বাধীনতাপ্রিয় নাগজাতির স্বাধীনতাযুদ্ধের উদ্দেশ্যে দান করুন।

উতঙ্ক মরিয়া হয়ে তাঁকে বোঝাল, এই কুণ্ডলদ্বয় আমার জীবনমরণ। আমার সততা, বিশ্বস্ততার নিদর্শন। এগুলো গেলে আমার বাঁচা অর্থহীন। ঐ অলঙ্কারের সঙ্গে তাহলে আমার জীবন গ্রহণ করুন। জীবনের বিনিময়ে ঐ কুণ্ডলদ্বয় আপনার কাছে আমি ভিক্ষা চাইছি।

তক্ষক তখন কুণ্ডলদ্বয় প্রত্যর্পণ করল। কিন্তু বিলম্বে পৌঁছনোর জন্য গুরুপত্নীর কাছে তাকে ভীষণভাবে লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হতে হল। গুরুপত্নীর সেই তিরস্কার এবং কটু কথার জন্য তক্ষককে দায়ী করল। এবং তার প্রতি বিদ্বেষভাবটা থেকে গেল।

উতঙ্কের নীরবতা এবং তার অভিভূত আচ্ছন্নভাবটা জনমেনজয়ের অধরে প্রত্যয়পূর্ণ হাসি ফুটিয়ে তুলল। বলল, তক্ষকের ওপর প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে করে না?

উতঙ্কের মুখখানা শুকিয়ে গেল। বিবর্ণ ভয়ে মাথাটা একটু ডান দিকে হেলাল। যার অর্থ হ্যাঁ।

জনমেনজয়ের অধরে কৌতুক হাসি। সাপের জিভের মত লিকলিক করছিল। বলল, রাজনৈতিক বন্ধুত্বকে অমন ভয়ানক গম্ভীরভাবে গ্রহণ করতে নেই। এও এক খেলা। এ খেলায় জেতাটা বড় কথা। কে কী করে জিতল সেটা বড় কথা নয়।

উতঙ্কের মুখের কথা জোগাল না। জনমেনজয় তাকে নিয়ে কি খেলা খেলতে চাইছে সেটা স্পষ্ট নয় তার কাছে। তাই যথাসম্ভব গম্ভীর রইল। জনমেজয়ের এরকম উদ্দীপিত বাক্যের প্রত্যুত্তরে তার মুখে কথা জোগাল না।

জনমেনজয়ের অধরে বাঁকা হাসি ধনুকের মত বঙ্কিম হল। বলল, আমাকে বিশ্বাস করতে সংকোচ হচ্ছে তো?

অবিশ্বাস করার মত কোনো কিছু ঘটেনি তো।

তক্ষক তোমার অনেক ক্ষতি করেছে। তুমি তার শোধ নিতে চাও? আমি তোমাকে সাহায্য করব। সব কাজ রাজাকে মানায় না। তাই, দেশের স্বার্থে এবং তোমার ক্ষোভ মেটাতেই, তক্ষকের বিপক্ষে কিছু কর। তোমার বুদ্ধি আছে,— কোন্ কাজে কী ভূমিকা হতে পারে তা অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে করে যাও। আমার মা বলেন, যুদ্ধ তো শুধু খোলা মাঠে সবার সামনে খোলা তরবারি দিয়ে হয় না। চোখের আড়ালেও এক ভয়ংকর যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে হারজিত-ও হয়।

উতঙ্ক বলল, আমার কাছে আপনি কী প্রত্যাশা করেন?

রাজায় রাজায় লড়াই সবাকার চোখে পড়ে। কিন্তু লোকচক্ষুর বাইরে রাজনীতির যে গোপন সংঘাত সহযোদ্ধা, সহকর্মী এবং অনুগতদের আনুগত্যের গর্ভদেশে জ্বলে, সর্বদা তাকে উত্তপ্ত রাখতে হয়। নিরন্তর সংঘর্ষের সেই জমি প্রস্তুত করতে পারলেই আমি খুশি।

আমার ওপর এরূপ প্রত্যাশার কারণ জানতে খুব ইচ্ছে করছে। আপনার কাজের কতটুকু যোগ্য আমি, নিজেও তা জানি না। তবু আমার প্রতি আপনার এই ভরসার হেতু কী জানতে খুব ইচ্ছে হয়।

রাজনীতির এ দিকটা তুমি বেশ ভালই জান। শীতল সংঘাত বাঁধাতে হাত তোমার পাকা।

উতঙ্কের মুখে কথা সরল না। কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পরে বলল, আপনার এ-গুরুদায়িত্ব বহন করতে কতখানি পারব তা ঈশ্বর জানে। আপনি আনুগত্যের কথা বলছেন। আনুগত্য তো পদ্মপাতার নীড়। ক্ষমতার আঠায় আটকানো থাকে। যতক্ষণ ক্ষমতার শীর্ষবিন্দুতে থাকছে তক্ষক ততক্ষণ তার প্রতি লোকের আনুগত্য।

জনমেনজয় বলল, চমৎকার কথা বলেছ ভাই। বিচ্ছিন্ন করার পথ তো একরকম নয়, হাজার রকম। আর একটা কুরুক্ষেত্র তৈরি না করে যদি-ভাঙনের পথে জয় হয় তবে সর্বান্তঃকরণে তা করতে পার তুমি। তক্ষককে কোণঠাসা এবং একঘরে করে দাও। এমন পরিবেশ তৈরি কর যাতে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়।

খুব অল্পদিনের ভেতর উতঙ্ক নিজেকে তৈরি করে নিল মহৎ ভূমিকা পালনের উপযোগী করে। মানুষের সঙ্গে মিশে বুঝল হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসনের প্রতি একটা শুভেচ্ছার স্রোত তখনও প্রবাহিত ছিল। এক ধরনের ভালবাসাও ছিল। তাকে কাজে লাগালে ভাল ফল মিলতে পারে বলে বিশ্বাস। বেশ কিছুদিন কেটে যাওয়ার পরে উতঙ্ক জনমেনজয়কে বলল, মহারাজ, মৌনী হয়ে দিন কাটানোর সময় শেষ হয়েছে। এখন আপনাকে সরব হতে হবে। রাজশক্তি বলে যে একটা ভয়ংকর শক্তি আছে সেটা প্রত্যেককে জানান দেবার সময় হয়েছে। রাজশক্তি নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকা মানেই রাজা দুর্বল, ভীরু, অক্ষম। কোনো সিদ্ধান্ত নিতে ভয় পান। সবসময় তার হারার ভয়, হারানোর ভয়। এই ধারণাটা তক্ষকের শক্তির উৎস। কিন্তু এই ধারণাটা যে ভীষণ ভুল, বেঁচে উঠার পথ নয়, কার্যত কোনা শুভ থেকে কোনো শুভতর কিছু হবে না এই ধারণাটা অনুগত বন্ধুদের কাছে অধরা রয়ে গেছে।

জনমেনজয় কথাগুলো মন দিয়ে শুনল। বলল : কিন্তু স্বার্থবিসর্জনের সংগ্রামে যে মানুষ দীক্ষিত, দেশ ও জাতির প্রতি যাদের দেহ মন নিবেদিত তাদের স্তব্ধ করে দেওয়া সহজ কাজ নয়। রক্তবীজ অসুরের মত, একজনের জায়গায় আর একজন আসবে। ইতিহাসের নিয়ম মেনেই তা আসবে। একবার সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লে আর নিস্তার নেই। অনন্তকাল ধরে সংগ্রাম জিইয়ে রাখার এই কৌশল আমাকে ভীত করে তুলেছে।

উতঙ্কের অধরে স্মিত হাসি। বলল, মহারাজ, মাঝে মাঝে আচমকা অতর্কিত কিছু কিছু ঘটনা ঘটে মূল ঘটনাস্রোতকে বদলে দেয়। হঠাৎ তা ইতিহাস হয়ে যায়। কালবৈশাখীর ঝড়ে হঠাৎই সব ভেঙে তছনছ করে। সব কিছু নিমেষে লণ্ডভণ্ড পাকিয়ে দেয়। আবার কখনও কখনও বদল আসে পরিবর্তনের রথে চেপে। একটা ঝটিকা আর একটা দীর্ঘ পরিক্রমণের পথ ধরে মানুষের ইতিহাস পাল্টায়। মনে হচ্ছে, কালবৈশাখীর ঝড়ে তক্ষকের স্বপ্ন-কল্পনা নিমেষে ছারখার হয়ে যাবে। গোটা রাজ্যের

রন্ধ্রে রন্ধ্রে কালবৈশাখীর তাণ্ডব সৃষ্টি হবে। তক্ষকের সাধ্য নেই নিজেকে রক্ষা করার। প্রমত্ত ঝড় ইন্দ্রের সিংহাসনও উড়িয়ে নিয়ে যায়।

উতঙ্কের চোখের উপর জনমেনজয়ের চোখ জোড়া স্থির হয়ে রইল। একটা লম্বা শ্বাসের সঙ্গে তার মুখখানা তৃপ্তি ও স্বস্তি সুখের উল্লাসে ভরে গেল। বলল, নাগনিধন যজ্ঞের সব ভার তোমাকে অর্পণ করলাম। যা করার তুমি কর। আমি জানি তক্ষকের বিষদাঁত ভাঙতে তোমার চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি নেই।

মহারাজ, তক্ষকের নীতি হল প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের পথ এড়িয়ে গিয়ে শাসনব্যবস্থার বিরোধিতা করা এবং ধাপে ধাপে সন্ত্রাস বাড়িয়ে আপনাকে চাপের মধ্যে রেখে স্বয়ংশাসন আদায় করে নেওয়া। কার্যত, তার এই কর্মসূচি নাগরাজ্যগুলিকে নাড়া দিয়েছে, নাগজাতির সব সম্প্রদায়ের মানুষ ঘুম থেকে জেগে উঠেছে নতুন দেশের স্বপ্নে। কার্যত, নাগকুল তক্ষককে তাদের পথপ্রদর্শক হিসেবে মেনে নিয়েছে। কিন্তু শেষনাগ, বাসুকিনাগ, অনন্তনাগ এরা কিন্তু সন্ত্রাস সৃষ্টির বিপক্ষে। এই ধরনের কার্যকলাপে নৈরাজ্য বাড়বে বলে তাদের বিশ্বাস। এঁদের যুক্তিবাদী মন তক্ষকের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অদ্ভুত অদ্ভুত অমানবিক কার্যকলাপকে সমর্থন করে না। তক্ষকের জনপ্রিয়তার শিখরে এঁদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর পৌঁছয় না। নাগদের সাধারণ লোকেরা কিন্তু হানাহানি সন্ত্রাস পছন্দ করে না। পাছে জনপ্রিয়তার পাল থেকে কিছুটা হাওয়া কেড়ে নেয় শেষনাগ এবং বাসুকিনাগ তাই হস্তিনাপুরের বিপক্ষে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিল তক্ষক। সেকারণেই দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল সন্ত্রাসের তাণ্ডব নৃত্য। জনহিংসার যে উন্মত্তরূপ চারদিকে দিন দিন হিংস্র হয়ে উঠছে তাকে দমন করার জন্য বিদ্রোহীদের বন্দী করা, এবং কে অপরাধী আর কে অপরাধী নয় এসব বাদ বিচার না করে স্ত্রী পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে বন্দী করে প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করার মত নিষ্ঠুর আচরণ করে দেখাতে হবে আইনশৃঙ্খলার স্বার্থেই রাজা নির্দয় এবং নিষ্ঠুর হচ্ছেন। রাজ্যের সর্বত্র ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে দেওয়া হোক পৃথক রাজ্যের দাবি ছেড়ে নাগরা মহারাজ জনমেনজয়ের সঙ্গে আলোচনায় বসুন, নইলে তাদের বিরোধিতাকে সমূলে বিনাশ করা হবে। নাগকুলের একজনও বেঁচে থাকা পর্যন্ত এই নাগনিধনযজ্ঞ চলতে থাকবে। এই যজ্ঞ আর্য-অনার্যর পরিচয় মুছে দেবে। সবাই রাষ্ট্রের সমমর্যাদা-সম্পন্ন নাগরিক বলে গণ্য হবে। সবারই পরিচয় হবে ভারতবাসী।

উতঙ্কের পরিকল্পনা জনমেনজয়কে চমৎকৃত করল। সন্ত্রাসের তীব্রতা যখন সৃষ্টি হল তখন গোটা হস্তিনাপুরের শাসনযন্ত্রকে নাড়া দিতে পেরেছিল তক্ষক। স্পষ্ট হয় গেছিল তার দুর্বলতার দিক, অক্ষমতার দিক। নির্দয় হত্যার তাণ্ডব নৃত্যে সে বেশ মুষড়ে পড়েছিল। বেশ বুঝতে পারছিল, একটা বৃহৎ যুদ্ধের আতঙ্কে সে তটস্থ থাকত। কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে ভয় পেত। প্রশাসন চলছিল ঢিলেঢালা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের স্মৃতিটা ছিল তার লক্ষ্মণরেখা। উতঙ্ক এসে সেটা মুছে দিল। কিন্তু স্মৃতিসভায় কুকুর জননীর তিরস্কার আজও শুনতে পায়। আমার ছেলেদের বিনা দোষে মারার ফল ভুগতে হবে

তোমাকে। সেদিন খুব দূরে নয়। দেখবে এমন কোনও ভয় তোমার সামনে উপস্থিত হবে যা তুমি ভাবতেও পার না। বিপদকালে তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হবে। এই কথাগুলো সর্বদা তাকে সতর্ক করে রাখে। বিপদ ওত পেতে আছে। তক্ষকের রথের চাকার দাগ তখনও ধুলোয় মুছে যায়নি। তাই সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হয়। এরকম এক সংকট সময়ে উতঙ্কের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব। উতঙ্কই তার ভয় ভাঙাল। বলল, মৃত্যু এখন গা সহা হয়ে গেছে। এখানে ওখানে একটা দুটো মানুষ মরলে জনজীবন তেমন সন্ত্রস্ত হয় না। জীবনের সঙ্গে মরণের বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে গেলে চিরস্থায়ী শান্তির আসন পাকা করতে হলে কিছু মানুষ মরবে, কিছু মানুষের ঘর ভাঙবে। এরই নাম জীবনযুদ্ধ। এ নিয়ে আপনার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে রাখাটাই একমাত্র সত্য। তার জন্য যে কোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকাই রাজধর্ম। রাজধর্ম পালন না করার অর্থ ক্ষমতার অপব্যবহার করা।

উতঙ্কের সেই কথাগুলো জনমেনজয়কে কিছুক্ষণের জন্য আচ্ছন্ন করে রাখল। এরই নাম নিয়তি। বিধাতাই হয়তো উতঙ্ককে তক্ষকের নিয়তির রূপ ধরে পাঠিয়েছেন তার বিষদাঁত ভাঙার জন্য। উতঙ্কের কথায় আশ্বস্ত হল জনমেনজয়। বলল, তুমি ঠিক বলেছ। খুনখারাপিতে তক্ষকের মেতে উঠার আতঙ্কে শেষনাগ, বাসুকিনাগ, অনন্তনাগ ওকে ত্যাগ করেছে। এভাবে তেড়ে ফুঁড়ে ওঠার জন্য শান্তিপ্রিয় নাগজাতি খুব শান্তিতে নেই। তাই, তক্ষককে ত্যাগ করে নিরপেক্ষ থাকল তারা। অসহায়তার শিকার হলে তক্ষক মরিয়া হয়ে গেছিল হয় মার, না হয় মর এই নীতিতে ভয়ংকর হয়ে উঠল।

উতঙ্ক বলল, নিজের আধিপত্য বজায় রাখতে তক্ষক যে ভুলটা করল তার মূল্য দিতে হবে গোটা নাগজাতিকে। আর সেটাই হবে আমাদের জয়ের রাস্তা।

জনমেনজয় বুঝতে পারল, উতঙ্ক খেলার যে ছকটা সাজিয়েছে, তাতে ভালো ফলই হবে। তক্ষকের জন্য গোটা নাগজাতিকে একটা কঠিন মূল্য তো দিতেই হবে। আঠার মত লেগে থাকা আনুগত্য যখন জাত্যভিমান, স্বদেশপ্রেমের বৃন্ত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে খসে পড়তে শুরু করবে তখন ক্রমেই বাড়তে থাকবে তক্ষকের অধঃপতনের গতি। তক্ষকের সঙ্গে গোটা নাগজাতিরই সে কথাটা বোঝা দরকার। এবং বুঝে নিজেকে আবার নতুন করে বেঁচে ওঠার জন্য আত্মান্বেষণের দরকার। আত্মশুদ্ধির জন্য এটুকু প্রায়শ্চিত্ত তাদের করতে তো হবে। যেটুকু কাদা তাদের গায়ে লেগেছে সেটা যে কতখানি বিপজ্জনক ও বিড়ম্বনার ব্যাপার সেটা বোঝার শিক্ষা এতকাল তারা পায়নি। এই কথাটাই স্পষ্ট করে দিল উতঙ্ককে।

জনমেনজয় খুশি হয়ে বলল, নাগনিধন যজ্ঞের যে সিদ্ধান্ত তুমি নিয়েছে, তা আমিও সমর্থন করি। কর্তব্য সম্পাদনের পাশাপাশি উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করার জন্য বলবে, তক্ষকের ফাঁকা আওয়াজ আর ফাঁপা গরম বুলি এবং চোখ রাঙানিকে জনমেনজয় ভয় পায় না। প্রজাদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ নেই। তক্ষকের মত তিনি নাগদের ভাল চান। কিন্তু যে চাওয়া রাজার সম্মানহানি করে সে চাওয়ার ওপর রাজরোষ আছে।

তাই মহারাজ এক বিরাট যজ্ঞ করে সকলকে তা অবহিত করতে চান। দেশের শান্তি শৃঙ্খলা এবং অখণ্ডতার স্বার্থে এই মরযজ্ঞের প্রয়োজন আছে।

নতুন দায়িত্ব, নতুন কর্তব্য মাথায় করে নেওয়ার মধ্যে উতঙ্কের যেমন দুঃসাহস ছিল, তেমন আনন্দও ছিল। ক্ষমতার লোভ মরীচিকার মত কেবল টানে, কখনও ধরা দেয় না। তক্ষক সেই মরীচিকার দিকে ছুটে চলেছিল। দুর্দমনীর এক জেদ তাকে চেপে ধরল। কিন্তু এজন্য যে তাকে কখনও দাম দিতে হবে, সেকথা হয়তো মনে হয়নি। ভাবার দরকার পড়েনি। তক্ষক জানে না জমা-খরচের হিসেব মিলিয়ে তার তৃপ্ত হওয়ার মত কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। নিজের বুদ্ধিমত্তার ওপর তার খুবই আস্থা। দিনের বেশির ভাগ সময় কাটে তার জয়ের রাস্তা তৈরি করতে। তক্ষকও কম নয়, তার কাজকর্মে যথেষ্ট কূটবুদ্ধি এবং কৌশলের ছাপ আছে। নীতি নির্ণয়েও সে অত্যন্ত ক্ষিপ্র। বাইরে তাকে সর্বদা মৌন এবং গম্ভীর বোধ হলেও ভেতরে তার মন সর্বদা কর্মব্যস্ত। কথা বলে সাবধানে হিসেব করে। অসাবধানে কোনো কথা বেরোয় না। তবে, মানুষটা অত্যন্ত স্তুতিপ্রিয়। প্রশংসা শুনতে ভালবাসে। না শুনলে অপমানিত বোধ করে। তক্ষকের চরিত্রের এই দুর্বলতাটুকু উতঙ্ক জানে। তাই তার অভিমানকে আঘাত করে তাকে ক্ষুব্ধ করে জয়ের পথ প্রস্তুত করতে চায়। তাকে উত্যক্ত করার জন্য করল না এমন কোন কাজ নেই। জনমেনজয়ের নির্দেশেই সে এক নতুন খেলা শুরু করল। জিতবার জন্য কখন কোন দান দিলে জয় সুনিশ্চিত হয় তার তীক্ষ্ণ মেধা দুরন্ত ক্ষিপ্রতায় উতঙ্কের মস্তিষ্কে কাজ করে। কিন্তু সমস্ত কাজটাই করল অত্যন্ত সাবধানে এবং মন্থর চক্রান্তে।

তক্ষকের প্রভাব প্রতিপত্তি হ্রাস করার জন্য এবং নাগরাষ্ট্রগুলি থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করার এক চক্রান্তে লিপ্ত থাকল। নাগগোষ্ঠী এবং নাগরাজ্যগুলি থেকে যে রাজনৈতিক সমর্থন এবং সহযোগিতা পেয়ে আসছিল তার পথ একেবারে বন্ধ করে দিল। বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মূল বিরোধ ছিল তার মীমাংসা না করে রাজনৈতিক স্বার্থে স্বরাজ লাভের দাবিতেই তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এই জোট থেকে নিঃশব্দে একজন একজন করে সরিয়ে নিলে জোটটাই মুখ থুবড়ে পড়বে। দলীয় ঐক্য ভাঙার খেলা দিয়ে উতঙ্ক সূচনা করল তক্ষকের স্বপ্ন ভাঙার খেলা।

জনমেনজয়ের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে উতঙ্ক হাত করল বাসুকিনাগকে। তক্ষকের কার্যকলাপে বাসুকি খুশি ছিল না। উতঙ্ক সেই অসন্তোষের সুযোগ নিল। পাণ্ডবদের প্রতি বাসুকির দুর্বলতা ছিল। তাকেই মূলধন করল উতঙ্ক। সবিনয়ে বলল, আপনি পাণ্ডবকুলের হিতৈষী। পাণ্ডবদের শত্রুকে আপনার নিজের শত্রু মনে করেন। তাই স্বজাতি হওয়া সত্ত্বেও তক্ষকের পাণ্ডব-বিদ্বেষকে সমর্থন করেন না। এজন্য মহারাজ জনমেনজয় আপনাকে ভীষণ শ্রদ্ধা করেন। আপনাকে মিত্রজ্ঞানে পূজা করেন।

নাগকুলের আর কেউ নয়, পিতৃহন্তা, সন্ত্রাস-সৃষ্টিকারী তক্ষকই তাঁর এক নম্বর শত্রু। নিজের স্বার্থে তক্ষক গোটা নাগজাতিকে ব্যবহার করছে। নাগকুলের লোকেরা না বুঝেই তাকে অনুসরণ করছে। ফলে, প্রকৃত অপরাধীকে খুঁজতে গিয়ে নিরীহ লোকদের হয়রানি হচ্ছে বলে মহারাজের মনস্তাপের অন্ত নেই। আবার নিরাপত্তার কারণে এসব না করলেও নয়।

উতঙ্কের নরমে গরমে মেশানো কূট ভাষণে চমৎকৃত হলেন বাসুকি। পুলকিত গলায় বললেন, সুদূর প্রাচীনকাল থেকে পাণ্ডবদের সঙ্গে আমার যে সুসম্পর্ক আছে, তা অটুট থাকবে। তক্ষকের জন্য আমাদের পুরনো সম্পর্ক কোনোভাবেই বিঘ্ন হবে না এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি।

দৌত্যকর্মের সাফল্যের গৌরবতৃপ্তিতে উতঙ্কের গৌরবর্ণ মুখখানি শানিত ছুরির ফলার মত চক্‌চক্ করছিল। কেমন একটা অভিভূত আচ্ছন্নতার মধ্যে ডুবে গিয়ে বলল, মহারাজ জানতেন আর কেউ না হলেও আপনি পাশে থাকবেন তাঁর। গোটা নাগকুল আপনাকে মান্য করে। সন্ত্রাসমুক্ত নাগরাজ্যের শান্তি-পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আপনার বন্ধুত্ব ও পরামর্শ তাঁর একান্ত আকাঙ্ক্ষিত।

বাসুকি প্রসন্ন হেসে বিগলিত গলায় বলল, অবশ্যই।

উতঙ্কের জালে ধরা পড়ল বাসুকি। এবার অনন্তনাগকে তক্ষকের কুল থেকে জনমেনজয়ের কুলের দিকে টেনে আনা। কাজটা কঠিন না হলেও সহজ ছিল না। কারণ, তার নিজের সঙ্গে অনন্তনাগের সম্পর্ক ভালো ছিল না। তবু যা দুরূহ, দুরারোহ তাকে জয় করার এক নাছোড় নেশা উতঙ্ককে উদ্দীপিত করল। তাই সামান্য কিছু কথাবার্তার পর আর যখন কোনো কথাবার্তা থাকল না তখন একটা থমথমে স্তব্ধতা বিরাজ করছিল। কথাটা শুরু করা মুশকিল হল। এই মুহূর্তটা কোনো গূঢ় কথা ভূমিকা না করে সূচনা করার শ্রেষ্ঠ সময়। উতঙ্ক নিজের মনেই বলতে আরম্ভ করল। খাণ্ডববন এখন সন্ত্রাসের স্বর্গরাজ্য। খুব অল্পদিনের মধ্যে ঐ অঞ্চলটি মহারাজ নিজ নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু আতঙ্কবাদীরা প্রাণ বাঁচানোর জন্য হোক বা আক্রমণের নতুন ছক করার জন্য চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে গিয়ে আপনার রাজ্যে আশ্রয় নিচ্ছে বলে আমাদের কাছে খবর আছে। এদের ধরপাকড় করার কাজে মহারাজ আপনার সহযোগিতা প্রার্থনা করেছেন।

অনন্তনাগের ভুরুযুগল কুঞ্চিত হল। তাঁর কোটরগত চোখে আগুনের ঝিলিক। উতঙ্কের অনধিকারচর্চা তাঁর প্রশস্ত কপালে চিন্তার গাঢ় কুঞ্চন, নাসিকায় প্রচ্ছন্ন জিঘাংসা। ধনুকের মত বাঁকা ওষ্ঠাধরে প্রতিবাদ যেন ফুঁসছিল। তবু যথাসম্ভব ক্রোধ সংবরণ করে সরল হেসে প্রশ্ন করল, লোকে বলছে বুঝি? আপনাকে ডেকে ডেকে বুঝি, এসব কথা শোনাচ্ছে? তাজ্জব ব্যাপার।

উতঙ্ক অসংকোচে প্রত্যুত্তরে বলল, মানে, এ তো সবাই জানে। এর ভেতর তো কোনো লুকোচুরি নেই।

কিন্তু আমার সবটাই অজানা। তাই, কোনো মন্তব্য করব না। তবে এরকম হলে

এখানকার শান্তি বিঘ্নিত হবে। তখন আমার রাজ্য নিয়ে গর্ব করার কিছু থাকবে না। আমার রাজ্যে সর্বত্র শান্তি ও সম্প্রীতি বিরাজ করছে। কারো উড়ো কথা শুনে তা নষ্ট করতে পারি না।

উতঙ্ক বলল, ভারতবর্ষে আপনার রাষ্ট্রই সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ অঞ্চল কিন্তু তক্ষক বোধ হয় শান্তিতে থাকতে দেবে না আপনাকে।

অনন্তনাগ বলল, আপনি শুধু এই অনুযোগ করে আমাকে আঘাত করলেন। আমার কাছেই আমার মাথা হেঁট করে দিলেন। তবে, এ মিথ্যা প্রচার আমি বিশ্বাস করি না।

উতঙ্ক বলল, তবু যদি বিশ্বাস করার ঘটনা ঘটে তখন যাতে এই আতঙ্ক বন্ধ করতে পারেন সে অনুরোধই আপনাকে করছি।

অনন্তনাগ চুপ করে রইল। উতঙ্কের মনে হল, সে যা চেয়েছিল তা পেয়েছে।

উতঙ্ক খুবই দ্রুততার সঙ্গে নাগকুলের সম্ভ্রান্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের জনমেনজয়ের অনুকূলে টেনে আনায় তক্ষক একেবারে একা হয়ে গেল। সমগ্র নাগরাষ্ট্রে এমন এক গোলমাল পাকাল যে অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হল। আসুরিক শক্তি নিয়ে জনমেনজয় ধেয়ে গেল নাগরাষ্ট্রগুলির দিকে। একটার পর এক নাগরাজ্য জয় করতে করতে উল্কার মত ছুটে চলল। পৈশাচিক প্রতিহিংসায় ধ্বংস করতে লাগল একের পর এক গ্রাম, নগর। চূর্ণ-বিচূর্ণ করল কত সমৃদ্ধ জনপদ। আগুন জ্বলছিল সর্বত্র।

তক্ষকের সন্ধান না পেয়ে দুই তৃতীয়াংশ নিরীহ নাগসম্প্রদায়ের নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধকে নির্বিচারে হত্যা করল পশুর মত। আর কিছু শক্ত, সমর্থ, কর্মঠ পুরুষ ও নারীকে পশুর মত বেঁধে নিয়ে গেল ক্রীতদাস করার জন্য। মৃত্যুর হাহাকার শোনা যাচ্ছিল নাগপল্লীর ঘরে ঘরে।

তক্ষককে না পেয়ে আক্রোশে ফুঁসছিল জনমেনজয়। রণনিপুণ নাগযোদ্ধাদের নৃশংসভাবে হয় হত্যা করা হল, না-হয় বন্দী করে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হল। কৃষ্ণার্জুনের খাণ্ডববন আক্রমণের চেয়েও ভয়ংকর এবং ভয়াবহ ছিল জনমেজয়ের অভিযান। যুদ্ধে সে ভীমের মত নৃশংস। এবং অমানবিক।

অতর্কিত আক্রমণ প্রতিহত করার সময় পায়নি নাগরাজ্যগুলি। যুদ্ধের কোনো প্রস্তুতি ছিল না তাদের। সংঘর্ষকে দীর্ঘদিন জিইয়ে রেখে একটা রাষ্ট্রকে চাপে রেখে তাকে জীর্ণ ও দুর্বল করা ছিল তক্ষকের সমরনীতি। কিন্তু জনমেনজয় দুরন্ত একটা ঝড়ের মত ধেয়ে এল। তক্ষকের স্বপ্নকে খুব অল্পেই ধূলিসাৎ করে দিল। মাত্র কয়েক দিনের আক্রমণে নাগরাজ্যগুলি শ্মশান হল। তক্ষককে জীবিত অথবা মৃত না পাওয়া পর্যন্ত নাগনিধনে ক্ষান্ত হলেন না। বন্ধুভাবাপন্ন নাগরাজ্যগুলির ওপর তাই একের পর এক চড়াও হতে লাগল।

সুউচ্চ পর্বতবেষ্টিত ঘন অরণ্যাঞ্চল অমরাবতীতে তক্ষক আত্মগোপন করেছিল। সেখানে সে খবর পৌঁছলে বিপন্ন নাগকুলের জন্য তার অন্তঃকরণ অস্থির হয়ে উঠল।

নাগজাতির স্বাধিকার অর্জনের জন্য, যে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের লড়াই শুরু হয়েছিল তার সমাপ্তি যে এত করুণ হবে স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। এভাবে কাপুরুষের মত আত্মগোপন করে থাকা তক্ষকের কাছে খুব যন্ত্রণাদায়ক এবং লজ্জাকর হল। শুধু তাকে না পেয়ে জনমেনজয় প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হল একথা মনে হতে আশঙ্কায় দুরু দুরু করে উঠল তার বুকটা। বিশৃঙ্খল হয়ে গেল তার চেতনা। মাত্র কয়েকটা মুহূর্তের জন্য ভাবান্তর হয়েছিল। তারপরেই তীব্র উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছিল তার শরীর। আগুনের হল্কার মত একটা নিশ্বাস পড়ল। ফিসফিস করে নিজেকে শুনিয়ে বলল, একদিন মৃত্যুভয়কে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে তোমার পিতাকে হত্যা করেছি। আজ, তোমার উদ্যত খড়্গের ভয়ে পালিয়ে থাকার মানুষ আমি নই। তোমার সঙ্গে শেষ বোঝাবুঝি আমার বাকি আছে। শুধু সে কাজটা করতেই একবার হস্তিনাপুরে যাব।

জনমেনজয়ের নাগনিধন যজ্ঞের ভয়াবহতা স্মরণ করে পাণ্ডবদের প্রতি সহানুভূতিশীল বাসুকিনাগও অত্যন্ত বিমর্ষ হলেন। তীব্র অসন্তোষে তার মাথার ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছিল। বিবেকতাড়িত হয়েই খররোদ মাথায় নিয়ে পাগলের মত হস্তিনাপুরের দিকে ছুটে যেতেই তাঁকে ধরে ফেলল আস্তিক। বলল, আমি থাকতে তুমি যাবে কেন? তোমার ভাগ্নে আমি। বিদ্যা, বুদ্ধি কোন কিছুতে তোমার চেয়ে কম নই। তোমার কাজ ঠিক করতে পারব।

দেবদূতের মত দিব্যকান্ত বালক আস্তিককে দেখে বাসুকির মনে হল, খাপখোলা তরোয়ালের মত দীর্ঘ আর ধারাল তার তনুশ্রী। মধ্যাহ্নের রোদের আলো পড়ে জ্বল-জ্বল করছিল। এত গভীর করে ভাগিনেয়কে দেখেননি আগে। নির্বাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন। দু'চোখের তারায় বিস্ময়। মাতুলের মুগ্ধতার দিকে তাকিয়ে আস্তিক হাসল। হাসি তো নয়, ধারাল ছুরির ফলা ঝলমল করে উঠল তার ওষ্ঠাধরে। বলল, মাতুল, তক্ষক কোনো দোষ করেনি। নাগজাতির ভালো চেয়েছিল সে। কিন্তু তার কথা তোমার মত কিছু কিছু নাগরাজ শোনেনি। শুনলে, বোধ হয় জনমেনজয় এতটা দুঃসাহস নিয়ে নাগনিধন যজ্ঞে মেতে উঠত না। নাগমেধযজ্ঞের জন্য নাগদেরই আমি দায়ী করব। তোমরা সবাই মিলে যদি তক্ষকের পাশে থাকতে তা হলে এই বর্বর হত্যাকাণ্ড হত না। কী দোষে, তক্ষকের উপর বিরূপ হলে; তোমরা জান? দেশকে, জাতিকে ভালবাসা, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন একটা জাতি হয়ে ওঠা কিংবা স্বাধিকার চাওয়াটা যদি দোষের হয় তাহলে তিনি দোষী। আমার কিন্তু তাঁর জন্য খুব গর্ব হয়। নাগদের একটা বড় অংশ সব সময় তক্ষকের পাশে থেকেছে। দুরন্ত সংকটের দিনে তক্ষকের বিষ-দাঁত ভাঙার খেলায় জনমেনজয় যখন বর্বর হত্যায় মেতে উঠল তখনও তারা ত্যাগ করে যায়নি। প্রাণ দিয়েছে তবু মান দেয়নি। জনমেনজয়ের দয়া, করুণা, অনুগ্রহের কাছে আত্মসমর্পণ করার চেয়ে অগ্নিকুণ্ডে প্রাণবিসর্জন দিয়ে শহিদ হওয়া সম্মানজনক মনে করেছে।

কাঁটা ফোটার যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল বাসুকিনাগের অন্তঃকরণ। প্রস্তর মূর্তির মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আস্তিকের কথাগুলো শুনল। এক গভীর আত্মানুশোচনায় তার মাথা হেঁট হয়ে গেল। অপরাধীর মত উচ্চারণ করল, আমরা ভুল করেছি। তীব্র অস্থিরতায় অনুশোচনায় তার মুখখানা বিকৃত হয়ে উঠল। বলল, তোমার অভিযোগ, অনুযোগের সব দোষ স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই। তার সম্পর্কে আমাদের ধারণা যে কত মিথ্যে ছিল অনেক মূল্যে তা অনুভব করছি। তবু, তার আত্মগোপনই কাল হল। কার্যত তাকে না পেয়েই জনমেনজয় হিংস্র হয়ে উঠল।

আস্তিক প্রতিবাদ করে বলল, তোমার কথাগুলো পরস্পরবিরোধী। সে তো নিজের জন্য আত্মগোপন করেনি। সঙ্গীদের সিংহের মুখে ফেলে যেতে চায়নি। অনুগুতেরাই বাধ্য করেছে তাকে আত্মগোপনে। সে কাপুরুষ কিংবা বিশ্বাসঘাতক নয়। তা-হলে ওরাই তাকে ধরিয়ে দিত। কিন্তু নিজেদের প্রাণের বিনিময়েও তা করেনি। সংগ্রামকে জিইয়ে রাখার জন্য, তার বেঁচে থাকাটা জরুরি ছিল। কিন্তু জনমেনজয়ের লড়াইটা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নয়, তার সংগ্রামটা শুধু তক্ষকের বিরুদ্ধে এটা জানত না। তাই, তাকে জীবিত অথবা মৃত দরকার। সে কথা শোনামাত্র অজ্ঞাতবাসকে থেকে বেরিয়ে এল ধরা দেবে বলে। গোপনে হস্তিনাপুরে রওনাও হয়েছে।

বাসুকিনাগ অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে বলল, তা হলে দেরি করছ কেন? কথা বলে সময় খরচ কর না। এখনই যাত্রা কর। তাকে থামাও। আমরা সব নাগরাজ এক হয়ে জনমেনজয়কে নাগহত্যা থেকে বিরত করব।

খুশির আলোয় উদ্ভাসিত হযে উঠল আস্তিকেব মুখাবয়ব।

খট্ খট্-খট্ দ্রুত ধাবমান অশ্বক্ষুরের ধ্বনিতে প্রকম্পিত হল অরণ্য সমাকীর্ণ পাহাড়ভূমি। তুহিন শীতল বাতাসে সওয়ার হল আস্তিকের কণ্ঠস্বর, তক্ষক।

সেই বিচিত্র আহ্বান—তিষ্ঠ, তক্ষক তিষ্ঠ। ঝড়ে আন্দোলিত বৃক্ষশাখার মত তোলপাড় করে উঠল তার ভেতর। তক্ষকের কাছে অত্যন্ত চেনা গলা বলে প্রতিভাত হল। তবু কানখাড়া করে শুনল সেই আহ্বান। তীব্র একটা আবেগে বুকের ভেতর পাক খেয়ে উঠে এল আস্তিকের নাম। আত্মগতভাবে বলল, আস্তিক! তুমি আস্তিক! শঙ্কায়, উৎকণ্ঠায় টনটন করতে লাগল তার ভেতরটা। হস্তিনাপুরে পৌঁছতে যতটুকু সময় দেরি। তারপরেই শৃঙ্খলিত হবে তার দুটো হাত। শার্দূলের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে প্রহরীরা। মাত্র কয়েক মুহূর্তে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে যাবে তার পৃষ্ঠদেশ।

আস্তিকের ক্ষীণতম স্বরে বিদ্ধ হতে লাগল তক্ষকের মস্তিষ্ক। মনে হল তার মাথার ভেতর আছে এক বিপুলব্যাপ্ত আকাশ আর আস্তিকের তিষ্ঠ-তিষ্ঠ-আহ্বান। মস্তিষ্কের সীমা ছাড়িয়ে কিছুতে যেতে পারছিল না বলে একটা অসহ্য ক্লেশে কষ্ট পাচ্ছিল সে। বাসুকির ভাগিনেয় বলেই তার বিশ্বাসে সন্দেহ, মৈত্রীর মধ্যে বৈরিতার ভাবনা তাকে পীড়িত করছিল। তাছাড়া আত্মসমর্পণ থেকে বিরত হওয়ার জন্য তাকে আহ্বান করছিল, না শত্রুর হাতে তুলে দেওয়ার জন্যই পিছু—ডাকল, বুঝতে পারল না তক্ষক।

নিবিড় সবুজ বনভূমিতে তরল সোনার মত রোদ গলে গলে পড়ছিল। গাছে গাছে পাখি ডাকছিল। মৃদু বাতাসে দুলছিল শালের বড় বড় পাতা। যতদূর চোখ যায়, ঘন অরণ্যের পর্বতভূমি এক শান্ত সবুজ সমুদ্রের মত নিথর হয়ে পড়ে আছে। তার কোনো চাঞ্চল্য নেই, উদ্বেগ নেই। সে এখানে একেবারে একা এবং নিঃসঙ্গ, নিরস্ত্র। সে হল দ্বিতীয় তক্ষক। প্রথম তক্ষকের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল। শালতরুর মত দীর্ঘ পেশীবহুল বলিষ্ঠ চেহারার উদ্দীপ্ত যৌবন জেগে আছে প্রখর হয়ে। বড় বড় নীলাভ চোখ দুটি তার কাকে খুঁজছিল যেন। এই শ্বাপদ-সংকুল অরণ্যে সে আর কাউকে নয়, আস্তিককেই খুঁজছিল। কারণ, সঙ্কটকালে সেই নাকি নাগকুলকে রক্ষা করবে এরকম একটা দৈববাণীর কথা নাগকুল জানে। আস্তিক কি সেই ঐতিহাসিক দাবি পূরণের জন্য আসছে। কথাটা মনে হতে থমকে দাঁড়াল তক্ষক। কেমন আচ্ছন্ন, বিবশ হল তার চেতনা। সে ভুলে গেল হিংস্র শ্বাপদসংকুল অরণ্যের কথা। ভুলে গেল ঘনায়মান আসন্ন রাত্রির কথা। বেশ বুঝতে পারল কেউ তাকে অনুসরণ করছিল।

প্রবল আলোড়ন তুলে কে যেন তার দিকেই ধেয়ে আসছিল। ঘোড়া থেকে একরকম লাফিয়ে নামল আস্তিক। তাকে দেখে মনে হল, এক অজানালোক থেকে নেমে এল যেন কোনো দেবদূত। বলল, তক্ষক, উন্মাদের মত কোথায় চলেছ? থাম। জনমেনজয়ের সঙ্গে নাগজাতির শেষ বোঝাপড়া করব আমি। তুমি বিবাদীপক্ষ জনমেনজয় প্রতিবাদীপক্ষ। তোমাদের বোঝাপড়ার জন্য তৃতীয়পক্ষ হয়ে যা কিছু আমাকেই করতে হবে।

স্তব্ধ বিস্ময়ে তক্ষক চেয়ে রইল তার দিকে। বলল, আশ্চর্য! আমি কত বোকা। বিপদে পড়লে মানুষ বোধ হয় অবুঝ হয়। তুমি আর্যঋষির সন্তান। মাতুল নিজে নাগ হয়েও আমাদের পাশে দাঁড়ানো বিপজ্জনক মনে করে সংস্রব ত্যাগ করেছেন। তাই, সমস্ত পাহাড় কাঁপিয়ে, নিস্তব্ধতাকে খান্‌খান্ করে তুমি যখন ঝঞ্ঝার মত আমার দিকে তেড়ে এলে, তখন একটা বিশ্রী সন্দেহে মনটা ঘুলিয়ে উঠেছিল। কিন্তু বিশ্বাস কর, বিষ সন্দেহের মধ্যে বারংবার মনে হয়েছিল, তোমার জননী নাগকন্যা, নাগকুলে তুমি বড় হয়েছ। মাতুল তোমার যাই করুন, তুমি কখনও নাগস্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ করবে না। পাহাড়ে লোকের মুখে তোমার নাগপ্রীতির কথা শুনেছি। আর যাই হোক, নাগদের বৈরী হবে না এই বিশ্বাসে থমকে দাঁড়ালাম। কিন্তু ভাই, জনমেজয়ের রোষানল থেকে নাগকুলকে রক্ষা করতে পারবে কি?

চেষ্টা করতে দোষ কোথায়?

কী লাভ আমার বেঁচে থাকার? অনুগত বান্ধব, আত্মীয়স্বজন যারা ছিল তারা সকলেই নিহত অথবা বন্দী। আমার বেঁচে থাকা, না থাকা সমান? আমি চাই না বাঁচতে। মরতে বড় ভয় ছিল নাগজাতির। জনমেনজয়ের নিধন যজ্ঞে তারা মৃত্যুঞ্জয়ী হয়েছে। কিন্তু তাদের হাতে আমি কী দিলাম? দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে তাদের মুক্তি দিতে পারলাম কৈ?

বন্ধু, পরিতাপ করে কী করবে? তাতে শুধু দুঃখ বাড়ে, বুকের ভিতরটা হতাশায় ব্যর্থতায় জ্বলতে থাকে। আজ যা হল না, কাল হয়তো তা হবে। হয়তো কোনো দিনই হবে না। যা হল, তাকে ছোট করে দেখতে নেই। সব সময় মনে রাখবে, সময় নিরপেক্ষ। সে কাউকে ভালবাসে না, আবার ঘৃণাও করে না। সবাইকে সবেগে তার দিকে নিরন্তর আকর্ষণ করে। মানুষের সাধ্য কি তার আকর্ষণ থেকে দূরে সরে থাকা। তুমি তো তক্ষশিলায় বেশ রাজত্ব করছিলে। পারলে কি সেখানে জাঁকিয়ে রাজত্ব করতে? খাণ্ডববনের নাগকুল তোমাকে বিপুলবেগে টানতে লাগল। প্রথম তক্ষকের অসম্পূর্ণ কাজের ভার তোমাকে কে নিতে বলল? যারা তোমার পাশে দাঁড়াল না, তারা সবাই কাল-কবলিত হয়েছিল। এই যে আমি হস্তিনাপুরে যাচ্ছি, এও কালের আকর্ষণে। তবে তোমার মত সবেগে নয়, আস্তে আস্তে আকর্ষণ করছে।

নিষ্প্রাণ পুতুলের মত তক্ষক আস্তিকের পাশাপাশি হাঁটতে লাগল। তার ভারাক্রান্ত মনকে চাঙা করার জন্যই আস্তিক বলল, নাগকুলের পুনরুজ্জীবনও কালের ব্যাপার। তুমি নিমিত্ত। তোমার নাগপ্রীতির জীয়নকাঠির জাদুস্পর্শে বিচিত্র নেশায় হাজার হাজার মানুষের স্তিমিত প্রাণ হঠাৎ আলোর বন্যায় জেগে উঠেছিল। তাদের মরা গাঙে বান এল দুকূল ভাসিয়ে। সে বন্যায় নাগকুলের স্বাজাত্যপ্রীতি পরম গৌরবে উদ্ভাসিত হল। জেগে উঠেছিল তাদের অন্তরে শুভ্র মনুষ্যত্বের ঝিলিক। তারা প্রশ্ন করতে শিখল, প্রশ্নের জবাব চাইতে শিখল, নিজের অধিকারকেও মর্যাদা দিল। এসবই কালের দান। তুমি হলে সেই কালের রাখাল। বিপরীত স্বার্থের সংঘর্ষে রথের চাকা ঘূর্ণিত হচ্ছে। ঘটনা-দুর্ঘটনার নিরন্তর সংঘর্ষে তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে হয়। কারো তা থেকে নিষ্কৃতি নেই। একদিন জনমেনজয়কে, কালের রথচক্রের তলায় পিষ্ট হতে হবে। কালের হাত থেকে কারো পরিত্রাণ নেই। ইতিহাস বড় বিচিত্র পন্থায় প্রতিশোধ নেয়।

তক্ষককে সঙ্গে করে আস্তিক রাজদুয়ারে দাঁড়াল। তার আগমন-বার্তা পূর্বেই পৌঁছে গেছিল হস্তিনাপুরে। অভ্যর্থনার সব আয়োজনই করা ছিল। আস্তিক পৌঁছতেই রাজপুরোহিত সাদরে তাকে আবাহন করে আনল। সুগন্ধ গন্ধবারি ছিটিয়ে দেওয়া হল তার ও তক্ষকের গায়।

বিপ্রবেশ ধারণ করেছিল তক্ষক। তাকে হস্তিনাপুরের যে সব প্রবীণরা চিনত তাদের কেউ বেঁচে নেই। তার স্মৃতিও ম্লান হয়ে গেছিল। নবীনরা তার মুখ দেখেনি। তাই সাহস করে আস্তিক তাকে নিয়ে হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করল। অতিথিগৃহে পরমযত্নে উভয়ের থাকার ব্যবস্থা হল।

তক্ষক খুব আশ্চর্য হল। একেবারে সিংহের গুহায় ঢুকে আত্মগোপন করেছে সে। জনমেনজয়ের সাধ্য নেই তাকে খুঁজে পাওয়ার। তার হাতের মুঠোর মধ্যে থেকেও নাগালের বাইরে। খুব হাসি পেল তক্ষকের। নিজের সঙ্গে নিজের এ এক মহাকৌতুক।

সর্বদা একটা টান টান উত্তেজনার মধ্যে প্রতিটি ক্ষণ কাটতে লাগল। যত সময় যায় বুকের ভেতরটা তত ভারী হয়ে উঠল তার।

কার্যত, পরের দিন রাজার সঙ্গে আস্তিকের সাক্ষাৎ হল। একাই ছিল সে। কুয়াশা ভাঙা সূর্যের আলোর মত আশ্চর্য এক কমনীয়তা তার মুখে মাখানো ছিল। উজ্জ্বল কালো সুন্দর দুই আঁখি তারায় বিভোর বিহ্বলতা। কী মিষ্টি তার চেহারা। এমন একটা কমনীয়তা মাখানো ছিল যে দেখলেই চোখ দুটি আঠার মত আটকে যায়।

জনমেনজয়ের সামনে মর্মর মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল আস্তিক। জনমেনজয়ের মনে হল, অনির্বচনীয় যৌবন মাধুরী নিয়ে সুদূর নক্ষত্রলোক থেকে নেমে এসেছে যেন এক অপার্থিব পুরুষ। জনমেনজয়ের দু'চোখে মুগ্ধতা। বলল, দেশের চরম সংকট সময়ে আপনাকে পরম বন্ধুর মত কাছে পেলাম—এর চেয়ে আনন্দ আর কী আছে? আমি যে একা এবং নির্বান্ধব নই সে কথাটা বোঝাতে সুদূর নাগলোক থেকে হস্তিনাপুরে এসে আমার মনোবল বাড়িয়ে দিলেন।

জনমেনজয়ের কূটভাষণে বিচিত্র এক আবেগ সৃষ্টি হল তার বুকের অভ্যন্তরে। মনের ভেতর তার প্রত্যেকটি কথা আলোড়ন তুলল। তাই সব কথা গুছিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে কথা বলতে লাগল আস্তিক। বলল, মহারাজ, আপনার সমাদরে অত্যন্ত প্রীত হলাম। কাল রাতে একটা অদ্ভুত স্বপ্নে মনটা ভার হয়ে আছে। কুয়াশা ভরা রাতে আকাশ ফুঁড়ে হঠাৎ জ্যোৎস্নার আলোর বন্যা বয়ে গেল। আর কে যেন সেই আলো থেকে বলে উঠল, আস্তিক তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছ নিজের সঙ্গে, মায়ের সঙ্গে, তোমার জাতের সঙ্গে। এমন কি সত্যান্বেষী বাবাকেও মিথ্যেবাদী করলে। মাতুলের গোলামি করতেই তোমার ভালো লাগে। তাকে তুষ্ট করার জন্য কর না এমন কাজ নেই। দোহাই, তক্ষকের গায়ে হাত দিও না। কেউ হাত তুলতে পারে এমন কাজ কর না। তার কোনো ক্ষতি তোমাদের কুলদেবতা সইবে না। তক্ষক না থাকলে কোথায় থাকত তোমার মাতুলের নাগ পরিচিতি? তক্ষক তোমাদের শিকড়ের সন্ধান দিয়েছে। যার শিকড় নেই, তার কিছুই নেই। এমনকী তুমিও নেই আস্তিক। কথাটা শেষ হতেই আলোর ছটা মিলিয়ে গেল। এক গভীর কালো অন্ধকারের মধ্যে চোখ মেলে নিজের অস্তিত্বকে পর্যন্ত দেখতে পেলাম না। শ্বাস-প্রশ্বাসে যেটুকু অনুভব করা যায় সেটুকুই আমি। আশ্চর্য লাগল, গোটা অস্তিত্বটাই আমার হারিয়ে গেল কাল অন্ধকারে।

জনমেনজয় স্তব্ধ। অবাক বিস্ময়ে আস্তিকের দিকে তাকিয়ে রইল। বুকের ভেতর এক অব্যক্ত ব্যথা পাথরের মত ভার হয়ে রইল। কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর খুব আস্তে বলল, স্বপ্ন কখনও সত্যি হয় না। তক্ষক সম্পর্কে আপনাদের বীতরাগ স্বপ্নের রূপ ধরে বিভীষিকা সঞ্চার করছে। এজন্য, ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

হয়তো তাই। কিন্তু মনের গোপনে লুকোনো অন্যায় পাপ যে নিরন্তর আমাকে ভর্ৎসনা করছে এতো তারই ভয়ংকর ছবি।

জনমেনজয় নিরুত্তর। আস্তিক একটু থেমে পুনরায় বলল, মহারাজ, বাস্তবে যা ভুলে থাকতে চাই, স্বপ্নের নির্জনতায় ~ই পাপবোধ এবং অন্যায় মনের আকাশে ডানা মেলে দিল। বিবেকের কাছে যে চির অপরাধী হয়ে আছি এই সত্যটা শুধু জানা ছিল না। দেশ ও জাতির অভিযোগ, অনুযোগ, তিরস্কার, ভর্ৎসনা, অভিসম্পাত হঠাৎই স্বপ্নের মুখোমুখি করে আমার আসল আমির সঙ্গে পরিচয় করে দিল। মহারাজ, সত্যিই একজন বড় অপরাধী আমি। এক গভীর ঘন কালো অন্ধকারের ভেতর তাই নিজেকে আমি দেখতে পাইনি। পাব কোথা থেকে? আমার আমিকে হারানোর ভয়ে মাতুল ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল। বাসুকিনাগের সঙ্গে আমার পিতা মহর্ষি জরুৎকারুর আত্যন্তিক প্রীতি ও বন্ধুত্ব তার ভগিনীর পাণিগ্রহণে বাধ্য করেছিল। বোধ হয়, নাগকন্যা বলেই আর্যত্বের অভিমানে জরুৎকারু মুনি আমার জননীকে মেনে নিতে পারেনি। একদিন অতি তুচ্ছ কারণে তাকে অপবাধী করে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। আমি তখন মাতৃগর্ভে। বিদায়ের সময় জননীকে শুধু বলে গেলেন, মহাতেজা যে পুত্র জন্মাবে তার নাম আস্তিক রাখবে। এই পুত্র তোমাদের নাগকুলের বিপদের সহায় হবে। সংকটকালে নাগকুলকে রক্ষা কববে। নাগকুলের বড় বন্ধু হয়ে থাকবে চিরকাল।

বলতে বলতে আস্তিক জনমেনজয়েব চোখের ওপর চোখ রাখল। জনমেনজয়ের আত্মতৃপ্ত মুখাবয়বে স্মিত হাসিটি কৌতুকে গোলাকার হল। বলল, নিজেকে নিয়ে আপনি বেশ তামাশার তাস খেলতে পারেন। চমৎকার নিটোল গল্প। ভীষণ মজা লাগছে।

আস্তিক মন্তব্য করল না। পূর্ব্ববৎ বলতে লাগল, কিন্তু দুর্ভাগ্য, পিতার কোনো ইচ্ছেই পূরণ হল না। হতভাগ্য জননী আমায় নিয়ে যে স্বপ্ন দেখত তাও নাগালের বাইরে রইল। শুধু শান্তিকামী মাতুলের ইচ্ছের নাগপাশে বন্দী হয়ে আমার কোনো কর্তব্যই করা হল না। একচিলতে মলিন হেসে বিষণ্ন গলায় বলল, আমার আছে কি, যে স্বপ্ন দেখব? পিতার ইচ্ছে, মায়ের প্রত্যাশা পূরণ করার কোনো সম্বল আমার নেই। তবু, বিগত রাতের স্বপ্ন মিথ্যে নয়। আমার অপরাধপ্রবণ মনের ছবি। আমার আমিকে বিবেক যে ভর্ৎসনা, তিরস্কার, অভিযোগ করল নতমস্তকে তা মেনে নিয়েছি। আমার কোনো প্রতিবাদ নেই, কৈফিয়ত নেই। আমার মত দুঃখী হতভাগ্য এ পৃথিবীতে একজনও নেই। তাই, আমার বিবেক বলল ; নাগকুলের মঙ্গলের জন্য তাকে রক্ষার জন্য তক্ষকের বদলে নিজেকে সমর্পণ করতে এসেছি। তক্ষক বলে কেউ নেই, তক্ষক আজ একটা নাম। এই নামের স্রোতে ভাসছে গোটা নাগরাষ্ট্র। সমগ্র নাগকুলের মানুষ আজ এক একজন তক্ষক। তাই, কোনোদিন তাকে খুঁজে পাবেন না। আপনার এই রাজপ্রাসাদের মধ্যে তক্ষক নিরাপদে আত্মগোপন করে আছে। কোনো যজ্ঞ করে তাকে নিধন করা যায় না। সে অমর অক্ষয়। তার মৃত্যু নেই, ধ্বংস নেই। আমি তার বংশধর।

আমার মধ্যে আছে তক্ষকের বিষদাঁত। তক্ষকের উপর আপনার সব রাগ নিয়ে সর্বসত্র যজ্ঞের অগ্নিকুণ্ডে আমায় নিক্ষেপ করুন। আপনার অশান্ত মনকে শান্ত করুন।

জ্বর-জ্বর অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে যায় জনমেনজয়ের সারা শরীর। ক্রোধে, অপমানে জ্বলে যেতে যেতে মুখে মোহমাখা হাসি ফুটিয়ে তুলে বলল, কিন্তু আমি জানি তক্ষক বলে একজন আছে। সে কল্পনায় নয়, রক্তমাংসের মানুষ। তাকে জীবিত অথবা মৃত না পাওয়া অবধি আমার পিতার আত্মা শান্তি পাবে না।

আস্তিকের মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন ফুটে উঠল। একটা তীব্র অপমান যেন আগুনের ফুলকির মত তার রোমকূপের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়ল। আক্রোশভরা চোখদুটো সাপের জিভের মত লিকলিক করে উঠল। বলল, মহারাজ, অপরাধ নেবেন না। একটা কথা না বলে থাকতে পারছি না। নাগরাজ্যে যা হচ্ছে তা তো যুদ্ধ নয়, নৃশংস হত্যাকাণ্ড। মনে হল, এক নতুন কুরুক্ষেত্রের প্রান্তর পেরিয়ে এলাম। চারদিকে কত মানুষের বুকফাটা কান্না, হা-হুতাশ, অভিশাপে গোটা নগরী ফোঁপাচ্ছে। পঞ্চাশোর্ধ্ব বছর আগে কুরুক্ষেত্রে মহাশ্মশানে শবের পাহাড় আমার দেখা হয়নি, কিন্তু তার অন্য এক সংস্করণ দেখা হয়ে গেল হস্তিনাপুর আসতে আসতে। নিরীহ নাগদের এত রক্ত ঝরিয়ে আপনি কি সত্যিই সুখী হয়েছেন? এত রক্ত ঝরানোর কোনো প্রয়োজন ছিল কি? এত নাগরক্ত পেয়ে আপনার পিতার অতৃপ্ত আত্মা কি সত্যিই তৃপ্তি পাবে? যে তক্ষকের জন্য এত রক্ত ঝরাচ্ছেন সে তো খোদ হস্তিনাপুরের মধ্যে অজ্ঞাতবাস করছে। তাকে ধরতে না পারার ব্যর্থতা, অক্ষমতার দায় গোটা নাগকুলকে বহন করতে হচ্ছে। আপনার কি ধারণা, একটা তক্ষকের মৃত্যুতে সব শত্রুতার অবসান হবে? এক তক্ষক গেলে আর এক তক্ষক তার জায়গা নেবে। এক জীবনে এ সংগ্রাম শেষ হবে না। এবার সে সংগ্রাম শুরু করুন একেবারে রাজ-অন্তঃপুরের ভেতর থেকে।

জনমেনজয়ের বাকরুদ্ধ হল। হৃৎস্পন্দন যেন আকস্মিক স্তব্ধ হয়ে গেল। তীব্র একটা অস্বস্তির কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল তার অন্তঃকরণ। তবু মরিয়া হয়ে সে হাসার চেষ্টা করল। শাণিত ছুরিকার মত ধারাল হাসি ঝিলমিল করে উঠল তার মুখে। মনে হল যে হায়না হাসল তার মুখে। বলল, ক্রোধে কিংবা প্রতিহিংসায় প্রতিশোধ নেব বলে হত্যা করছি না, নাগদের শুধু বোঝাতে চাইছি জনমেনজয়ের বিরোধিতা করলে কেউ কোন ক্ষমা পাবে না। এই হত্যাকাণ্ডটা যাতে কোনোকালে না ভুলতে পারে সেজন্য একটু নির্দয়, নৃশংস তো হতেই হবে।

নিরুদ্ধ আক্রোশে জ্বলে উঠল আস্তিক। আস্তে আস্তে বলল : মহারাজ, আপনার পিতার আত্মার শান্তির জন্য আর কত রক্তপূর্ণ কলস চাই? রক্তের অভাব হয় তো হবে না ; কিন্তু আপনার পাপের ভার কে নেবে? পাপের পাহাড় আপনাকে একা বহন করতে হবে। রত্নাকর দস্যুর পাপের বোঝার ভার সংসারে তার দ্বারা প্রতিপালিত পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পত্নী, পুত্র কেউ বহন করতে রাজি হয়নি। অথচ তাদের ভরণপোষণের জন্য রত্নাকর রোজ নরহত্যা করে পাপের বোঝা ভারী করছিল। মানুষ

হত্যা করে রত্নাকর পাপ জমিয়ে তুলেছিল সে সবই তার নিজের। এবং একলাই তাকে তা বহন করতে হয়েছিল।

একটু চুপ করে পুনরায় বলল, বলছিলাম, আপনার পিতা অতৃপ্ত আত্মার তৃপ্তির জন্য যে অমানবিক নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড করে আপনি পাপ সঞ্চয় করছেন সেই পাপের ভাগ কিন্তু আপনার পিতা গ্রহণ করবেন না। আপনার এই পিতৃতর্পণে কোনো পুণ্য নেই। পাপে পরিপূর্ণ আপনার সংকল্প। রত্নাকরের পাপের বোঝা তাকে একা বইতে হয়েছিল। একাই তার প্রায়শ্চিত্ত করেছিল। পাপী রত্নাকর, পুণ্যাত্মা মহাকবি বাল্মীকি হয়ে নবজন্ম নিলেন। ইচ্ছে থাকলে সব মানুষই মহৎ হতে পারে। মানুষের মধ্যে যে ঈশ্বর বাস কবে তিনি কখনও মরেন না। ধ্রুবতারার মত পথ দেখান তিনি। অন্ধকার থেকে আলোয় ফেরা বড় যন্ত্রণার। পেঁচা কখনও দিনের আলো সইতে পারে? পারে না বলেই, জ্ঞানকে ভয় পায় অজ্ঞতা। তবু জ্ঞানের আলো অজ্ঞতার পিছু ধায়। তাই রত্নাকরকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোয় প্রত্যাবর্তন করতে হয়। রত্নাকর দস্যুর মৃত্যু হয়, কিন্তু বাল্মীকির কোনো মৃত্যু নেই। এটাই ঈশ্বরের বড় সাফল্য। ঈশ্বর পাপীকেও ক্ষমা করেন। ভালবাসায় যে আনন্দ এবং মুক্তির সুখ সেই বোধ জাগ্রত করেন।

জনমেনজয় স্তম্ভিত। মন্ত্রমুগ্ধের মত আস্তিকের কথাগুলো শুনল। হঠাৎই কী হল তার। বুকের ভেতর পাক দিয়ে উঠল পাপের যন্ত্রণা এবং পুণ্যের আনন্দ। ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস তার বুকের ভেতর কাঁপিয়ে গোপনে মিলিয়ে গেল। মনে হল, এক নিষ্ঠুর পাষাণ বিচারকের মর্মরমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে নিজের বিবেককে সওয়াল করছে কঠিন, নিষ্ঠুর আর বেদনাহীন ভাষায়। নিদারুণ একটা গ্লানির অপচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল তাব মন। বুকের ভেতর থেকে কে যেন ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, নাগদের তাজা রক্ত গায়ে মেখে তুমি বর্বর মানুষের মত রাজার অহংকারে তাণ্ডব নৃত্য করছ। নিজেকে অনেক হীন করেছ নিজের কাছেই। তবু, তুমি দেখতে পাও না বুকের মধ্যে আগুনে পোড়া সাপের মত তোমার হৃৎপিণ্ড পোড়ার জ্বালায় ছটফট করছে। মনের চোখ দিয়ে দেখলে, দেখতে পেতে কান্নার আবেগে-করুণ আর দারুণ যন্ত্রণায় দুমড়ে যাওয়া মুখের ছবি।

আস্তিকের ছোট্ট একটা কথা প্রচণ্ড ঝড় হয়ে ভেঙে পড়ল সে তার বুকের ভেতর। কী দুরন্ত তার শক্তি! তীরের মত বিদ্ধ করে এ ফোঁড়-ও ফোঁড় করতে পারে ভয়ংকর অজ্ঞতাকে। লুকোনোর জায়গা থাকে না তখন। নিজের কাছে নিজেই ধরা পড়ে যায়। অমনি সব মিথ্যে হয়ে যায়। হৃদয় গুহার দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন নটরাজ! দুপায়ে তার ঘুঙুর বাজছে। তাঁর এক পা অতীতে এক পা বর্তমানে। তা-তা, থৈ-থৈ নূপুরের নিক্কণ ধ্বনির তরঙ্গে দুলছে তার বর্তমান! বুকের হাড় তার মড়মড় করে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। কী অসহ্য যন্ত্রণায় সারা শরীর কুঁকড়ে যাচ্ছে। যন্ত্রণার গভীরে ডুবে নিঃশব্দ আর্তনাদে মাথা কোটে। প্রার্থনা করে, হে নটরাজ দাঁড়াও আমার আঁখির সম্মুখে।

পশুর মত তোমার পায়ের তলায় দলিত পিষ্ট কর আমার ক্রোধকে, হিংসাকে, বিদ্বেষকে। আমাকে নবীকৃত করে দাও। আমাকে তোমার করে নাও।

জনমেনজয়ের সারা শরীরের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গেল। মনে হল, তার সব দাহ জুড়িয়ে যাচ্ছে। নিজের মনেই নিরুচ্চারে বলল : হে নটরাজ নৃত্য থামাও। তুমি শিব হয়ে যাও। সকলের হৃদয়ের রাজা হয়ে আমি বাঁচতে চাই শ্রদ্ধায়, ভালবাসায়, আনন্দে।

বিন্দু বিন্দু ঘাম জমা হল জমমেনজয়ের কপালে। আস্তিক অনুভব করল, যন্ত্রণার গভীরে ডুবে তার সমস্ত সত্তা মুক্তির জন্য নিঃশব্দে আর্তনাদে করছিল। পাপ-পুণ্য যুগল শব্দের অভ্যন্তরে লুকোনো কত সুধা, কত তার বলবতী ধারা, কী তীব্র তার বেগ, কত বড় ভয়ংকরকে সে আঘাত করতে পারে বজ্রের মত। সেই জানার অনেকখানি অভিজ্ঞতা ছিল রত্নাকর দস্যুর কাছ থেকে পাওয়া। বাকিটা জানল জনমেনজয়ের কাছ থেকে। যন্ত্রণার গভীরে ডুবে রাজা-অহংকারও নিঃশব্দ আর্তনাদে মাথা কোটে। জীবনের বাস্তব কী আশ্চর্য এবং অলৌকিক। স্থান কাল ও পরিস্থিতি যেন এই মুহূর্তে তার চিত্ত সংকট, জন্মান্তর, এবং রূপান্তরকে নিয়তির এক অমোঘ সঙ্কেতে নতুনরূপে আবির্ভূত হতে দেখল।

আস্তিকের খুব অবাক লাগল। একজন শক্তিমান মানুষও ভিতরে ভিতরে যে কত দুর্বল অসহায় সে নিজেও জানে না। দুর্বলতার উপর মানুষের কোনো হাত নেই। একটু আগে যে জনমেনজয়ের মুখ অহংকারে জ্বলজ্বল করছিল, নিজের ক্রোধ, হিংসা, বিদ্বেষ ছাড়া কিছু জানত না। সেই মানুষটার মধ্যে হঠাৎ এ কোন বিপর্যয় ঘটে গেল? তার দৃষ্টির মধ্যে একটা ঘোলাটে ভাব লক্ষ্য করল আস্তিক। মনের অভ্যন্তরে একটা বিরাট ভাঙা-গড়া চললে চাহনি অমন ঘোলাটে হয়। জনমেনজয়কে অনুরূপ প্রতিক্রিয়ায় ক্লান্ত ও বিভ্রান্ত দেখাল। তার অনুতাপিত হৃদয়ের তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে বাতাসও উত্তপ্ত হয়ে উঠল। আস্তিক তার তাপ অনুভব করল শরীরে। আসলে, সব মানুষের জীবনে এমন কিছু ঘটনা আচমকাভাবে ঘটে যায় যে, তার জন্য বিন্দুমাত্র প্রস্তুতি থাকে না তার। এইসব অব্যক্ত অস্ফুট তীব্র যন্ত্রণা অবচেতনের অন্ধকার থেকে হিংস্র শার্দুলের মত অকস্মাৎ তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে অপ্রস্তুত মনকে ছিন্ন করে দিয়ে যায় তীক্ষ্ণ নখরের আঘাতে আঘাতে।

আস্তিকের মনে হল এটাই স্বীকারোক্তির শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত। তাই বলল, আমি ব্রহ্মবিদ্ ঋষি তাপস। মিথ্যে বলি না। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বোধ হয় একজন অভিনেতা বাস করে। মাঝে মাঝে বিদূষক হয়ে নিজের সঙ্গে এবং জীবনের সঙ্গে কৌতুক করতে হয়। একেবারে অন্যমানুষ হয়ে পৌঁছনোর জন্য নিজেকে সেই মিথ্যারূপেই অন্যের কাছে প্রতিভাত করার এক কৌশল করতে হয়। আসলে, এটা কোনো ভণ্ডামি নয়, সত্যকে আবিষ্কার করা। বেঁচে থাকার জন্য এটুকু খুবই প্রয়োজন। নিজের জন্য না হলেও অন্যকে অনুভব করার জন্য, উপলব্ধি করার জন্য একটু সময়ে তো দিতে

হয়। মানুষের ভেতর নানারকম বিপরীত স্রোত থাকে। তাই সময়টুকু নিয়েছি। এক মহাবংশের সন্তান আপনি। ঘৃণ্য হওয়ার মত কোনো কাজ করতে পারেন না। তবু জেদ মানুষকে দিয়ে অনেক জঘন্য কাজ করে নেয়। জেদের মত বড় শত্রু নেই। এক চক্ষু রাক্ষসের মত মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, মনুষ্যত্বকে সে গিলে খায়। এখন সে জেদটা আর নেই। আপনিও আর দূরের মানুষ নেই। তাই বলছিলাম, যাকে হন্যে হয়ে খুঁজছেন, জীবিত অথবা মৃত চাই সেই তক্ষক আমার সঙ্গে এসেছে। এখানে তাকে আনলে দু'জনেই অস্বস্তিতে পড়তেন। এখন জেদের পেঁচা উড়ে গেছে। আকাশের তারারা নীলাভ সবুজ দ্যুতিতে বাঁচার আশ্বাস ছড়িয়ে দিচ্ছে। অনুভবের মধ্যে, প্রাণের মধ্যে নতুন পরিবেশ। ফাগুনের হাওয়ায় নতুন করে বেঁচে ওঠার আশ্বাস, জীবনের ঘ্রাণ। শীতের মরা পাতার গাছের ডালেডালে বেঁচে উঠার খুশি পত্‌পত্‌ করে উড়ছে। আর বলছে বাঁচো, বাঁচো সকলকে নিয়ে বাঁচো, দারুণভাবে বাঁচো।

গা শির্‌ শির্‌ করে উঠল জনমেনজয়ের। কথা বলতে সে ভুলে গেছে। অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারল না। স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল আস্তিকের শান্ত, সৌম্য মুখের দিকে। তাতেই শরীর স্নিগ্ধ হল। নিঝুম হয়ে বুকের মধ্যে পাড় ভাঙার শব্দ শুনতে লাগল। মানুষের জীবন, তার প্রেম, হিংসা, বিদ্বেষ, সবই নদীর মত। নদী তীরে বসলেই জীবনের বিভিন্ন বিন্দুতে তার ভাঙার রূপ দেখা যায়।

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল জনমেনজয়। কথা বলতে পারল না। নিজের মধ্যে বেহুঁশ হয়ে বেশ কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল। ভাবাবেশের রেশ তখনও অটুট। সেই অবস্থায় বলল : হে নাথ আমার সকল পাপ ধোয়াও নয়ন জলে। পরম প্রার্থনার গভীরে ডুবে গিয়ে আর্ত গলায় নিরুচ্চারে নিজেকে শোনাল : আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে গো ফুল ফুটবে।'

তারপর স্খলিত ভেজা গলায় বলল : অহংকারের বশে সন্ত্রাস নির্মূল করতে গিয়ে আর এক ভয়ংকর সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছি। তক্ষকের সঙ্গে বোধ হয়, আমার কোনো তফাত নেই। একই সন্ত্রাসের এপিঠ ওপিঠ। অনেক বিড়ম্বনা, অনেক যন্ত্রণা দিয়েছি মানুষকে। অন্যায় যা করেছি তারও ক্ষমা নেই। হঠাৎই এক গভীর পাপবোধে ছিন্নভিন্ন হচ্ছি। বিবেকের ভয়ে জবুথুবু হয়ে গেছি। বিবেক যদি পরিচ্ছন্ন এবং মুক্ত না হয় তাহলে জীবনের অন্য সব মুক্তি, আনন্দ, পুণ্যের সুখ মূল্যহীন হয়ে পড়ে। তাই, তক্ষকের উপর আমার সব রাগ জুড়িয়ে গেছে। আপনার কথাগুলো অমৃতলোকের বার্তা বহন করে এনেছে। সত্যি তো দেশের রাজা হয়ে নিজেকে যদি বিশ্বপরিধিতে মেলে ধরতে না পারি, ভালবাসা দিয়ে নাগরিকদের আলিঙ্গন করতে না পারি ক্ষমায়, প্রেমে, মহত্ত্বে, ত্যাগের বৈভবে তাদের অন্তর জয় করতে না পারি তা হলে কিসের রাজা? মানুষের সব পুণ্য তো তার ভালবাসায় ক্ষমায়, প্রেমে, মহত্ত্বে।

জনমেনজয়ের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে কথাগুলো উঠে এল বলেই তা এমন করে আস্তিকের হৃদয়কে ভালবাসায় স্তব্ধ করে দিল। মনে হল, সে জেগে স্বপ্ন

দেখছে। যে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত ছিল মিথ্যে, বানানো, জনমেনজয়কে বিদ্রূপ করার অস্ত্র সে যে এত ধারাল এবং নিমেষে সব কিছু ছিন্নভিন্ন করে অন্য এক খুশিতে এবং গৌরব বোধে বদলে দিতে পারে এরকম কোনো ধারণা নিয়ে কথাগুলো বলেনি। কিন্তু বাস্তবে যোগ্য মর্যাদায় ও যথার্থ অনুধাবনে তাকে সত্য ও সুন্দর করে তুলল। জট পাকানো একটা ঘটনার উপর এমন করে চিরদিনের মত একটা যবনিকা পড়ে যাবে তা বানানো স্বপ্ন-বৃত্তান্তে ছিল না। কিন্তু চোখের সামনে যা ঘটল তা তো মিথ্যে নয়, বরং ভয়ংকর বাস্তব।

একটুখানি সময়ের মধ্যে মনের সঙ্গে বহু সংগ্রাম করল জনমেনজয়। কপালে ঘাম দেখা দিল। আস্তে আস্তে বলল, আমার বোঝার ভার হাল্কা করতেই বোধ হয় ভগবান আপনাকে এখানে পাঠিয়েছেন। তক্ষককে সাথে করে আমার কাছে পৌঁছনো আপনার ভীষণ দরকার ছিল। হয়তো, এমনটা ঘটবে বলে লেখা ছিল। আমি তাই বিশ্বাস করি। নইলে, নাগকুল নির্মূল করার সংকল্পসময় না এসে এখন এলেন কেন? এই মুহূর্তে তক্ষক তো ভাগ্যের হাতে মার খেয়ে বিষদাঁত ভেঙে নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে। তার উত্থান শক্তিটুকুও নেই। তাই তার উপর আমার কোনো রাগ নেই। যা হওয়ার হয়ে গেছে। অনুতাপ করলেও ফিরে আসবে না তা। অনেক মূল্য দিয়ে বুঝতে পারছি, যা হওয়ার তা হবেই। তাকে রোধ করার সাধ্য কারো নেই। সময়ই নিজের হাতে সব করে নেয়। সময়ের মধ্যে অন্য জীবন সুপ্ত থাকে। যেমন বীজের মধ্যে থাকে মহীরুহ। যা হওয়ার তা তো হয়েছে, এখন নতুন জীবনের দিকে প্রত্যাশার সঙ্গে তাকানো ভালো। নতুন করে বেঁচে ওঠাই বড় শর্ত। এই আকাঙ্ক্ষাই নবীকৃত করে। নতুন করে প্রাণ দেয়।

কথাগুলো বলার সময় তীব্র কোনো কষ্টে তার শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত হল। বুকের হৃৎপিণ্ডের শব্দ ধুকপুক্ করে বাদ্যের মত বাজতে লাগল। মুক্তির বিপুল আনন্দসুখে তার চোখ দুটি বিস্তৃত আকর্ণ হয়ে উঠল। প্রাণপ্রতিষ্ঠিত প্রতিমার মত দুর্জয় আর অপরূপ দেখাল জনমেনজয়কে। তক্ষকের দিকে তাকিয়ে সকৌতুকে প্রশ্ন করল আপনি কিরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করেন।

জনমেনজয়ের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে তক্ষক নির্ভয়ে বলল : শান্তি, সম্প্রীতি ও সদ্ভাবের স্বার্থে নানাজাতির আত্মনিয়ন্ত্রাধিকারকে যথাযোগ্য মর্যাদাই আপনার কাছে প্রত্যাশা করি।

জনমেনজয় বলল : শান্তি ও সৌভ্রাত্রে নতুন হয়ে ওঠার জন্য সব কিছুই করব এ আমার অঙ্গীকার।